# কালাচাঁদ।

প্রথম অংশ।

প্রথমপর্ব্ব—আদিকথা।

কলিকাতা,

ঐট বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেস হইতে

ীলাল সরকার দ্বারা

ও প্রকাশিত।

# ভূমিকা।

সমাগ্‌কালাচাঁদ অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টাদশপর্ব্ব।
বলিকের ভাল লাগিবে কি না সন্দেহ। ঔষধ কখন
দিয়েছেয় না। তথাচ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঔষধ-সেবনে
এযো নহেন। সেই এক আশা।

"কালাচাঁদ-গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব্ব—নায়িকা-
তা কা ছবি-ছুট্ তাস ববং খেলিতে পারি, বায়ু-
সাৃথিবীতে ববং বাস করিতে পারি, কিন্তু
পতিল নায়িকা-ছুট্ উপন্যাস কখন পড়িতে পারি
: । নি প্রথম পর্ব্বদ্বয় যেন বাব্‌লা গাছের বিস
-কঠিন, নীরস, শুষ্ক।

৬। সা এই অষ্টাদশপর্ব্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে ধৈর্য্য চাই,
২ আরও কিছু চাই।

কলিকাতা
২ রা পৌষ ১২৯৬।

শ্রী——

# ছবির সূচীপত্র।


| বিষয়। | | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
| বালক কালাচাঁদ আমগাছে উঠিতেছেন | | ২ |
| কালাচাঁদ খড়ের গাদায় আগুন ধরাইতেছেন | | ৭ |
| সাহেব, বিবি, এবং কালাচাঁদ | ... | ৩৫ |
| পতিত-পাবন পরামাণিক | ... | ৫৫ |
| ৫। নিশীথে গঙ্গার ঘাটে কালাচাঁদ | ... | ৭৬ |
| ৬। মুটে সঙ্গে করিয়া, মাছ হাতে কালাচাঁদ | | ৮৭ |
| ৭। ঠাকুরদাদা এবং মামা ... | ... | ১১২ |
| ৮। গঙ্গার ঘাটে রামঠাকুরের আহ্নিক | ... | ১৩২ |
| ...ঠাকুরের কুম্ভকযোগ ... | ... | ১৩৪ |
| ...দের তৈল-মর্দ্দন | ... | ১৬১ |


হইলেন

চাহিতে

বালক-কালাচাঁদ আমগাছে উঠিতেছেন।

তখন কালাচাঁ ... উৎসাহ বাড়িল।
সমাগত রমণী ... নি বুঝাইয়া
বলিলেন, ... গাল
দিয়েছে, ... তে
এয়েছি ... র

# লাচাঁদ।

## প্রথম পর্ব্ব—আদিকথা।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

২৪৩ সালে, ভাদ্রমাসে, সপ্তবিংশতি দিবসে,
ক্ষ, অমাবস্যারজনীতে, শনিবারে, মামার বাড়ী
কবি জন্মগ্রহণ করেন। রংটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।
ন মুয় কালাচাঁদের পিতা জীবিত ছিলেন ... কে
বকেচে? ... লুকে মানুষ করেন।

জননীর ডাকে কালাচাঁদ অবশ্যই নিকটবর্ত্তী হইলেন না। তিনি এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মারিয়া চাহিতে লাগিলেন। শেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—

লওয়া, গাছে
...ব্যই তিনি এই তিন
...দেখিতে দেখিতে দে
করিলেন। দেখিতে দেখিতে দে
সুবিশাল হইল। তখন তিনি
পড়িতে লাগিলেন। আম, তাল,
বৃক্ষত্রয়ে উঠিবার বিশেষ কৌশল শিখিলে
হউক, আর পুরুষই হউক, বৃদ্ধ অথবা
হউক—দূরে অদূরে লোক দেখিলেই, তাহা
গালি দেওয়া তাঁহার গুণ জন্মিল। কেহ
করিয়া ধরিতে গেলে, তিনি এমনি বেগে
পলাইতেন যে, কেহই তাঁহার নাগাল পাইত
কালাচাঁদের পিতা না থাকুক, একমাত্র
হইতেই তাঁহার সর্ব্বদুঃখ দূর হইয়াছিল।
আশ্বিন মাসে, তিনি একটী আম গা
দৌড়িতেছেন। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলো

তখন কালাচাঁদ-জননীর দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়িল। সমাগত রমণীমণ্ডলীকে ক্রন্দনের সুরে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, "ঐ বুড়ীমাগী আমাব ছেলেকে গাল দিয়েছে, মেরেছে—আবার কিনা, বাড়ী ব'য়ে মাত্তে এয়েছিল। আমার পোড়া অদেষ্টে আমার আর "সে" বেঁচে আছে কি? আজ যদি "সে" থাক্‌তো,—তাহ'লে, ও কেমন মিত্তিরদের বড়গিন্নি, তা আমি বুঝে নিতুম—"

সকলে চলিয়া গেলে, কালাচাঁদ খিল খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন। আমটীর তখন পূর্ণগ্রাস ঘটিযাছে, আঁটীর ছাল পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়াছে,—তথাচ তখনও তিনি আঁটী চুষিতেছেন। মা, আদর করিয়া পুত্রকে ডাকিলেন, "এস, আমার যাদু এস, ন এস, মাণিক এস,—বল'ত বাবা, তোমায় কে বকেচে? কে মেরেছে?"

জননীর ডাকে কালাচাঁদ অবশ্যই নিকটবর্ত্তী হইলেন না। তিনি এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মারিয়া চাহিতে লাগিলেন। শেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—

"মা, আমি যে হ'রে বামুনদের গাছথেকে পেয়ারা চুরি করে ছিঁড়ে এনেছিনু, সে পেয়ারাটা কোথা গেল—মা ?"

মা। সে পেয়ারা, বাবা, আমি তোমার জন্যে লুকিয়ে তুলে রেখেছি,—দিচ্চি, নাওসে বাবা—

বামহাতে করিয়া পেয়ারা খাইতে খাইতে, ডান হাতে ছিপ লইয়া, কালাচাঁদ মাছ ধরিতে বাহির হইলেন। যাত্রাকালে কালাচাঁদের মা বলিয়া দিলেন, "বাবা, আজ একটা পাঁচ সের রুই ধর্‌তে পারিলে বাহাদুর বল্‌বো।"

বলা বাহুল্য, কালাচাঁদের মায়ের বা মামার গ্রামমধ্যে একটীও পুকুর ছিল না।

কালাচাঁদের বয়স নয় বৎসর পূর্ণ হইয়া দশে পড়িয়াছে। তিনি দত্তকুলোদ্ভূত কায়স্থ-সন্তান। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কোন পল্লীগ্রামে।

এই সময়, কালাচাঁদ এবং তাঁহার মাতার বিক্রমে গ্রামবাসী সশঙ্কিত হইল। ঘোষেদের বাড়ী দুর্গোৎ-সব। কালাচাঁদ সপ্তমী-পূজার দিন রাত্রে, সকলে

কালাচাঁদ খড়-গাদায় আগুন ধরাইতেছেন।

ঘুমাইলে, মাদুর্গার মুকুট এবং আঁচলা খুলিয়া লইয়া লুকাইয়া ঘরে পলাইয়া আসেন। কালীপূজার রাত্রে, কালাচাঁদ আগুন লইয়া খেলা করিতে করিতে, মজা দেখিবার জন্য, মিত্রদের খড়ের গাদায় আগুন ধরাইয়া দেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে, গ্রামের কয়েকজন বিজ্ঞব্যক্তি কালাচাঁদের মাকে বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, "তোমার ছেলেকে পাঠশালে লিখিতে দাও, কায়েতের ঘরে মূর্খ হয়ে থাক্‌লে, শেষে বড় কষ্ট পেতে হয়।"

কালাচাঁদ-জননী তখন ভয়-চকিত হইয়া বলিলেন,—"বাপ্‌রে! আমি এখন তা পার্‌বো না;—এই আমার দুধের ছেলে,—তার বয়েসই বা কি!—সব কথাও এখন তার ফুটে নাই; যাক্‌, যাক্‌, আরও দুচার বছর যাক্‌,—একবারে ইস্কুলেই পাঠিয়ে দিব। আর আমার ছেলে যে রোগা,—এই এক ছটাক চেলের ভাতও সে খেতে পারে না—গুরু-মোশায়ের কাছে পাঠশালে লিখ্‌তে গেলে যে, আরও কাহিল হ'য়ে যাবে।"

বিজ্ঞব্যক্তিগণ বিফলমনোরথ হইয়া, "কালাচাঁদ কাহিল কিসে—"এই কথা ভাবিতে ভাবিতে, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমশ, মায়ে-পোয়ের প্রাদুর্ভাবে গ্রাম যায়-যায় হইল। বাসুকির ফণা কাঁপিল। ভগবানের বুঝি সৃষ্টিলোপের ভয় হইল। তখন হঠাৎ জ্বররোগে কালাচাঁদের মায়ের মৃত্যু ঘটিল। কতক সুবিধা হইল। অৰ্দ্ধেক প্রাণ ধড়ে আসিল।

কালাচাঁদের মামা বৰ্দ্ধমানে মোক্তারী করিতেন। তিনি, সমগ্র গ্রামবাসীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য, কালাচাঁদকে বৰ্দ্ধমানে লইয়া গেলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মামা মোক্তার। বর্দ্ধমানের বাসাটী দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়ী দুইখণ্ড। অন্দরে বালিচূণ-কাম-বিহীন ইটের একতলা একটা পুরাণ ক্ষুদ্র 'দালান'। বাহিরে, দুইপাশে-দুই-কুঠারি-মধ্যে-চাতালবিশিষ্ট খড়ো বৈঠকখানা। তুলসীমণ্ডপ দুইটী; একটী সদরে, একটী অন্দরে। ঘরদ্বার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইলেও, অতি যত্নে সুরক্ষিত বলিয়া, এখনও যেন ঝক্-ঝক্ করিতেছে।

মামা নবীনও বটেন, প্রবীণও বটেন। বয়স ৪৫ বৎসরেরও বেশী হইবে কি? হ্রস্বও নন, দীর্ঘও নন। শরীরে আজও শক্তি বিলক্ষণ। আজও পাঁচ সাত ক্রোশ পথ হাঁটিতে তাঁহার কষ্টবোধ হয় না। প্রত্যহ প্রাতে স্নানের পর কলাপাতে একশত-আটটী কৃষ্ণনাম লিখিয়া জলগ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পর মালা লইয়া সহস্রাধিক হরিনাম জপ করা হয়।

মামা দিব্য ফিট্‌ফাট। বাউরি চুলে কলপ্‌টী যথানিয়মে লাগান আছে। সপ্তাহান্তে যথানিয়মে গোঁফ ছাঁটাই হয়। গামছাখানির রঙ চাঁপাফুলের মত। এত যত্নে কাছারির কাপড় পরেন যে, এক-মাসেও তাহা কালো হয় না। একযোড়া চটী-জুতায় আড়াই বৎসর যায়। বিছানা বালিস সাদা ধপ্‌ধপে। অন্দরের খাটের গদী, এবং বাহিরের বৈঠকখানার সতরঞ্চ বহুপুরাতন হউক,—কিন্তু এখনও কাজের বাহির হয় নাই। মামার অঙ্গে মলা নাই, ঘরে ধূলাবালি নাই।

মামা আজিকালি বৎসরান্তে একবার বাটী যান। ৺শারদীয়া পূজার বন্ধে গিয়া, কার্ত্তিক পূজার পর বর্দ্ধমানে আসেন। ছেলে হয় নাই বলিয়া পূর্ব্বে দেশে কার্ত্তিক পূজা করিতেন; এক্ষণে চারি বৎসর হইল, সহধর্ম্মিণীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সে পূজা বন্ধ করিয়াছেন। মামার পুত্র নাই, চারিটী কন্যা মাত্র। কন্যাগণ বিবাহিত—শ্বশুর বাটীতে ঘর-কন্না করে। সুপাত্রে কন্যাদান করিয়া মামা নিশ্চিন্ত।

বলা বাহুল্য, সেকালে সহরে, কর্ম্মস্থানে পরিবার আনার প্রথা তত প্রচলিত ছিল না। সুতরাং মামী ইহজীবনে কখন বর্দ্ধমান দেখেন নাই।

বাড়ীটী কার? ভাড়াটে, না মামার নিজের? নিজের বলিয়াই বোধ হয়। ভাড়া ত কেহ লয় না, আর তিনি কাহাকেও ত দেন না। বৈঠকখানা ছাওয়াইতে হইবে, মামা নিজে জন-মজুর করিলেন, নিজ বাক্স হইতে তাহাদের মজুরি দিলেন।

মামা নিজে রাঁধেন। স্বপাক ভিন্ন খান না নাকি? মামা স্বয়ং রাঁধেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। একটী স্ত্রীলোক বাট্না বাটিয়া, কুট্না কুটিয়া, মাছ বাছিয়া, চাল ধুইয়া, ডাল পাছড়িয়া, উনান ধরাইয়া, সমস্ত উদ্যোগ-সংযোগ করিয়া মামাকে ডাকে, "এস, মিত্তিরজা—এসগো,—সব তৈয়ের হয়েছে,—বেলা হলো।" সেই স্ত্রীলোকের পরিদর্শন-গুণে, রন্ধনে মামার পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইত।

স্ত্রীলোকটী কোন্ জাতি বলিব না। তবে এই-

মাত্র বলিব, সে, ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের মেয়ে নহে। বর্ণটী আধ-ময়লা; তবে মেজে-ঘষে এক রকম দেখায়। পরিধান রাঙ্গাপেড়ে কাপড়। গলায় সোণার দানা। হাতে রূপার তাগা। স্ত্রীলোকটী কর্ম্মিষ্ঠা। ঘরঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, বিছানা করা প্রভৃতি সমস্তই তাহার দ্বারা সম্পাদিত হয়। গৃহিণী বলুন, চাকরাণী বলুন, আর যাহাই বলুন, সবই সেই সে। একটা বুড়ো ঠিকে চাকর আছে, সে হাটবাজার করে, কখনবা বাহিরে তামাক-টামাক সাজে; বাকী গৃহের সমস্ত কাজই স্ত্রীলোকটীর দ্বারা সুসাধিত হয়।

স্ত্রীলোকটীর নাম করুণাময়ী। কোষ্ঠীতে বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইলেও, মামার ধারণা ছিল, করুণার বয়স বাইশের অধিক নহে। করুণার স্বভাব বিনয়-নম্র, প্রকৃতি ধীর। তবে মামার সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহার গণ্ডগোল হইত। মামাকে দু-দশ কথা শুনাইয়াও দিত। সে সময় মামা কিন্তু বড় বেশী কথা কহিতেন না। প্রায়ই নীরব হইতেন।

ঝগড়ার পর আর মুহূর্ত্তকালও করুণাময়ীর রাগ থাকিত না। আবার যে-ভালমানুষ, সেই-ভালমানুষ; হয়ত কখন কখন সে, মামার তোযামোদ করিতে বাধ্য হইত।

মামা, সমবয়স্কগণের নিকট, করুণাময়ীর বড়ই প্রশংসা করিতেন। বলিতেন, করুণা উনুনের গোড়ায় মুখটী দিয়ে, একবার ফুঁদিলেই অমনি আগুন জ্বলিয়া উঠে। করুণা পিতলের বাসন মাজিলে ঠিক সোণার হয়, কাঁসার বাসন মাজিলে ঠিক রূপার হয়। গ্রীষ্মকালে করুণার কলসীর জল ঠাণ্ডা, শীত-কালে ঈষৎ গরম। কখন বা বলিয়া ফেলিতেন, অমন সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী বুঝি আর নাই!

পাড়ার লোক বলিত, মামার কপাল ভাল। কেহ কেহ কাণাকাণি করিত, অদৃষ্টের তেমন জোর না থাকলে কি, মামা এমন দু-মহল বাড়ীটা অমনি-অমনি ভোগ-দখল করিতেছেন?

বাড়ীটা কার? করুণাময়ীর কি?

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদের একাদশ বৃহস্পতি। মা মরিল ভাল হইল; সুখ বাড়িল। বৰ্দ্ধমানে আসার পর, কালাচাঁদ আদরের অনন্ত ক্ষীরোদ-সমুদ্রে একবারে ডুবিলেন। ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না।

বিধাতার বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে? করুণাময়ী কালাচাঁদকে এত ভাল বাসিল, এত যত্ন-সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া অনেকে অবাক্ হইল। কালাচাঁদের কোন কাল্পনিক কষ্ট হইলেও, করুণার অন্তর কাঁদিত। কালাচাঁদকে খানিকক্ষণ না দেখিলে, করুণা তাহাকে দশবার ডাকিতে পাঠাইত।

বাপ-পিতামহ যাহা কখন দেখে নাই, কালাচাঁদ তাহা দেখিলেন। সাটিনের জামা, শান্তিপুরে কাপড়, বার্ণিস-করা জুতা,—এসব কালাচাঁদের শ্রীঅঙ্গে উঠিল। সকালবেলা উঠিয়াই ঘর-গেয়ের আধ সের কাঁচা দুধ এবং খানিক মাখন, তাঁহার উদরস্থ হইতে

লাগিল। বৈকালে দশ-বার-খানি গরম গরম ফুল্‌কা লুচি তিনি অবলীলায় জলযোগ করিতে লাগিলেন। দেহ ফুলিয়া উঠিল। এ-মাসের জামা, ও-মাসে গায়ে হয় না। করুণাময়ীর হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না।

এইরূপে তিন মাস অতীত হইলে, কালাচাঁদ বর্দ্ধমান-রাজস্কুলের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। ক্লাসের এক অপূর্ব্ব বাহার হইল! পাঁচ-ছয়-সাত বৎসরের ছোট ছোট ছেলে ক, খ, গ, অক্ষর চিনিতেছে; কেহবা, বড় গাছ, ছোট পাতা, লাল ফুল পড়িতেছে; কেহবা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বানান শিখিতেছে; তার মাঝে পূর্ণদশবর্ষবয়স্ক, হৃষ্টপুষ্ট, দীর্ঘাকার, নিরক্ষর কালাচাঁদ শোভিতেছেন। ক্ষুদ্র তারাদল মাঝে যেন অমাবস্যার কালো রঙের পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন! কোমল কলাগাছের ঝাড় যেন বৃহৎ বটবৃক্ষের আওতায় আশ্রয় লইয়াছে। ছোট ছোট রুইপোণার ঝাঁক যেন তেজী চেতলমাছের সম্মুখে পড়িয়াছে। অধিক কি, মাষ্টারটীও একটু বিব্রত

হইলেন। তিনি অন্যান্য ছেলেকে পড়া বলিয়া দেন, আর মাঝে মাঝে কালাচাঁদের চেহারা পানে চাহিয়া দেখেন।

প্রথমম্মাসে কালাচাঁদ সাতখানা প্রথমভাগ ছিঁড়িলেন। পড়ার তেজ দেখিয়া, করুণার আনন্দ হইল।

দ্বিতীয় মাসে ক্লাসের ছেলেদের বৈ চুরি যাইতে আরম্ভ হইল। ক্রমশ কাগজখানা, পেনসিলটা, কলমটা পর্য্যন্ত টান ধরিল। কখন কম, কখন বেশী, প্রায় একবৎসর কাল এই ভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু চোর কেহ ধরিতে পারিল না। কালাচাঁদ ইএ এক বৎসরে ঊনপঞ্চাশখানা প্রথমভাগ ছিঁড়িয়া দ্বিতীয়ভাগ ধরিলেন।

দ্বিতীয় বৎসরও চুরি যথানিয়মে চলিতে লাগিল। সমগ্র শিক্ষকমণ্ডলী এ চুরি নিবারণের কিছুই উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

তৃতীয় বৎসর কালাচাঁদ, বাঙ্গালা তৃতীয়ভাগ এবং ইংরেজী ফাষ্টবুক আরম্ভ করিলেন। এবার চুরির কিছু বেশী প্রাদুর্ভাব হইল। পকেটে এই পয়সা

আছে, আর খানিক পরে, পকেটে হাত দিয়া দেখি, পয়সা আর নাই! সকলে অবাক্! বড় বড় সেলেট যেন যাদুমন্ত্রে উড়িয়া যাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মাষ্টারদের ভাল ভাল ছাতাও হারায়। স্কুল-লাইব্রেরির ওয়বেষ্টার-ডিক্স্নারীখানি একদিন আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বিষম বিভ্রাট! মহা হুলস্থূল কাণ্ড!

অনেকেরই দ্রব্যাদি হারাইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কালাচাঁদের কোন জিনিস চুরি গেল না। কেহ কেহ সন্দেহ করিল,—কালাচাঁদই চোর। এ কথা হেডমাষ্টারের কাণে গেল। তিনি বলিলেন "তা'ত আমার মনে হয় না। কালাচাঁদ ঝগ্ড়াটে বটে, বালকগণের সঙ্গে মারামারি করে বটে,—কিন্তু তা ব'লে চোর হবে কি?"

একদিন দ্বিতীয়শ্রেণীর কোন এক বালকের একখানি দু-মুখো রজসের ছুরী হারাইল। বেলা দুই-প্রহরের সময় ছুরী চুরি যায়; বেলা ১টার স-কালাচাঁদ চৌর্য্য-অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। এ

২

কথা শুনিয়া, কালাচাঁদ কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন বা রাগ করেন। প্রথমশ্রেণীর তিনজন বালক একবাক্যে সাক্ষ্য দিল, "আমরা ঐ ছুরী এই-মাত্র কালাচাঁদের হাতেই দেখিয়াছি। উহারই নিকট নিশ্চয় ছুরী আছে।"

তখন শিক্ষকের হুকুম মতে কালাচাঁদের কাপড়-ঝাড়া হইল; কিন্তু ছুরী কোথাও পাওয়া গেল না। বিচারে কালাচাঁদেরই জয় হইল। তিনি একটানা-সুরে কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রন্দনের বুলি এইরূপ;— "আমার নামে কেবল শুধু শুধু মিছে বদনাম! দশ-জনে যদি আমার উপর এরূপ চক্র করে, তাহ'লে আমি আর ক'দিন বাঁচ্‌বো।" শেষে কালাচাঁদ মনে মনে বলিলেন,—"আচ্ছা আমিও মজা দেখাতে পারি।"

স্কুলের ছুটীর পূর্ব্বে কালাচাঁদ হেড্-মাষ্টারকে চুপি চুপি বলিলেন, "ঐ, যে বালকটী কাশ্মীরি-কোট গায়ে দিয়া আসিয়াছে, উহারই পকেটে ছুরী আছে। ঐ বালকটী নিজে চুরি করিয়া মিছে আমার নামে দোষ দিয়াছিল।"

বলা উচিত, ঐ বালকটী ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভালমানুষ ছাত্র, এবং কালাচাঁদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় প্রথম সাক্ষী ছিল। হেডমাষ্টার তাহাকে ডাকাইলেন, তাহার পকেট টিপিলেন, পকেট শক্ত বলিয়া বোধ হইল; শেষে পকেটে হাত দিয়া তিনি ছুরি বাহির করিলেন। বালকটী ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি ইহার বাষ্পও জানি না।" বালক আর কোন কথা কহিতে পারিল না; তাহার চক্ষু দিয়া ঝর্-ঝর্ জল পড়িতে লাগিল। কালাচাঁদ চোখ ঘুরাইয়া, হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন কেঁদে জিৎলে ত আর হবেনা! পরের নামে যে বড় দোষ দিয়েছিলে? জলখাবারের ঘরে গিয়ে আমাকে ছুরির আধাআধি ভাগ দিতে চেয়েছিলে যে! হাঃ! হাঃ!"

বিচারে সেই ভাল-মানুষ বালকটীর নাম-কাটা গেল। স্কুলে কালাচাঁদের বিশেষ প্রভুত্ব হইল। তাঁহার কাছে আর এগোয় কে?

পরদিন কালাচাঁদের একখানি নিজের কেতাব

হারাইল। কালাচাঁদ মহা-হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে"—এইরবে তিনি দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া ফেলিলেন। হেডমাষ্টারের নিকট গিয়া দড়াম্ করিয়া, আছাড় খাইয়া পড়িলেন। প্রধান শিক্ষক জিজ্ঞাসিলেন, "ব্যাপার কি? কি হয়েছে?"

কালাচাঁদ। (ক্রন্দনের সুরে) আমার ফাষ্টবুকের মানের বৈ হারিয়েচে, আমি গেলাম, আমি মরিলাম! আমি আর কাল থেকে পড়া তৈয়ারি কর্‌বো কেমন করে গো! (এই বলিয়া মুখে কাপড় দিয়া ক্রন্দন)।

হেডমাষ্টার। বৈ কে লইল, কোথা গেল, তার কিছু জান কি?

কালাচাঁদ। বৈ এই স্কুলেই আছে। এইমাত্র হারিয়েচে, এখনও নিয়ে পালাতে পারে নাই। আমি দরোয়ানকে ফটক বন্দ কর্‌তে বলে এসেচি।

হেডমাষ্টার। কোন্ ক্লাসের কোন্ ছাত্র নিয়েচে, তোমার কি কাহাকেও সন্দেহ হয়?

কালাচাঁদ। তা কেমন ক'রে জান্‌বো? প্রথম-শ্রেণী থেকে শেষ-ক্লাস-পর্য্যন্ত দেখুন,—বৈ অবশ্যই মিল্‌বে;—এখনও ত কেউ পালায় নাই।

স্বয়ং হেডমাষ্টার কালাচাঁদকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক বালকের কাপড় ঝাড়া, পুস্তক ঝাড়া, জুতা-ঝাড়া—ইত্যাদিরূপ খানাতল্লাসি আরম্ভ করিলেন। অবশেষে তৃতীয়শ্রেণীর একটী সৎ এবং ভাল ছাত্রের পুস্তকের ভিতর কালাচাঁদের সেই মানের বৈ বাহির হইল। সে বালকটী 'ভ্যাবাচ্যাকা' খাইয়া, ভীত হইয়া কাঁপিয়াই আকুল! বালক বলিল, "আমি ইহার কিছুই জানি না,—কে, কখন্, ঐ মানের বৈ আমার পুস্তকের ভিতর রাখিয়া গিয়াছে,—আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না।" সে কথা আর কে শুনে? চোর ধৃত হইয়াছে দেখিয়া, কালাচাঁদের কোমল কলেবর আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিল। বিচারে এ বালকটীরও নাম কাটা গেল।

কালাচাঁদের অদ্বিতীয় প্রভাব। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকগণ পর্য্যন্ত ভীত হইলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞের

ঘোড়ার ন্যায় কালাচাঁদ দিগ্বিজয়ী হইয়া চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলেন। বালকমণ্ডলী কালাচাঁদকে দেখিলেই ভীত, তটস্থ, কম্পিত-কলেবর হইত।

স্কুলে ডাকাতি আরম্ভ হইল। কোন বালক জলখাবার খাইবার জন্য চারিটী পয়সা আনিয়াছে; কালাচাঁদ তাহাকে বলিলেন, "আমাকে দুইটা পয়সা ধার দাও।" সে যদি একটু ইতস্তত করে, তবে কালাচাঁদ অমনি চোখ রাঙ্গাইয়া, দাঁত কিড়মিড় করিয়া বলেন,—"আচ্ছা, তুমি দেবে না,—দেবে না,—তুমি কেমন ছোকরা, আমি একবার বুঝে নেবো।" বালক ভয়ে জড়সড় হইয়া পয়সা দিত। এইরূপ ব্যাপারে স্কুলে কালাচাঁদের বেশ দু-পয়সা রোজগারও চলিতে লাগিল। এবম্প্রকারে বর্দ্ধমান-রাজ-স্কুলে কালাচাঁদের পাঁচ বৎসর অতীত হইল।

অবশেষে স্কুলে বাঘ ঢুকিল। কালাচাঁদ বালকগণকে চড়চাপড়, কীল, ঘুষি, কামড় পর্য্যন্ত আরম্ভ করিলেন। যে শ্রেণীর যে বালকের সঙ্গে যাহার কেন গণ্ডগোল হউক না—কালাচাঁদ তাহার একপক্ষে

নিযুক্ত হইতেন। ক্রমে কালাচাঁদ স্কুলের দাঙ্গা ফুরাইয়া লইতে লাগিলেন। কালাচাঁদের হাতে ৷৷০ আনা নগদ দাও, আর বল, অমুক বালককে মারিতে হইবে,—কালাচাঁদ তখনি বলিবেন,—'তথাস্তু'। সুতরাং স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই কালাচাঁদের বশ, অনেকেরই তাঁহার সহিত ভাব।

ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে কালাচাঁদের অত্যাচার-কাহিনী হেডমাষ্টারের কর্ণপটহে প্রবেশ করিল। একদিন একটী বালকের গণ্ডদেশ বিষম দংশন-করা-অপরাধে, কালাচাঁদ অভিযুক্ত হইলেন। বালকটীর গাল দিয়া ঝর্-ঝর্ রক্ত পড়িতেছে। দুইজন শিক্ষক সাক্ষ্য দিলেন, কালাচাঁদেরই এ কাজ। কালাচাঁদ কিন্তু কাট-কবুল; বলিলেন, "আমি কিছুই জানি না।" প্রমাণ পাইয়া হেডমাষ্টার কালাচাঁদের মাথায় গাধার টুপি দিয়া তিন ঘণ্টা 'একঠেঙ্গে' করিয়া রাখিলেন। পৃষ্ঠদেশে দশ বেত কসিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনাও করিলেন।

পরদিন কালাচাঁদ স্কুলে আসিলেন না।

বর্দ্ধমানের মামীকে বলিলেন, "ও, রাজার স্কুলে মাইনে নেই, ভাল পড়া হয় না, ওখানে আমি আর পড়্‌বো না।" মামী বলিলেন, "তা বাবা, তোমার লেখাপড়ার জন্য আমি কি আর মাইনে দিতে কাতর?—যা মাহিনা লাগে, তা আমি দিব—তুমি ভাল স্কুলে ভর্ত্তি হওগে।"

এ কাজে খোদ মামার সম্মতি ছিল না,—তবে মামীর মতেই মামার মত,—ইহা চির-প্রসিদ্ধ। কাজেই কালাচাঁদ মাসিক ১৲ টাকা মাহিনা দিয়া অন্য একটা স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

ভর্ত্তি হইয়া, দু-দশদিন স্কুলে গিয়া, কালাচাঁদ সে স্কুলে আর গেলেন না। কিন্তু গৃহ হইতে প্রত্যহ দশটার সময় আহারাদি-পূর্ব্বক, বই হাতে করিয়া, তিনি বাহির হইতেন; আর মাস অন্তে মামীর নিকট হইতে ১৲ টাকা স্কুলের মাহিনা আদায় করিতেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রত্যহ ময়রার দোকানে, মণিহারির দোকানে খাইয়া-খেলিয়া বেড়ান। কেহ বা, গুলির আড্ডায়

ঢুকিতে তাঁহাকে দেখিলেন। যে পল্লিতে মূর্ত্তিমতী স্ত্রীস্বাধীনতা, সেখানেও কালাচাঁদকে এক-আধদিন কেহ কেহ দেখিতে পাইলেন।

কালাচাঁদ চেরাসিঁথি কাটেন, পমেটম মাখেন,—মিহিধূতি না হ'লে পরেন না, আতর-লেবেণ্ডার না হ'লে পথ চলেন না, ছাঁকা-টপ্পা ছাড়া অন্য পুস্তক হাতে করেন না;—ভাগিনার ক্রমশ এইরূপ শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া করুণাময়ীর হৃদয়ে আনন্দের লহরী-লীলা উঠিতে লাগিল। করুণা, ভালবাসামাখা কালাচাঁদকে দেখিত, আর মনে মনে বলিত, "আহা! ছেলেটী যদি বাঁচে, তাহ'লে আর আমার দুঃখ কি?—বিধেতা কি আমার এমন অদেষ্ট করেচেন যে, ও বাঁচবে!!"

কোন আপদ-বালাই নাই, কালাচাঁদ সুস্থ-শরীরে, স্বচ্ছন্দমনে, নির্ব্বিঘ্নে দিব্য বাড়িতে লাগিলেন। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, কালাচাঁদ চিরদিনই পূর্ণচন্দ্র।

পিতৃভূমির সহিত কালাচাঁদের বিশেষ কোন

সম্পর্ক ছিল না। মাতুলালয়ে জন্ম, মাতুলালয়ে মানুষ,—বর্দ্ধমানে মাতুলের নিকট লেখা-পড়া শিক্ষা,—সমস্তই তাঁহার মাতুল। পিতার যা কিছু যৎসামান্য বিষয়-সম্পত্তি ছিল, মাতুলই তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বর্দ্ধমানের বাসায় অবস্থানকালে তিনি একবার মাত্র পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমান্ কালাচাঁদ দত্ত,—মাষ্টার কিসে? প্রশ্ন বড় গুরুতর। সমস্যা বড় বিষম। স্বয়ং কালাচাঁদ এ-কথার কোন উত্তর দেন না। অথচ এ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অনেকেই তাঁহাকে কালাচাঁদ মাষ্টার বলিয়া ডাকেন।

কালাচাঁদের একজন পার্শ্বচরের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যে আভাস পাইয়াছি, তাহাই এ স্থলে বিবৃত হইল। বিংশতি বৎসর বয়সে, কালাচাঁদের বর্দ্ধমানে পাঠশেষ হয়। ইতিপূর্ব্বেই তিনি সর্ব্ব-স্কুলে আউট হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার মামার মৃত্যু ঘটে। করুণাময়ীর দারিদ্র্যদশা উপস্থিত। গহনাপত্র যা ছিল, সমস্তই গেল। বাটীটী বন্ধক পড়িল। ক্রমে দিন যাওয়া ভার হইল। পিতল কাঁসার থালা, ঘটি, ঘড়া, ঘরে আর কিছুই নাই। তখনও কিন্তু তিনি কালাচাঁদকে ছাড়েন নাই।

করুণাময়ী বিড়ালটাকে তাড়াইলেন, ময়না পাখীটাকে উড়াইলেন, লক্ষ্মীপূজার কড়ী কয়কড়াও বেচিলেন, কিন্তু কালাচাঁদকে ছাড়িতে পারিলেন না। কালাচাঁদ সন্তানতুল্য ;—করুণাময়ীর জীবনধন সর্ব্বস্ব,—অন্ধের নড়ি, আঁধারের আলো, দরিদ্রের সোণা।

করুণা এই সময় মাঝে মাঝে বলিতেন, "বাবা, তোমার একটী চাকৃরি দেখে মত্তে পার্‌লেই আমার দুঃখ ঘোচে। চাকৃরীর একবার চেষ্টা চরিত্তির দেখ্‌লে হয় না?" এ সব কথায় কালাচাঁদ বড় একটা উত্তর দিতেন না। করুণাময়ীর উপর তাঁহার ঔদাসীন্যেব আরও বিবিধ কারণ জন্মিল। সে-রকম ঘন দুধ, সর, চাঁচি—তিনি আর কিছুই পান না; ঘি ময়দার কাজ যেন দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। অর্দ্ধেক মাছ, অর্দ্ধেক ভাত না হইলে, কালাচাঁদ পূর্ব্বে ভাত খাইতে বসিতেন না;—কিন্তু করুণাময়ীর অদৃষ্ট-দোষে আজ তাঁহাকে পুঁইশাক চড়্‌চড়ি ও আমড়া-ভাতে দিয়া আউশ চালের ভাত খাইতে হয়।

জঠর-জ্বালায়, কালাচাঁদ মাঝে মাঝে দুই এক দিন নিরুদ্দেশ হইতেন। করুণার অমনি দুই চক্ষু দিয়া হুহু জল পড়িত।

একবার একমাসকাল কালাচাঁদ ঘরে ফিরিলেন না। বর্দ্ধমানস্থ বন্ধুবান্ধবগণও তাঁহার কোন সংবাদ বলিতে পারিল না। করুণা সাধ্যমত অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। ক্রমে এক মাস অতীত হইল,—কালাচাঁদকে বর্দ্ধমানে কেহ দেখিল না। করুণাময়ী ভিখারিণী—কোন দিন খাইতে পান, কোন দিন পান না। কালাচাঁদের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি অন্ধ হইয়াছেন। মাথা রুখু, কাপড় ছেঁড়া,—জল খাইবার একটী ভাঙ্গা ভাঁড়মাত্র অবশিষ্ট আছে। করুণা উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন,—সেবা করিবার কেহ নাই, ঔষধ-পথ্য দিবার কেহই নাই,—করুণা সংসারে একাকিনী। দিবসত্রয় মধ্যে তিনি শমন-সদনের অতিথি হইলেন।

কালক্রমে, বর্দ্ধমানের বন্ধুগণ সংবাদ পাইল,

কালাচাঁদ নিজগুণে গবেশ-গ্রামের ইংরেজী-স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদে মনোনীত হইয়াছেন। হেড্-মাষ্টার হইয়া তিনমাসকাল তিনি খুব প্রতিপত্তি ও সমারোহের সহিত কার্য্য করেন। কিন্তু তাঁহাব জ্ঞান ও বিদ্যার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, গ্রামের সকলের ঈর্ষ্যা-প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিল। তাহারা এক-যোট হইয়া, ষড়যন্ত্র করিয়া, ফৌজদারী আদালতে তাঁহার নামে এক গুরুতর অভাবনীয় অভিযোগ আনিল। শেষে বর্দ্ধমানে দায়রার বিচারে তাঁহার তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইল। জেলখানা ঢুকিবার পূর্ব্বে কালাচাঁদ নিজদলস্থ বর্দ্ধ-মানের বন্ধুগণকে বলিয়া গেলেন, "কোন ভয় নাই; আমি শীঘ্র ফিরিতেছি;—তোমরা মনে করিওনা যে, মাষ্টারি-পদ আমি হারাইয়াছি।" কালাচাঁদের "মাষ্টার" উপাধির ইহাই আরম্ভ—সূত্র—আদি—মূল—কারণ—যা'বল তাই। এ সম্বন্ধে আর কিছু কেহই জানে না। সে যাহাই হউক, সম্ভবত এইরূপেই কালাচাঁদ,—মাষ্টার হইলেন।

কালাচাঁদ কিন্তু চিরদিনই 'মাষ্টার' বলিলে চটিতেন। যেখানে মাষ্টার-নাম উচ্চারিত হইত, সেখানে তিনি আর তিষ্ঠিতেন না। জেলে ঢুকিবার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন বটে, "মনে করিও না যে, আমি মাষ্টারি-পদ হারাইয়াছি,"—কিন্তু জেল হইতে বাহির হইবার পর, মাষ্টার-নাম শুনিলেই তাঁহার কেমন আতঙ্ক হইত। ইহাকে বালকত্বই বল, আর ধাতুদৌর্ব্বল্যই বল,—ফল কথা ইতিহাস এইরূপই।

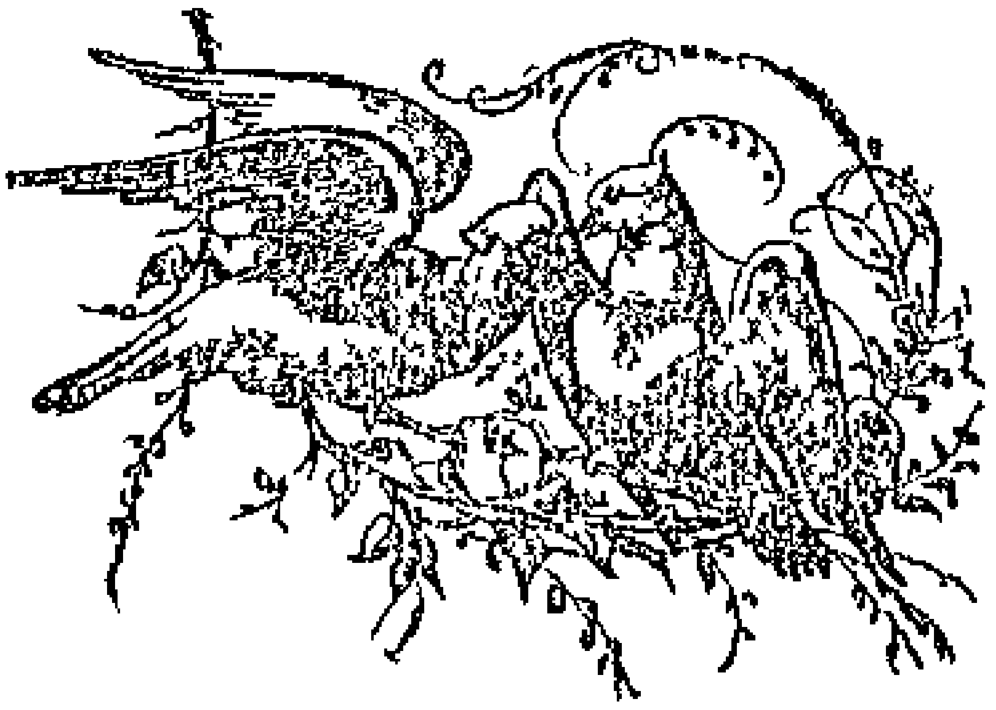

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘটনাচক্রে পড়িয়া, কালাচাঁদ বর্দ্ধমান হইতে অন্য কতকগুলি কয়েদীর সহিত হুগলী-জেলে আনীত হইলেন।

কারাবাসে কালাচাঁদ কি করিলেন? ভাবনা নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, স্বচ্ছন্দে, পরমানন্দে তিনি তথায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তিনি আহ্লাদে ঘোর-রবে ঘানি ঘুরাইয়া তেল বাহির করিতেন। গায়ে বিলক্ষণ জোর ছিল;—অপরে বহুকষ্টে আট ঘণ্টায় যে তেল বাহির করিত, কালাচাঁদ তাহা পাঁচ-ছয় ঘণ্টায় শেষ করিতেন। কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটি নাই, অবহেলা নাই, আলস্য নাই, কালাচাঁদ কর্ম্মকে যেন ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। জেলখানার মোড়ল, বরকন্দাজ, নায়েব, দারোগা, বড় সাহেব—সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইল!

কিন্তু এক উৎপাত ঘটিল। তাঁহার ক্ষুধা কিছুতেই

ভাঙ্গে না। প্রাতে পাঁচ ছটাক, আর সন্ধ্যাবেলা চারি ছটাক—এই নয় ছটাক চেলের অন্ন তাঁহার'ত—জলপান! উদরের এক কোণ্ পূরে কি না সন্দেহ! প্রত্যহ অর্দ্ধাশনে বা অনশনে তাঁহার ঈষৎ উদরাময় জন্মিল। দেহও দুর্ব্বল হইতে লাগিল।

কষ্টের উপর কষ্ট। পূর্ব্বে তিনি প্রায় ২৪ ঘণ্টাই তামাক খাইতেন; তামাক না হইলে তাঁহাব একদণ্ডও চলিত না। কিন্তু প্রথমমাসে জেলে একটী দিনও তামাক পাইলেন না। সরস কলিজা শুকাইতে লাগিল।

কিন্তু একমাস মধ্যেই তিনি জেলখানাব হাটহদ্দ সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এখন কারা-নিয়ম কিরূপ, তাহা জানি না, বুঝি না; কিন্তু সে সময় নিয়ম বুঝি একটু স্বতন্ত্র ছিল!

কালাচাঁদের ডাইবিতে এইরূপ সাঁটে লেখা আছে;—"বড়-মোড়লের সঙ্গে ভাব। বুঝাইলাম, আমি একজন ধনশালী ব্যক্তি। মুক্তির পর তোমার ভাল করিব। বড়-মোড়ল মুসলমান। সে আমার

গোলাম হইল। * * * প্রাতে উঠিয়াই গুড়-মুড়ি। বেলা ১১টার সময় মাছের ঝোল, অম্বল, দই, ডাল, তরকারী ও প্রায় একসের মিহি-চেলের ভাত। কাজ-করা সখের উপর নির্ভর। * * *। অদ্য গয়ার তামাক; সন্দেস-গুলায় গন্ধ,—গাঁজা ফুরাইয়াছে। * * *। বড় মজা। পৌষমাসের কন্‌কনে শীত—গরম গরম চেনাচুর—১৮৸৹ ভাজা; অল্প সুধা,—ঢালাও সিদ্ধি। * * *। শ্রীপঞ্চমীতে যাত্রা—কেলুয়া ভুলুয়া বেশ সেজেছিল। * * *। দাঙ্গা, রক্তপাত, জয়—প্রভুত্ব-বৃদ্ধি। ১২টা সীতেভোগ—৬খানা লুচি—এক মালসা দই। * * * তাস খেলা—পাশা—দশপঁচিশ—জুয়া। * * *। লালা-পেড়ে ধূতি, রেশমের চায়নাকোট, বার্ণিস করা জুতা, এলবার্ট টেড়ি। * * *।—”

ইত্যাকার ডাইরি দেখিয়া কি বুঝিব, তাহা জানি না। মোদ্দা, ছয় মাসের মধ্যে কালাচাঁদের দেহ মত্তমাতঙ্গের মত হইল। সকলে তাঁহাকে হাতী বলিয়া ডাকিত।

সাহেব, বিবি এবং কালাচাঁদ।

অষ্টম মাসের ওজনে কালাচাঁদ ৩ মন ১৫ সের হইলেন। তখন কাবাধ্যক্ষ একজন গৌরাঙ্গ সাহেব ;—হাস্যময়ী, স্থূলোদরী, স্ফীতাঙ্গী, বিড়ালাক্ষী বিবিটী স্বামি-পার্শ্বে, পঞ্চম-বর্ষীয়া কন্যার আঙ্গুল ধরিয়া দণ্ডায়মান। স্ত্রীপুরুষে অনিমিষ-লোচনে, কালাচাঁদের ওজন-কাণ্ড দেখিতেছিলেন। ওজন দেখিয়া বিবি হাসিয়া উঠিলেন। সাহেব ইংরেজীতে তামাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি আর হাসিও না।" বলা বাহুল্য, বিবিটী একটু মোটা। বিবির কৃত্রিম কোপের সহিত আবার ফুটন্ত হাসি মিশিল।

কালাচাঁদ ওজন-যন্ত্র হইতে নামিলে, বিবির মেয়েটী কালাচাঁদের কোলে উঠিবার চেষ্টা করিল। কালাচাঁদ এ সুবিধা ছাড়িলেন না। অমনি ব্যস্ত হইয়া, মেয়েটীকে কাঁধে করিলেন। কন্যা কাঁধে চাপিয়া, বড়ই আহ্লাদিত হইয়া, টব্-স্থিত গোলাপ গাছ হইতে একটী ফুল ছিঁড়িবার বহু চেষ্টা করিল ;—কিন্তু পারিল না। কালাচাঁদ বাঁ হাতে করিয়া, পট্ করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া, মেয়েটীর হাতে

দিলেন। কন্যারত্ন, আনন্দে ভোর হইয়া, কালাচাঁদের কাঁধে হেলিতে ঢুলিতে, খেলিতে লাগিল। অন্যান্য কয়েদীগণ 'হাতীর' কাণ্ড দেখিয়াই অবাক্।

এইরূপ পাঁচ মিনিট অতীত হইলে, বিবি, কন্যাকে কালাচাঁদের কাঁধ হইতে নামাইবার জন্য, হাত পাতিয়া কোলে লইতে গেলেন। কন্যা এ ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়াই আকুল,—দুই হাতে করিয়া কালাচাঁদের গলা জড়াইয়া ধরিল,—কোন মতেই নামিতে চাহিল না। মহামুস্কিল। তখন বিবির আদেশ অনুসারে কালাচাঁদ কন্যাকে কাঁধে করিয়াই দ্বিতলের গৃহে বিবির অনুগমন করিলেন। তিনি প্রায় একঘণ্টা পরে, বহুযত্নে কন্যাকে বিবির কোলে দিয়া নীচে অবতরণ করিয়া অন্যান্য কয়েদীর সহিত মিশিলেন।

কালাচাঁদের পদবৃদ্ধি হইল। জেলখানায় আবার পদোন্নতি কিরূপ? তা'ত জানি না। কিন্তু লোকে কাণাকাণি করিল, কালাচাঁদের এইবার সুখের কাজ হইয়াছে।

জেল-প্রাচীরের বাহিরে, ঠিক বড়-ফটকের সম্মুখে, একটী ক্ষুদ্র ঘর আছে। সেই ঘরে বসিয়া, একজন কয়েদী তৈল বিক্রয় করে। যে কারাবাসী, এই তৈল-বেচা-ভার পায়, তাহাকে লোকে ভাগ্যবান্ বলিয়া থাকে। কালাচাঁদ কালক্রমে এই পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এইসূত্রে বহুলোকের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় দেখা-সাক্ষাৎ হইল। একক্রোশ ব্যাপিয়া চতুঃসীমাবর্ত্তিনী ঝী-মণ্ডলী, ক্রমশ কালাচাঁদের গুণে মুগ্ধ হইয়া, দোকানে তেল-কেনা একেবারে বন্দ করিল,—সকলেই জেলাখানার খাঁটি সরিষার ঝাঁজালো তৈল কালাচাঁদের কাছ হইতে আনিতে লাগিল। চাকর, খানসামা, ভারী,—পুরুষজাতীয় বহুবিধ ব্যক্তির সহিতও তাঁহার সদ্ভাব জন্মিল।

জেলখানায় থাকিয়া, অনেক পুরাণ, পাকা কয়েদীর সহিত মিশিয়া, কালাচাঁদ নানা রোগের ঔষধ এবং মন্ত্র শিখিয়াছিলেন। ঝী চাকর প্রভৃতিকে নানা ঔষধের উপদেশ দিতেন। দ্রব্যগুণে তাহারা

বিষয় বশীভূত হইল। এই সময় পতিতপাবন নামক কোন নাপিতের সহিত কালাচাঁদের বিশেষ প্রীতি-সৌহার্দ্দ জন্মে।

এই অবস্থায় মাঝে মাঝে কোন কোন চাক্‌রাণীর সহিত কালাচাঁদের ঝগড়াও হইত;—তৈল কেহ বেশী, কেহ কম পাইত;—তাঁহার ওজন ঠিক ছিল না। একদিন একজন জেল-গোয়েন্দা, তাঁহার নামে চুরীর অভিযোগ আনিল। কালাচাঁদ তৈল বিক্রয়ার্থ যেস্থলে বসিতেন, সেই স্থলের মাটীর নীচে নগদ ৫৲ টাকা এবং ।৶১০ পয়সা দেখা গেল। কালাচাঁদ জেল-সাহেবের কাছে অনেক কাঁদিলেন-কাটিলেন,—বলিলেন, "আমি ইহার কিছুই জানি না;—কোন মন্দ ব্যক্তি, কু-অভিপ্রায়ে আমাকে জব্দ করিবার জন্য, ঐ টাকা পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছে।" কালাচাঁদের বিষম ক্রন্দনে মেম-সাহেব পর্য্যন্ত দ্বিতল হইতে নিম্নতলে অবতরণ করিলেন। বিচারে প্রমাণ হইল, "কালাচাঁদ নির্দ্দোষ।" সাহেব কালাচাঁদকে খুব সাবধানে কাজকর্ম্ম করিতে

অনুমতি দিয়া বিবির হাত ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

ক্রমশ কারাগারে কালাচাঁদের অদ্ভুত বিক্রম বাড়িল। তেলের ঘরে বসিয়া তিনি মিহিসুরে গান করেন, সিস্ দেন, হাসি তামাসা ইয়ার্কি করেন,—আর চাকর-চাকরাণীকে তেল বেচেন। প্রকৃতই তাঁহার সুখের সীমা রহিল না। জেলখানা শ্বশুর-বাড়ী হইল কি? না, তা অপেক্ষা কিছু অধিক হইল। লোকে বলে,—

শ্বশুর বাড়ী মথুরাপুরী,
তিনদিন পরে ঠেঙ্গার বাড়ী।

কিন্তু কালাচাঁদ, বারমাস সমভাবে থাকিয়া, একটীদিনের জন্য কামাই না করিয়াও, জেলখানায় নিতি নিতি নব নব আদর পাইয়াছিলেন। অবশেষে কাল পূর্ণ হইলে, তিনি অনিচ্ছাস্বত্বে, জেলগৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। খালাস হইবার দিন, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে, কালাচাঁদ বিবিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। বিবি হাসিয়া বলিলেন,

"কালেচাঁড। টুমি মট্যে মট্যে হামার সহিট্ ডেখা কর্‌বে।"

কালাচাঁদ ভগ্নহৃদয়ে শূন্যমনে বিদায় হইয়া চলিলেন। খানিক যান, আর পেছন ফিরিয়া জেল-খানাপানে এক একবার চাহিয়া দেখেন। দেখিতে দেখিতে তিনি গলিমধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতই কালাচাঁদকে লইয়া আমি এখন বিব্রত। এ চিত্র কি আঁকা যায়?—এ চরিত্র-ফুল কি ফুটান যায়? আমি ত অক্ষম! তবে না জানিয়া, না শুনিয়া—না ভাবিয়া, না বুঝিয়া,—হঠাৎ এ কাজে হাত দিয়াছি, চারা নাই;—তাই যেমন করিয়াই হউক, শেষ করিতেই হইবে;—আধা-আধি ফেলিয়া রাখিলে গ্রন্থকারের আধ-কপালে ধরিতে পারে। আর তাহাতে কালাচাঁদ রুষ্ট, পাঠকের মনঃকষ্ট, বাঙ্গালা-সাহিত্যের সম্ভ্রম নষ্ট, মানস-গ্রন্থখানি কীটদষ্ট,—বন্ধুগণ অসন্তুষ্ট, বিপক্ষ-পক্ষ হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে। অতএব লিখি।

কিন্তু সুখ নাই, তৃপ্তি নাই। বাল্মীকির মত দৈববল, বেদব্যাসের মত বিদ্যাবল, যদি একাধারে থাকা সম্ভব হইত, তাহা হইলে একদিন ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী কালাচাঁদের পূর্ণশোভা লোক-সমাজে দীপ্তি

পাইতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থকার অধম,—নিগুর্ণ, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্বিকার! মহামতি কালাচাঁদ! দুঃখ করিও না; বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে বল?

অথবা ভয় কি?—দুর্গতিনাশিনী, গণেশ-জননী দুর্গার স্মরণ লইয়া লেখনী ধরিলাম!—চিন্তা কি?

হুগলীই কালাচাঁদের প্রথম প্রধান লীলাভূমি। হুগলীতেই তিনি বিষম অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং হুগলীতেই তিনি তাঁহার প্রথম অশ্বমেধযজ্ঞ শেষ করেন। হুগলীই তাঁহার কুরুক্ষেত্র, হুগলীই তাঁহার নিধু-নিকুঞ্জবন।

শ্রীমান্ কালাচাঁদ দত্তের লীলাক্ষেত্র হুগলীর ঐতিহাসিক-রহস্য একটু ভেদ করিলে ক্ষতি কি?

হুগলী সমৃদ্ধিশালী জনপদ। জ্ঞান, বিদ্যা, ধনধান্যে পূর্ণ। এখানে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ নাই। তবে ইংরেজ-শাসনের যখন ক্রমশ পূর্ণ-ষোলকলা বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল, তখন অবধি জ্বর বৃদ্ধি, মোকদ্দমা বৃদ্ধি এবং অন্ন-কষ্টের সূত্রপাত!

এত অধিক লোকসংখ্যা পৃথিবীর আর কোন

জনপদে নাই। ১৮৭২ অব্দের গণনায় ঠিক হয়, হাবড়া বাদ দিয়া হুগলী-জেলার বিস্তৃতি ১২২৩ বর্গ-মাইল,—লোক-সংখ্যা ১১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৮৫ মাত্র। কিন্তু ৯ বৎসর পরে ১৮৮১ সালের গণনায়, দেখা যায়, ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬১৭ জন লোক কমিয়াছে। জ্বর এবং অন্নকষ্ঠ, হ্রাসের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

হুগলী জেলা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ব্রাহ্মণ ৭৬ হাজার ২৭১ জন, কায়স্থ ২৫ হাজার ৪৮৪ জন; ...ান ৬৫৫ জন, বৌদ্ধ ২৯০ জন, এবং ব্রাহ্ম ... জন।

ভাগীরথী, দামোদর, রূপনারায়ণ—নদীত্রয় হুগলী ...ায় প্রবাহিত। পর্ব্বত নাই, হ্রদ নাই, প্রস্রবণ ...।

ঐতিহাসিকের চক্ষে বোধ হয় দিল্লীর পরেই সপ্ত... অধিক রমণীয়, আদরণীয় হইবে। হুগলী তখন প্রাচীন ইতিহাসের অনন্ত-খনি। এক হুগলী টাকশ... ...তিহাসের নানা স্তর হৃদয়ে অঙ্কিত হয়।

গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী আদালত-গৃহের সম্মুখস্থ ভূখণ্ডটুকুকেই হুগলী বলিয়া কেহ যেন না বুঝেন। দেড় ক্রোশ দূরস্থিত সপ্তগ্রাম হুগলীর জন্মভূমি। সপ্তগ্রাম এখন বিজন-কানন বলিলে অত্যুক্তি হয় না;—কয়েক ঘর মাত্র লোকের বসবাস আছে। ইষ্টইণ্ডিয়া-রেল-কোম্পানীর হুগলী এবং মগরা—এই ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের কাছেই-বিঘাকয়েক জমী পরেই, বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম বা সাত গাঁয়ের শেষ-চিহ্ন,—কঙ্কালাবশিষ্ট বিদ্যমান। প্রস্ত বা ইষ্টক-নির্ম্মিত অতি প্রাচীন গৃহের ধূলিসাৎ ধ্বং ব্যাপার এখনও সেখানে অতি কষ্টে ঈষৎ দে যায়। মহাকালের কি বিচিত্র লীলা!—আজ ত্রি বিঘার নামে সপ্তগ্রামের পরিচয় করিতে হইল। সপ্তগ্রাম একদিন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগর ছি তৎকালের ইউরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ অধিষ্ঠিত রোমীয় বণিক্‌গণ যে সপ্তগ্রামে অর্ণব লইয়া বাণিজ্য আকাঙ্ক্ষায় উপনীত হইত; ভ সমগ্র শিল্পজাত দ্রব্য, রপ্তানির জন্য যে স

সহিত

স্তূপীকৃত হইত; সুন্দরতটশালিনী জাহ রূপীজ-
বিভূষিতা স্রোতস্বতী, যে সপ্তগ্রামের একদিন নবাস-
পাদপদ্ম বিধৌত করিত; বিদ্যা, ধন, বল যে সপ্ত হারা
একদিন একচেটিয়া ছিল, সে সপ্তগ্রাম আজ শ্ম খল
—শৃগাল-কুক্কুর-শূকর-সর্পের আবাসভূমি!—ক্ষুদ্রাদা য়র
ক্ষুদ্র ত্রিশবিঘার নামে সুপরিচিত!! অহো
বসুন্ধরা সেইরূপই পতিত, বিস্তৃত, কিন্তু সে
সপ্তগ্রাম আর নাই! কবি কহিয়াছেন,—

কাল সৃষ্টি, কাল স্থিতি, কাল করে লয়।
সুখ দুখ সব সেই অতিক্রম্য নয়॥
কাল নিদ্রা জাগরণ কাল জল স্থল।
কাল স্বর্গ কাল মর্ত্ত সুধা হলাহল॥
বাল বাপ কাল সাপ ভিক্ষুক ভূপতি।
সংসারের সার সেই নাহি অন্যগতি॥

মুসলমান-বাদসাহের আমলে মন্ত্রিবর তুদরমল্ল, সপ্তগ্রামকে এক প্রধান 'সরকারে' বিভক্ত করেন। তখন তথায় কেল্লা, গড়, নবাবের বাড়ী ছিল; টাঁকশাল বসিয়াছিল। সেই 'সপ্তগ্রাম সরকারের'

গ ছিল,—আধুনিক হুগলী, বর্দ্ধমান, হাবড়া
ভূখং
দে তা এবং ২৪ পরগণা। প্রলয়কালে বিশ্ব-
স ও ধ্বংস হইয়া একমাত্র ব্রহ্মে বিলীন হয়।
শস্য-শ্যামল, সৌধমালা-সুশোভিত সুবিস্তৃত
গ্রাম, আজ যেন অতি সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া,
য়েক বিঘামাত্র জমীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল, সরস্বতী নদীতে বালী পড়িতে আরম্ভ হয়। কালক্রমে সপ্তগ্রামে বড় বড় জাহাজ আসিবার ব্যাঘাত জন্মিল। বালুকা-স্তূপে নদী ক্রমশই ভরাট হইতে লাগিল। ক্রমে নৌকার গতায়াতও বন্ধ হইল। ভাগীরথীর প্রবল-প্রতাপ এই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইল। তৎকালে ইউরোপীয় সওদাগরগণমধ্যে পর্ত্তুগীজরাই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তাঁহারা সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া হুগলীতে বন্দর খুলিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উঠিয়া আসিয়া হুগলীতে বাস করিলেন। ১৫৩৭ অব্দে, ৩৫২ বৎসর পূর্ব্বে এ ঘটনা ঘটে।

এই হুগলীতেই ইউরোপীয় জাতির সহিত মুসলমান-বাদসাহের প্রথম মহাযুদ্ধ ঘটে। পর্ত্তুগীজ-সওদাগরগণ হুগলীতে, ব্যবসা-উপলক্ষে আবাস-গৃহের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ক্রমশ তাঁহারা হুগলী-রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া, নবাবকে বেদখল করিয়া দিলেন। ১৬২৯ অব্দে নবাব-সৈন্যের সহিত পর্ত্তুগীজ-সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিল। এই সংগ্রামে এক হাজার পর্ত্তুগীজ-সৈন্য হত, তিন শত জাহাজমধ্যে ২৯৭ খানি জাহাজ ভাগীরথী-সলিলে নিমজ্জিত হয়, আর স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সমুদায়ে প্রায় ৪ হাজার পর্ত্তুগীজ, মুসলমান-হস্তে বন্দী হয়। রণে ভঙ্গ দিয়া, হুগলী ফেলিয়া, দুর্গ ছাড়িয়া, সমস্ত পণ্যদ্রব্য হারাইয়া, পর্ত্তুগীজ সওদাগরগণ পলাইয়া গেলেন।

এই সময় মুসলমান বাদসাহ, হুগলীকে রাজকীয় বন্দর করিলেন। দেওয়ানী, ফৌজদারী আদালত হুগলীতে স্থাপিত হইল। সপ্তগ্রাম ডুবিল, হুগলী উঠিল।

বঙ্গদেশে হুগলীই ইংরেজের প্রথম বাণিজ্য-স্থান। ১৬৪০ অব্দে হুগলীতে ইংরেজ প্রথম কুঠী-স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যাস্থ বালেশ্বরের অন্তর্গত পিপ্‌লী নামক স্থানে ইংরেজ ব্যবসার নিমিত্ত প্রবেশ-অধিকার পাইয়াছিলেন।

এই হুগলীতেই ইংরেজের সহিত মুসলমানের প্রথমে সংঘর্ষণ ঘটে। ১৬৮৫ অব্দে আখড়াধারী ইংরেজ-বণিকের সহিত নবাবের বিবাদ হয়। বণিক্-গণ নরম হইলে বিবাদ সহজেই মিটিত। এই সময় কয়েকজন গোরা হুগলীর বাজারে বেড়াইতে যায়। কথায় কথায় নবাব-সৈন্যের সহিত তাহাদের ঝগড়া হয়। ক্রমে গালাগালি আরম্ভ হইল। শেষে হাতাহাতি চলিল। এই সামান্য কারণেই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। হুগলীতে যত গোরাচাঁদ ছিলেন, সকলেই এ দাঙ্গায় যোগ দিলেন। তখন সশস্ত্র মুসলমান-সৈন্য কাতারে কাতারে বাহির হইল। ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া

ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষ হুগলী সহরে আগুন ধরাইয়া দিয়া নৌকাযোগে পলাইলেন; পাঁচ শত ঘর পুড়িল; সেই সঙ্গে ইংরেজ-বণিকের গুদামও দগ্ধ হইল। এই ব্যাপারে ইংরেজের প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মাল নষ্ট হয়।

হুগলীতেই ইউরোপীয় জাতির প্রথম খৃষ্টান-গির্জ্জা বিনির্ম্মিত হয়;—১৫৯৯ অব্দে পর্ত্তুগীজগণ বাণ্ডেল-চর্চ্চ স্থাপিত করেন।

শুধু পর্ত্তুগাল বা ইংলণ্ড নহেন, ইউরোপের অধিকাংশ জাতিই সে সময় হুগলী জেলায় আধিপত্য বিস্তার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া লয়েন। ১৮২৫ অব্দে যবদ্বীপ বদল দিয়া ইংরেজ, ওলন্দাজের নিকট চুঁচুড়া-টুকু গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুর, দীনেমার-সওদাগরগণের দখলে আইসে। ১৮৪৫ সালে ইংরেজ নগদ সাড়ে বার লক্ষ টাকা দিয়া, শ্রীরামপুর এবং আরও দুইখানি গ্রাম দীনেমারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লয়েন। চন্দননগর আজও

ফরাসীর অধিকারভুক্ত। তাই বলিতেছিলাম, হুগলী ইতিহাসের অনন্ত খনি।

অদূরে দেখ, ভট্টপল্লী পণ্ডিতমণ্ডলীর আবাস-ভূমি। গৌরীভা-কাঞ্চনপল্লী বৈদ্যগণের বাসস্থান। আর শিবপুর-বংশবাটী অবধি চন্দননগর পর্য্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণ-উপকুল সম্ভ্রান্ত, সঙ্গতিপন্ন, স্বকার্য্যক্ষম বণিক্ এবং শিল্পকরগণকর্ত্তৃক সুশোভিত ছিল।

কালে সমস্তই বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে কেবল চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। তালগাছ নাই,—কেবল তালপুকুর নামটী আছে।

আজও স্থানে স্থানে গঙ্গাগর্ভে ইটের বনিয়াদ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান-হর্ম্ম্যের কি ইহাই পরিণাম? হুগলী-জেলখানার ঠিক্ পাশেই ঘোল-ঘাটে পর্ত্তুগীজ-দুর্গের শেষ-চিহ্ন (কবির চক্ষে) আজও ঈষৎ দৃষ্ট হয়। ব্যাণ্ডেলগির্জ্জার বাঁধাঘাট হইতে ভাগীরথী প্রায় পাঁচ শত হাত সরিয়া আসিয়াছেন;—ঘাট সেইরূপই পড়িয়া আছে, জল নিকটে নাই।

ক্ষণজন্মা পুরুষ, দৈববশে আপন উপযুক্ত লীলাক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া লয়েন। নচেৎ মহামতি কালাচাঁদ এই ঐতিহাসিকভূমি হুগলীতে পদার্পণ করিবেন কেন?

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কারাবাস-কালে হুগলীতে কালাচাঁদের অনেক বন্ধুবান্ধব'ত যুটে-ই; তা ছাড়া, তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় "দেশের লোক" বা জ্ঞাতি-কুটুম্ব হুগলীতে তখন ছিলেন।

কালাচাঁদের ঠাকুরদাদা হুগলী-প্রবাসী। নাম হরিতারণ। ইনি কি রকম ঠাকুরদাদা বুঝা উচিত। রামতারণ এবং হরিতারণ দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ রামতারণ, কনিষ্ঠ হরিতারণ। কালাচাঁদ জ্যেষ্ঠ রামতারণের পৌত্র। এ বংশের আর কেহই নাই,—কেবল একমাত্র কালাচাঁদ।

কাজেই হরিতারণ কালাচাঁদের ঠাকুরদাদা। তিনি হুগলীর জজ-আদালতে সেরাস্তাদারী বা দেওয়ানী কাজ করিতেন। একটু দূর-সম্পর্কীয় একজন মেসো নাজির ছিলেন। কালাচাঁদের গ্রামবাসী একজন ব্রাহ্মণ, হুগলীর প্রসিদ্ধ মোক্তার

ছিলেন। গ্রামের আরও কয়েক ব্যক্তি দোকান-পসার করিত।

কালাচাঁদ জেলখানা হইতে মুক্ত হইয়া হুগলীস্থ কোনও আত্মীয়-স্বজনের গৃহে গেলেন না;—বন্ধু পতিতপাবন পরামাণিকের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন।

পতিত-পাবন বেশ সভ্য নাপিত। এরূপ প্রসিদ্ধি,—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন জাতিকে পতিত কামায় না। তবে গোয়ালা, ধোপা, বা সুবর্ণবণিক্—বড়মানুষ হইলে, ইহাদের বাড়ী পতিত পদার্পণ করিয়া থাকেন। হাতে-পাতে ধরিয়া কেহ যদি জিজ্ঞাসেন,—"কিহে পতিত! তুমি গয়লা-বাড়ী কামাও নাকি?" পতিত উত্তর দেন, "কি কর্ব্বো বলুন,—পতিত কারো কথা ঠেল্‌তে পারে না।—সেদিন ঘোষজা-মোশাই গাড়ী করে যাচ্চেন,—আমিও রাস্তা দিয়ে যাচ্চি—তাঁকে দেকে ছাতার আড়াল দিলেম,—ঘোষজা কিন্তু আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে, গাড়ী থামিয়ে ফেল্‌লেন;

তিনি ডেকে আমাকে বল্‌লেন,—'এসো এসো, পতিত। এসো।'—আমি কি করি,—নিকটে গেলাম, —তখন ঘোষজা আমাকে আদর করে পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্‌লেন, 'পতিত! কামিয়ে আর কোথাও সুখ পাই না। তোমার কামানো যেমন মিষ্টি, তেমন আর কারু নয়। খুর চলে যায়,—ঠিক যেন জল চলে যায়। কামাতে কামাতে ঘুম আসে। তা, কালথেকে তোমাকে আমায় কামাতে হবে।'—এই বলে তিনি ঠংকরে একটী টাকা আমার হাতে ফেলে দিলেন। আমি বড় বিপদে পড়িলাম। এই, কথায় বলে,—

মুখ এড়াতে নারে যে।
শতেক পতি করে সে॥

তা, পতিতের হয়েছে তাই। কি কর্‌বো বলুন,—তা, ঘোষজা অতি সদ্বংশ;—গোয়ালা হ'লো হয় কি?"

পতিত, ব্রোহ্মণবাড়ী কামাইতে গিয়া বলেন,— "আমার ঠাকুদ্দা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহারও দাড়ীতে

পতিতপাবন পরামাণিক।

খুর দিতেন না। তবে আমরা, কি জানেন,—কাচ্চা-বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি,—দু-টাকা দু-সিকে রোজগার না করলে চলে না,—কাজেই ভদ্দর ভদ্দর দেখে দু-চারি ঘর কায়স্তবাড়ী কামাইতে হয়। তবে কায়স্থদের পায়ের নখ আমি কাটি না। ঠাকুদ্দার নিষেধ আছে।”

কায়স্থ-গৃহে গিয়া পতিত বলেন, “দেশের যা বড়লোক, তা আপনারাই। জমীদার বলুন, হাকিম বলুন, দেওয়ান বলুন,—সকলেই কায়স্থ। তা, আপনাদের চরণসেবা করে দু-মুঠা অন্ন পাই বলেই, আমি এখনও সংসার চালাচ্ছি। বামুন জেতের পয়সা নাই,—আছে কেবল মুখে ভুয়া আশীর্ব্বাদ।”

বেশ সাজ-সজ্জায় পতিত কামাইতে বাহির হন। মাথায় পুরাণ কাপড় জড়াইয়া পাগড়ী বাঁধা হয়। গায়ে হাপ্‌-চাপকান। পায়ে জুতা। চিড়িয়া-বুটির একখানি জামিয়ার আছে।—পতিত ১লা কার্ত্তিক হইতে চৈত্রের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সেখানি গায়ে দেন। শাল পুরাতন, নানাস্থানে তালিযুক্ত হইলেও,

সে শালের যত্ন কত!! শাল অঙ্গে উঠিলে, তাহার উপর একখানি মলমলের চাদর গায়ে দেওয়া হয়। অনেক চল্লিশবর্ষ-বয়স্ক ব্যক্তি বলেন, তাঁহারা চিরদিনই পতিতকে ঐ শাল এবং মলমলের চাদর গায়ে দিতে দেখিতেছেন। কিন্তু শালের ভাব চিরদিনই সমান—অমাবস্যা-পূর্ণিমা নাই, জোয়ার-ভাটা নাই,—হ্রাস-বৃদ্ধি আদৌ নাই।

এই শাল-বিষয়ক এক অপূর্ব্ব গল্প পতিত-মুখে প্রচলিত হইয়াছিল। শালখানির প্রথম অধিকারী দিল্লীর বাদ্‌সা। দিল্লীর বাদ্‌সা হইতে মুরশিদাবাদের নবাব তাহা প্রাপ্ত হন। নবাব হইতে উজীর। উজীরের বাটী হইতে চোরে শাল চুরি করিয়া লয়। পতিতের প্রপিতামহ, চোর ধরিয়া, শাল কাড়িয়া, তাহা দখল করেন। সেই অবধি এই নাপিতবংশ, ঐ শালের উত্তরাধিকারী।

যাহাই হউক, পতিত হুগলীতে দু-টাকা রোজ-গার করেন এবং তিনি অপরের নিকট আপনাকে সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন বলিয়া পরিচয় দেন। হুগলী

ের জেলখানার নিকটেই তাঁহার বাসা। গলীতে নিজে ঘর তৈয়ারি করিয়াছেন। ঘর। ঘরে মাটীর দেওয়াল,—খড়ের চাল। া ঘর বড়—সেখানিতে রন্ধন ও শয়ন— হয়। আর একখানি ছোট,—বৈঠকখানার সখানিতে বসিয়া গৃহে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে কামাইয়া থাকেন। কখন কোন আত্মীয়-স্বজন র আসিলে, সেই ঘরেই থাকে, বসে, শোয়। । ব্যতীত পতিতের একটী হরিনামের ঝুলি একখানি ৺বৃন্দাবনের নামাবলী ছিল। তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা ছিল। তিলকমাটী 'রাধা-কৃষ্ণ"—নাম-লেখা এক কাঠের ছাবা সন্ধ্যার পর সময়ে সময়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ "লক্ষ্মণের শক্তিশেল," "তরণীসেন-বধ" পাঠ হইত। ফলকথা, অনুষ্ঠানের কোন গসম্পূর্ণ ছিল না।

তের বাসা হুগলীতে,— বাটী ছিল হুগলীর ধনেখালি গ্রামে। পতিতের বয়স এখন

পঞ্চাশ। বৎসরের মধ্যে একবার ৺পূজা বাটী যান।

কালাচাঁদ যখন জেলখানায় বসিয়া তেল তখন পতিতের সহিত তাঁহার আলাপ পতিত উপযুক্ত পরামাণিক;—সুতরাং সহজেই পরস্পরের ভাব ঘনীভূত হইল। একসের তেল কিনিতে গেলে, কালাচাঁদের পাঁচ-পোওয়া পান। পতিতও, আমের সময় লিচুর সময় লিচু, বর্ষাকালে চাল-কড়াই-ভাজা, নূতন খেজুরে গুড়ের সন্দেস, দিয়া নিয়তই চাঁদের মনোহরণ করিতেন। বাস্তবিকই ক্রমে মাখামাখি হইল। সুতরাং মুক্তিলাভের পর কালাচাঁদ পতিতের গৃহে আশ্রয় লইবেন, আর বিচিত্র কি?

স্বেচ্ছাবিহারী বনবিহঙ্গের ন্যায় ইতস্তত হইলেও, মুক্তিলাভে কালাচাঁদের মনটা কেমন হইল না! তাঁহার হৃদয়ে কি যেন একটা ভাবনার উদয় হইল;—গুম্ হইয়া নিঝুমভাবে

দণ্ডে তিনি মাঝে মাঝে বসিয়া থাকিতেন। অন্নে রুচি নাই। দেহ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। লম্বোদর শুকাইল। চোখের কোল বসিল। কণ্ঠের হাড় দেখা দিল। জেলখানার কালাচাঁদ-হাতী, খালাস পাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইল! রহস্য চমৎকার বটে।

দুইমাস এইরূপ অবস্থিতি করিয়া, কালাচাঁদ হুগলীপ্রবাসী আত্মীয়গণের সহিত একে একে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাদের কাছে কোনরূপ প্রশ্রয় বা আদর আপ্যায়িত পাইলেন না; বরং উপহসিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ঠাট্টা তামাসা করিলেন, কেহ মুখ ভেঙাইলেন, কেহবা "মাষ্টার" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কালাচাঁদ ভগ্নমনে বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসিলেন।

কারামুক্ত হইবার সময় কালাচাঁদের কাছে বা আয়ত্তাধীন নগদ সাড়ে তিন শত টাকা ছিল। কালাচাঁদ মুক্তহস্ত পুরুষ; অর্থের উপর নির্ম্মম। ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার সমস্ত টাকা খরচ হইয়া গেল। অথচ তিনি একবেলা মাত্র স্বপাক রন্ধনে

ভাতে-পোড়া দিয়া অন্নাহার করিতেন। একবেলা রন্ধন করিয়া তাহাই দুইবেলা খাইতেন। তরকারি বেগুনপোড়া বা আম্‌ড়াভাতে হউক,—অন্নের পরিমাণ, অরুচি সত্ত্বেও, নিতান্ত কম ছিল না।

অর্থসম্বন্ধে কালাচাঁদের দারুণ চক্ষুলজ্জা হইয়াছিল। কেহ টাকা চাহিলে, নাই বলিতে পারিতেন না। ভিক্ষুক আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বস্ত্র প্রার্থনা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নব বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পাড়ার দুষ্টলোকে সুবিধা পাইল। কালাচাঁদকে মিষ্ট কথায় মোহিত করিয়া, অনেকেই টাকা পয়সা সিকি আধুলি কর্জ্জ-স্বরূপ চাহিয়া লইল। কালাচাঁদ প্রকৃতই মিষ্ট-কথায় ভুলিতেন কিনা জানি না,—কিন্তু কৃতাঞ্জলি-পুটে কাকুতি-মিনতি করিয়া টাকা চাহিলে তিনি বিনা-লেখাপড়ায় টাকা ধার দিতেন। বন্ধু-পতিতপাবনের খুব মজা হইল। তিনি সকাল-সন্ধ্যা কালাচাঁদের সম্মুখে সদা তাঁহার যশোগান করেন, এবং কালাচাঁদের পয়সায় মাছ-দই-সন্দেস কিনিয়া উদর পূর্ণ করেন।

এইরূপে ছয় মাস মধ্যে দান-ধ্যানে, বিতরণে কালাচাঁদের সব টাকা যেন কোথায় উধাও হইয়া উড়িয়া গেল।

তথাচ কালাচাঁদের ভ্রূক্ষেপ নাই; অর্থ অর্জ্জনের উপায় চিন্তা নাই; মানসিক দানশক্তির হ্রাস নাই। দোকানদারগণের নিকট তখনও তাঁহার পসার প্রতিপত্তি কমে নাই; তাঁহার চিঠিপত্রে জিনিস-পত্র আসা তখনও বন্ধ হয় নাই। এইরূপে পাঁচ মাস অতীত হইল। ক্রমে অল্পে অল্পে, তিলে তিলে, কালাচাঁদের ভুয়াবাজী ভবধামে প্রকাশ হইতে লাগিল। ষষ্ঠ মাসে হঠাৎ একদিন এমন হইল, কালাচাঁদ দোকান হইতে ধারে আর চাল ডাল পাইলেন না। হাতে এমন একটী পয়সা নাই যে, তাহাতে সেদিন আহার চলে। টাকা ধার করিতে গেলেন,—কোথাও পাইলেন না। সম্পদের বন্ধুসম্প্রদায় এ সময় সরিয়া দাঁড়াইল।

অধিক কি, বন্ধু-পতিতপাবনও এসময় কালাচাঁদের সহিত বড় একটা বেশী বাক্যালাপ করিতেন না।

কালাচাঁদ তাঁহার ছোট ঘরে বাঁধিয়া খাইতেন,—হরি পতিতও প্রত্যহ কালাচাঁদের পয়সায় নিজের জন্য দ্বাদশ-ব্যঞ্জন উদ্যোগ করিয়া লইতেন,—কিন্তু আজকাল কালাচাঁদ খাইতে পাইল, কি না-পাইল,—তাহা একবার চাহিয়াও দেখেন না।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর হইল,—অভুক্ত, কালাচাঁদ ছেঁড়া মাদুরের উপর শুইয়া আকাশ-পানে চাহিয়া আছেন। এমন সময় বন্ধু-পতিত পাবন পরামাণিক দ্রুতপদে আসিয়া, ভাঁড় ফেলিয়া কালাচাঁদকে স্পষ্টাক্ষরে বলিল, "তোমার আর এখানে থাকা হইবে না। তুমি আজই চলে যাও। হরে মুদী তোমার নামে উঠ্‌নার বাকী দরুণ ১নং ছোট আদালত করেছে; শুন্‌লেম, শমন নিয়ে পেয়াদা বেরিয়েছে। শেষে কি তোমার দেনার দায়ে আমার বাড়ীঘর নিলাম হবে?—তুমি, আজ এখনই আপন পথ দেখ।"

কালাচাঁদ, পরামাণিকের মুখপানে খানিক চাহিয়া, হাসিয়া, উঠিয়া পড়িলেন। কালাচাঁদ

।টী পিতলের ঘটীমাত্র সম্বল লইয়া, মলিনবসনে ভাবে চলিলেন। যাত্রাকালে—হাসি-হাসি মুখে -পতিতপাবনকে বলিলেন, "সাঙ্গাত। তোমার ছে বেশ সুখে ছিলাম;—আমাকে ভুলিও না; দ বেঁচে থাকি, আবার দুই এক বছর মধ্যে ।। হবে।"

পরামাণিক কথার উত্তর দিতে সাহস করিল । অনিমিষলোচনে বন্ধু-কালাচাঁদের পানে চাহিয়া হল।

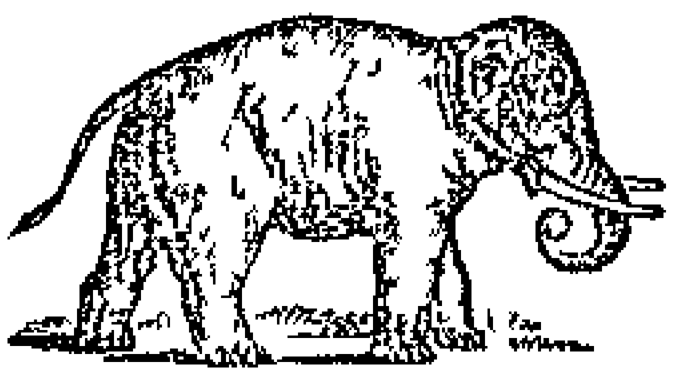

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অন্ধকার। বৈশাখ মাস—অমাবস্যার সন্ধ্যা মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। ব্যোমপথ হইতে মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জনের গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ আসিতেছে; কিন্তু জল হয়-হয়,—আর হয় না; দুই এক ফোঁটা বারিবিন্দু পড়ে-পড়ে,—আর পড়ে না। বহুদিন বৃষ্টি হয় নাই; পৃথিবী যেন জলের জন্য হাহাকার করিতেছে। পথ ধূলিরাশিতে পূর্ণ।

অল্প ঝড় উঠিল। ধূলা উড়িল। মানুষের নাক, কান, মাথা,—ঘর, দ্বার, বসন, ভূষণ, ধূলিময় হইল। ধূলার রাজত্ব, ধূলার লীলাখেলা আরম্ভ হইল। যে দুই একজন পথিক পথে চলিতেছিল, তাহারা পলাইয়া নিকটস্থ গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় লইল। দেখিতে দেখিতে, একটা দমকা বাতাসে, হুগলীর কাছারি-ঘাটের একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের কচি ডাল ভাঙ্গিয়া গেল। পথ, প্রান্তর, জনশূন্য

ঝড়, ধূলা, অন্ধকার,—এই চারি বিভীষিকায়
চাং ভয়ঙ্করী-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।
প্রত্য গলীর আদালত-গৃহ গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত। ঘাটের
কেব ট গঙ্গা নাই, চড়া পড়িয়াছে। বৈকালে,
কি সমীরণ সেবনের জন্য অনেক বাবু এবং স্কুলের
রা-বাবু সেই ঘাটের সোপান-শ্রেণীতে বসেন,
হেঁট ন এবং বিচরণ করেন। বাবু ভিন্ন, অনেক
লেন বুও যথা দাঁড়ী, মাঝী, মুটে, মজুর—সেই
প রির এক পার্শ্ব অধিকার করিয়া, কখন বা মাদুর
ইয়া বসে, হাসে, গান গায়, তামাক খায়,
বপত্র করে, তাস খেলে। ইহা ব্যতীত, ভক্তবৃন্দ
কা হ্মণ-পণ্ডিত, বৃদ্ধ দোকানদার, স্বধর্ম্ম-নিরত সাধু
দাঁড়া প্রত্যহ যথানিয়মে ঘাটে আসিয়া পতিতপাবনী
জড়া থী দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া যান। ঘাটটী
সেই রমণীয়। সম্মুখে গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রবৎ কোর হইয়া
কাল হত; পশ্চাতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাবলী-পরিশোভিত
পলা থ। আর ঘাটের নিম্নে গঙ্গা-উপকূলে বিস্তৃত
মুখে অদূরে কালীতলার শ্মশান-ঘাট। কাজেই
বলি

কাছারির ঘাটের আদর বেশী, মনো-ল. অপূর্ব্ব। য়া

সেইদিন বেলা ৫টার সময় একজন দারিদ্র্য-র লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি, সেই ঘাটের সর্ব্বোচ্চ সো-র আসিয়া বসিল। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা ; কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি নাই,—সে, নীরব, নিশ্চল, ত পাঁচটার সময় ঘাটের সান্‌ তপ্ত,—তথাচ ত ভ্রূক্ষেপ নাই ;—হেঁটমুণ্ডে তাহারই উপর ব রহিল। তাহার সঙ্গী বা সম্বল, একগাছি এবং একটী পিতলের ঘটী। লাঠীতে দুই ক হয় ;—বাবুগিরির বেড়ানও চলে, আর কুকুর, শে বা মানুষ-মারাও চলে! খানিক হেঁট হইয়া বাঁ সেই লোকটা উত্তপ্তভূমে শুইয়া, আকাশ দে লাগিল। মুখে রোদ লাগায় চোখ বুজিল। ক কাপড়, আধময়লা ; কোমরে চাদর জড়ানো ; দিল্লীর নাগরা। চেহারা যণ্ডা ; চোক দুটা বড় রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

চিনিলেন কি?—ইনিই কালাচাঁদ। অ

চ পরম-বন্ধু-পতিতপাবন পরামাণিকের গৃহ
বেলা তৃতীয় প্রহরে বিদায় লইয়া, আপন
লী সহর পরিভ্রমণ করিলেন। গঙ্গার ধারের
রিয়া, তিনি শ্রেজাশালের হাট, জেলখানা,
ট, বাবুগঞ্জ এড়াইয়া চুঁচুড়ার বড়বাজারে
হইলেন। রোদে রোদে, কেন এমন তিনি
প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা কেমন করিয়া বলিব?
ারা জঠর-জ্বালা শান্তির জন্য কি তিনি বাহির
?—তাই কি?—তবে পথি-মধ্যস্থ কোন
বড় চক্‌মিলান বাড়ীতে ঢোকেন, আর উঁকি
সরিয়া আসেন কেন?—না, চুরি করা
? কিন্তু দিনের বেলা, সদর দরজা দিয়া,
কখন চুরি-বৃত্তি চলে কি? সে যাই
কালাচাঁদ কিন্তু মাঝে মাঝে বিশুষ্ক মুখে,
নয়নে, গৃহস্থের গৃহে, সদর দরজায় উঁকি
যাইতে লাগিলেন। এইরূপে হুগলী-কলেজ-
ষাঁড়েশ্বরতলা, কৈঁকশিয়ালী অতিক্রম করিয়া
পাড়ার বাজারের দিকে আসিলেন। শেষে

মল্লিক-কাসেমের হাট হইয়া, চক্ দিয়া প.
সেই কাছারির ঘাটে আসিয়া বসিলেন। ঘ।

তখন বেলা পাঁচটা। রোদটা যেন অ।
জ্বলিতেছে। গাছগুলা যেন পুড়িয়া ব
গিয়াছে। গঙ্গার জলটা যেন টগবগ ফুটি
রাস্তায় ধূলি-কণা যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ উড়ি
ছাতাহীন কালাচাঁদ ঘামে যেন অবগাহন করি
অদ্য এ পর্য্যন্ত তিনি জলস্পর্শ করেন নাই
এইবার বুঝি সেই বদনমণ্ডল-বিনিঃসৃত ঘর্ম্মরূপ
বারিধারা, সেই বিশুষ্ক অধর ভিজাইয়া, কাল
সেই নীরস রসনায় আসিয়া নি
হয়।। কিন্তু কালাচাঁদ তাহা ঘটিতে দিলেন
তিনি অঞ্চল দ্বারা ঘামজল মুছিয়া ফেলি
মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "আজ যে
নিরম্বু ভীম একাদশী। আমি কি এ জীবনে এ
একাদশী করিতে পাইব না?" সোপান
দেখিয়া কালাচাঁদ মনে মনে বলিলেন,
ঋষি যোগীরা, প্রখর রৌদ্রে, সূর্য্য

চাহিয়া, চারিদিকে আগুনের রাশি রাখিয়া, প্রত্যহ কঠোর তপস্যা করেন, আমি কি একদিনও কেবল এই গরম স্নানে বসিয়া কঠোর ব্রত সাধন করিতে পাইব না?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কালাচাঁদ প্রথমে হেঁটমুণ্ডে নীরবে ঘাটে বসিলেন,—তার পর শুইলেন; সূর্য্য-পানে চাহিলেন,—কিন্তু চোখ রাখিতে পারিলেন না—মুদ্রিত করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশে মেঘ দেখা দিল,—ঝড় উঠিল। ঘাট হইতে সকলে পলাইল। কালাচাঁদ কিন্তু নড়িলেন না,—ঘাটে একাকী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোমর হইতে চাদর খুলিয়া মাথায় জড়াইলেন। ধূলায় দেহ পূর্ণ হইয়া গেল। যখন সেই কাল-ঝড়ে, অশ্বত্থগাছের ডাল ভাঙ্গে, তখন কালাচাঁদের মাথা হইতে সেই চাদরটা উড়িয়া পলাইল; একেবারে, সে গঙ্গাজলে পড়িয়া সাগর-মুখে ভাসিয়া চলিল। কালাচাঁদ হাসিয়া, চাদরকে বলিলেন;—"হেঁরে, তুই কি বিলাত যাবি নাকি?—

জাহাজ-ভাড়া নাই বলে বুঝি সাঁতার দিয়ে যাচ্চিস্?” চাদরটার কাণ্ড দেখিয়া, কালাচাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না।

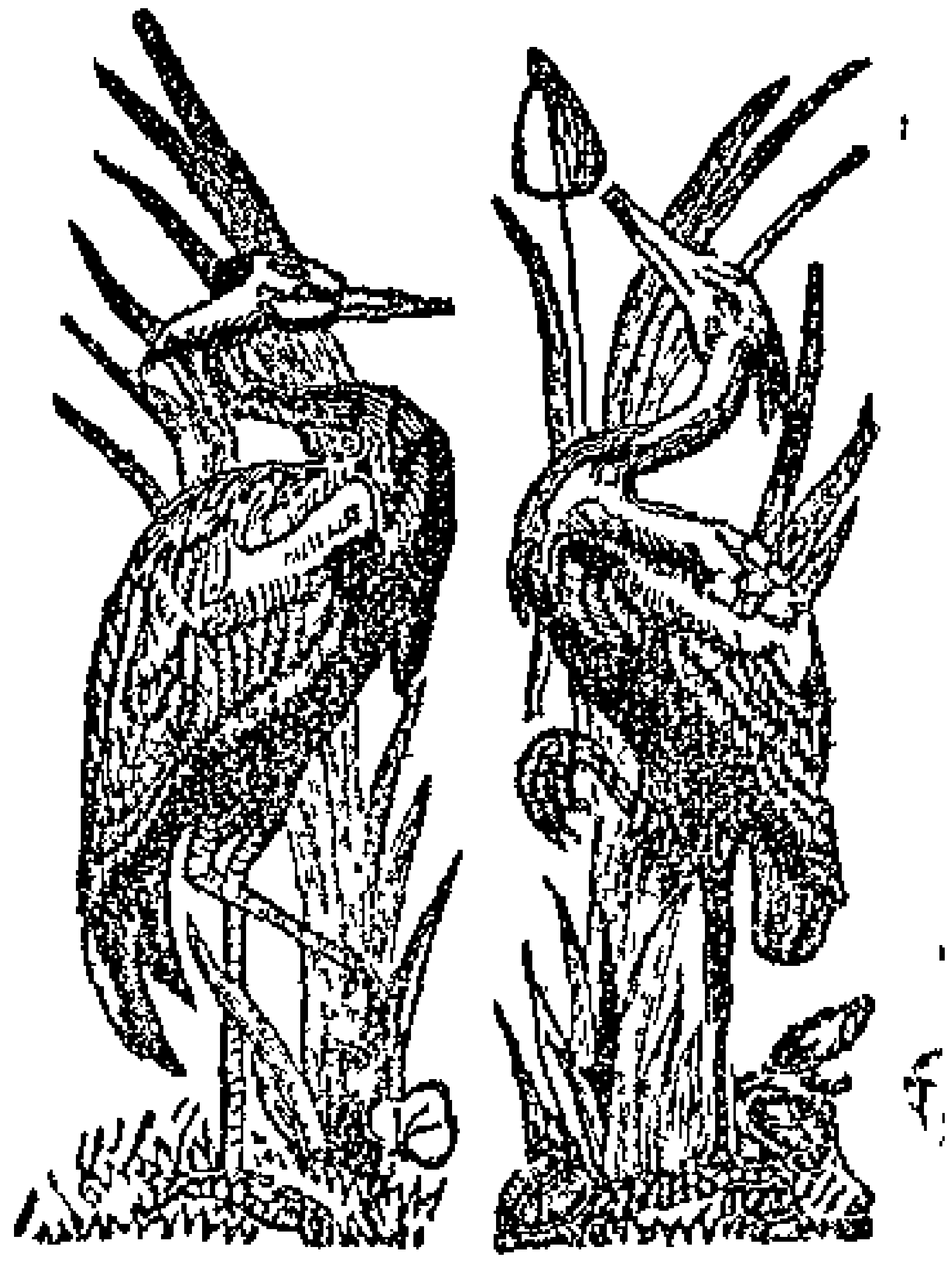

# নবম পরিচ্ছেদ।

ঝড় কতক থামিল। কিন্তু অন্ধকার অধিক বাড়িল। রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল। কালাচাঁদ সেই জন-শূন্য ঘাটে একাকী। আর কোথাও আলোকের চিহ্নমাত্র নাই;—কেবল ঘাটের চাঁদ্‌নীতে লণ্ঠনের একটি নির্ব্বাণোন্মুখ অতি সূক্ষ্ম-আলো মিটি মিটি জ্বলিতেছে; আর, অদূরে কালীতলার শ্মশান-ঘাটে একটী শবদাহ হইতেছে। কালাচাঁদের মুখমণ্ডলে দাহের সেই উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি যেন নিপতিত হইল। প্রকৃতিদেবীর মূর্ত্তি এ আলোকে, আরও ভয়ঙ্করী হইল। কালাচাঁদ অনন্যমনে একদৃষ্টে এক-ঘণ্টা কাল সেই আলোর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে আলো নিবিল, আগুন নিবিল, শ্মশানে শান্তি-জল পড়িল, সব ফুরাইল। হরিবোল দিয়া সকলে ঘরে গেল।

কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—"মানুষ মরিল ত

ফুরাইল! কারো সঙ্গে কারু সম্পর্ক নাই,—সমস্তই ছায়াবাজী! পাপই কি, আর পুণ্যই কি,—সৎকর্ম্মই কি, আর অসৎ-কর্ম্মই কি,—সব সমান; মরে গেলাম ত, সবই গেল,—কে কার খোঁজ লয়, তার ঠিক নাই। সংসার অনিত্য! এই মাটীর দেহ কোন্ দিন যে মাটিতে মিশাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে কেন আর এত কষ্ট করিয়া মরি?—যে ক-দিন বাঁচি, মজা করি! খাই দাই, সুখে থাকি, মজা করি! সংসারের যেরূপ গতি দেখিতেছি,—যে লোকটা পুণ্য-ধর্ম্ম সৎকর্ম্ম করিতে যায়, সেই কষ্ট পায়। পুণ্য-ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা ত বুঝি না! পুণ্যটা কি?—পুণ্য করিলে খাইতে পরিতে পাইবে না;—আর পাপ করিলে বেশ সুখে রাজার হালে থাকিবে!—ইহাই কি পাপ-পুণ্যের তারতম্য? এমন পুণ্য-কর্ম্মের খুরে শত কোটী দণ্ডবৎ!—আমি ত একাজে নাই—"

এই কথা বলিয়া, ভাবমগ্ন কালাচাঁদ বাস্তবিকই সেই অন্ধকার রাত্রে ঘাটে বসিয়া আপনা-আপনি,

উন্মত্তের মত প্রায় পঁচিশ বার যোড়হাতে প্রণাম করিলেন।

বাল্যকালে পঠদ্দশাতেই কি, গ্রাম্যস্কুলে মাষ্টারির অবস্থাতেই কি, আর কারাগারেই কি,—কালাচাঁদের ধারণা ছিল,—এই তিন কালেই তিনি অতিশয় দুর্জ্জয়, দুরন্ত, বদলোক ছিলেন। কারামুক্তির পর ভাবিতে ভাবিতে ঠিক করিলেন, "আমি কাহারও অনিষ্টে বা মন্দ কাজে আর থাকিব না।" কালাচাঁদ নারী-জাতিকে জননীর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। প্রকৃতই তিনি নিতান্ত ভাল মানুষ, সৎলোক হই-লেন,—সংসারের সৎকর্ম্মে, পরোপকারে মন দিলেন। পতিতপাবনের বাসায় থাকিয়া গরীব দুঃখীকে অন্ন-বস্ত্র দিলেন। কিন্তু দুই চারিজন তোষামোদ-প্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিল, উপহাস করিল। কালাচাঁদ ভাবিলেন, "ইহাত এক মন্দ মজা নয়! যখন আমি বদমাইস ছিলাম, চোর ছিলাম, তখন আমায় কত লোকে আদর অভ্যর্থনা করিত; কিন্তু এখন

ভাল লোক হইয়াছি,—এখন লোকে এত অশ্রদ্ধা, তামাসা করে কেন?” বিশেষ; ক্রমে যখন কালাচাঁদের পয়সা ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, তখন সেই দুই-চারিজন প্রিয়-বন্ধুও, প্রকাশ্যে কালাচাঁদকে টীট্‌কারী দিতে লাগিল। শেষে, যেদিন তিনি নিঃসম্বল হইলেন, সেদিন প্রাণের বন্ধু পতিতপাবন পরামাণিকও তাঁহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল।

কালাচাঁদ উদরান্নের জন্য কখন চিন্তিত হন নাই; আজও হইলেন না। তিনি কেবল ভাবিতে লাগিলেন, “কেন এমন হয়? পতিতপাবনও শেষে ছাড়িল কেন?”

পতিতপাবনেব মুখে নালিসের কথা শুনিয়া কালাচাঁদ হাসিয়াছিলেন। হাসির কারণ এই যে,—“নালিসের শেষ ফল’ত আমাকে জেলে দেওয়া। কিন্তু জেলে গেলে যে, আমি রাজা হইতে পারি,—মূর্খ পতিতপাবন, তাহা বুঝে না।”

ভিক্ষাই তাঁহার নগরপরিভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল;

—"চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা আর কস্মিন্‌কালে করিব না,—ভিক্ষা করিয়া সাধুভাবে দিন কাটাইব;—" মনে মনে এই কথা কহিয়া, তিনি বেলা তৃতীয় প্রহরে ভিক্ষার্থ বহির্গত হন। কিন্তু নিদারুণ লজ্জা আসিয়া, কেমন এক অনৈসর্গিক দুর্ব্বলতা আসিয়া, তাঁহার ভিক্ষা-পথে বাধা দিল। "মাগো, দুটী ভিক্ষা দাও,—" বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না;—ঐ কথা মনে মনে উচ্চারণ করিতেই তাঁহার যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল; সুতরাং ভিক্ষার কথা মুখ দিয়া ফুটিল না। তিনি আরও ভাবিতে লাগিলেন, "আমার এমন সবল সুস্থ শরীর,—ইহাতে ভিক্ষার কথা বলিলে, লোকেই বা মনে করিবে কি?" কালাচাঁদের ভিক্ষা করা হইল না; কেবল নগর-ঘুরিয়া ঘাম এবং এক-পা ধূলা শুদ্ধ কাছারির ঘাটে আসিয়া বসিলেন।

তিনি চাকুরির চেষ্টা করেন নাই কেন? কারা-মুক্তির পর—ভদ্র, অভদ্র বহুলোকেই তাঁহাকে উপহাস করিল। গ্রামস্থ আত্মীয়-স্বজনের নিকট

গেলেন,—তাঁহারাও কালাচাঁদকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন। হাঁদা চেহারা, কালো রঙ, মোটা কাপড় দেখিয়া, কালাচাঁদকে কেহই পছন্দ করিল না। সুতরাং তিনি চাকুরির প্রস্তাব করেন কা'কে? মহাবিরক্ত-চিত্তে তিনি উচ্চপদস্থ ভদ্র লোকের সহিত একরূপ দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিলেন।

আজ বড় সঙ্কটকাল। এক দিকে জুয়াচুরি প্রতারণার সঙ্গে সুখ-সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য; অন্য দিকে সৎকর্ম্ম সাধুপথের সঙ্গে লাঞ্ছনা, অবমাননা, অনাহার। কোন্ পথে যাবেন? সেই অমাবস্যার নিশীথে, গঙ্গার উপকূলে বসিয়া, শ্মশানের দিকে চাহিয়া, কালাচাঁদ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। শেষে, সেই শবদাহ-অগ্নি-নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে সেই উপরি-কথিত কথাগুলি তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইল,—অবশেষে পুণ্যকর্ম্মের খুরে তিনি শত কোটী প্রণাম করিলেন;—বুঝি পুণ্যকর্ম্মকে গঙ্গাসলিলে জন্মের মত ভাসাইয়া দিলেন।

কালাচাঁদ আরও ভাবিতে লাগিলেন, "এ

নিশীথে গঙ্গার ঘাটে কালাচাঁদ।

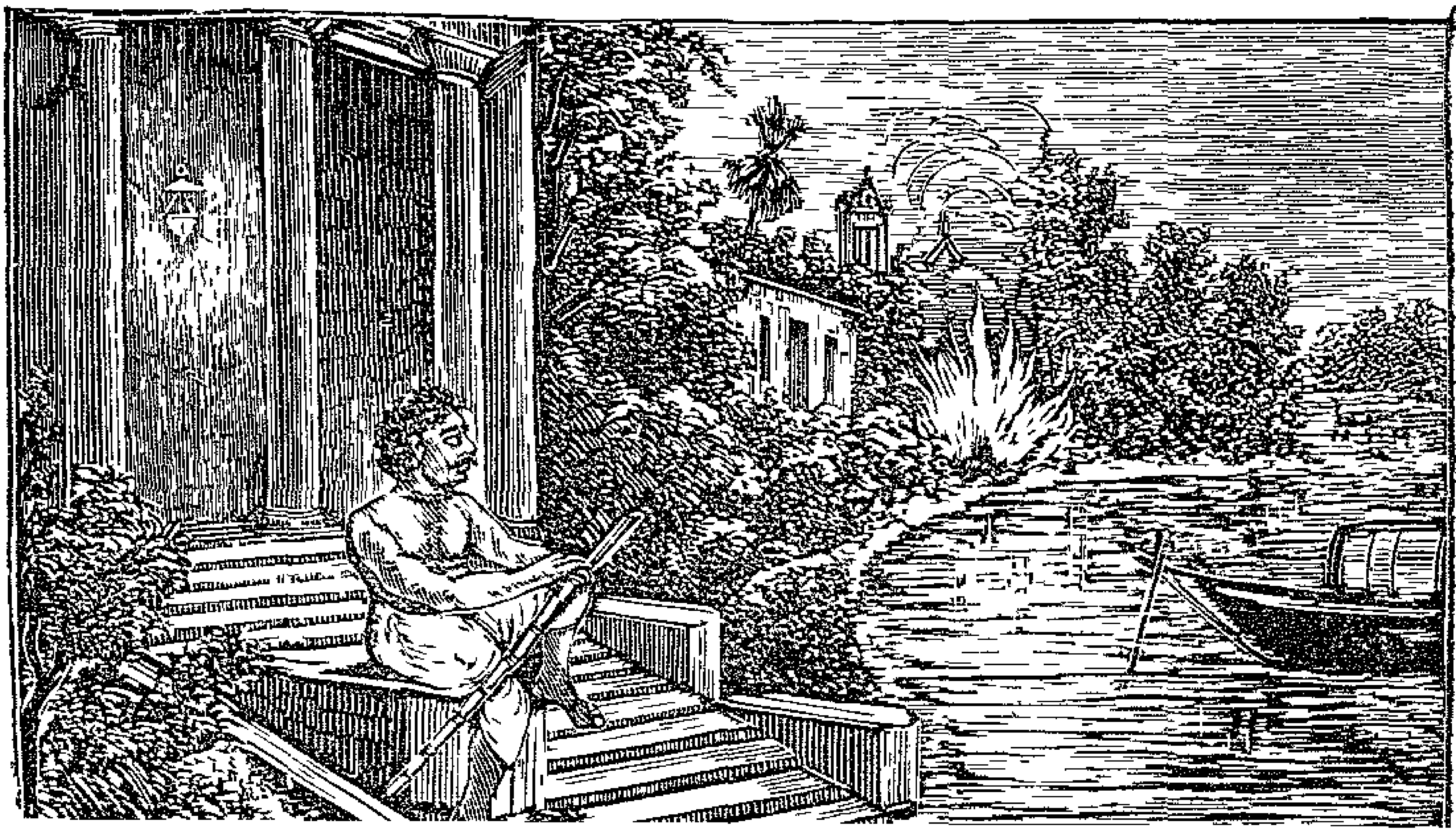

সংসারে জুয়াচোর, শঠ, প্রবঞ্চক কে নয়?—কেবল আমিই কি ধরা পড়িয়াছি?—চুরি কে না করে? মিথ্যা কথা কে না কয়? বঞ্চনা কাহাতে নাই? তবে, বড়লোকে ধরা পড়ে না; আমার মত ছোট-লো,—ই ধরা পড়ে। দূর-সম্পর্কীয় আমার মেসো নাজির; ঠাকুরদাদা, সেরেস্তাদার; এ দুজনের পসার-প্রতিপত্তির ধূমধাম দেখে কে? লোকে উভয়কেই ধর্ম্মাবতার বলিয়া নমস্কার করে, প্রণাম করে। কিন্তু এ দু-জনেই কি জুয়াচোর, বঞ্চক নহে? মেসোর মাহিনা ৩০৲ টাকার অধিক নয়; কিন্তু তাহার বাসায় দুই বেলায় ৪০ খানি পাত পড়ে। মাসী
ক্কেল
প্রায় দুই হাজার টাকার গহনা। বাটীতে প্র
হইলাম,
দোল দুর্গোৎসব হয়। মেসো, সম্বন্ধী এ কি রকম
কিনিয়াছেন। জিজ্ঞাসা ক ম জানি না, এ
পান কোথা? নিশ্চয়ই মে া!
লোকে সিঁধ কাটিয়া চুরিমই বা কি?—নাজির
কথার কৌশলে, বুদ্ধির জিরবাবু যেমন সভ্যতায়
অসভ্য চোর; তাঁহারা এ ত্রিভুবনে তেমনটী

দুইজন নাপিত-পেয়াদা, খানসামা ;—দুইজন ব্রাহ্মণ-পেয়াদা, রসুয়ে। তাহারা মাহিনা খায়—কোম্পানীর ; কিন্তু কাজ করে মেসোর। এ সব কথা সকলেই জানে—অথচ, মেসোর জেল হয় না কেন ? ঠাকুরদাদার অবস্থাও তথৈবচ। তাঁহার পৈত্য-খড়ো-ঘর আমার ত অবিদিত নাই,—আজ তাঁহার চকমিলন বাড়ী। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর লক্ষ্মীনারায়ণের আরতির সময় নহবদ বাজে। কেহ কেহ বলে, ঠাকুরমার নামীয় কোম্পানীর কাগজ আড়াই লক্ষ উপচাইল। জুয়াচুরী ভিন্ন এত টাকা কোথা হইতে আইসে ? ঠাকুরদাদা ত আর পরেশ-পাথর কুড়াইয়া পান নাই যে, ঠেকালেই সব সোণা হইয়া যাইতেছে !! ঠাকুরদাদা যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে কাছারি হইতে আসিবার সময় চাপকানের বুক-পকেট-পূর্ণ টাকা এবং নোট লইয়া আইসেন, হাকিম বাহাদুর কি তাহা দেখিতে পান না ? তবে সে কিসের হাকিম ? সে কিসের বিচারক ? যে এত অন্ধ, তাহাকে উচ্চ বিচারাসনে বসান কেন ?

"আর উকিল মোক্তারই বা কি? যত ফেরেফ ফন্দি,—সব ইহাঁদেরই হাতে। এমন অকথা, কুকথা নাই যে, ইহাঁরা মক্কেলকে উপদেশ দিয়া না থাকেন। একই আইনের একদিন এক রকম অর্থ হইল,—আবার সুবিধামত, অন্যদিন সেই আইনের অন্যরূপ অর্থ হইল। হাকিমকে ঠকানো, হাকিমের চক্ষে ধূলা দেওয়া, ইহাঁদের ব্যবসা। মনে করুন, আমি উকীল, আমার হাতে মোকদ্দমা কম,—একটী মোকদ্দমা লইয়া, হাকিমের কাছে বাজে বক্তৃতা করিয়া, সেই একদিনের মোকদ্দমায় দশ দিন করিলাম। মনে মনে নিশ্চয় বুঝিলাম, মক্কেল দোষী; এদিকে বক্তৃতার সময় হাকিমকে বুঝাইলাম, মক্কেল নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। এ কি রকম কাজ বুঝি না,—এ কি রকম ধর্ম্ম জানি না, এ কি রকম সভ্যতা হৃদয়ঙ্গম হয় না।

"আর বিচারপতি হাকিমই বা কি?—নাজির তাঁহার বাজার-সরকার। নাজিরবাবু যেমন সস্তায় জিনিস কিনিতে পারেন, এ ত্রিভুবনে তেমনটী

আর কেহই পারেন না। ঘৃত টাকায় দেড় সের;—কিন্তু নাজির কেনেন, এক টাকায় তিন সের। বাজারে চারি আনা মাছের সের; কিন্তু নাজির মহাশয় দশ সের মাছটা অনায়াসে এক টাকায় লইয়া আসেন। হাকিমের চক্ষে সাক্ষী দুই প্রকার,—জুয়ো, আর সুয়ো। কোন সাক্ষীকে ধমক দিয়া, চক্ষু রাঙ্গাইয়া তাহার এজেহার লইতেছেন; সাক্ষী এক কথা বলিলে অন্য কথা লিখিতেছেন, অথবা তাঁহার মনোমত কথা না বলিলে তাহা লিখিতেছেন না। বিচার ঠিক হউক, আর নাই হউক,—সে দিকে বিচারকের দৃষ্টি নাই;—কিসে উপর আদালতে তাঁহার রায় বজায় থাকে,—ইহাই তাঁহার চেষ্টা। ধর্ম্মাধর্ম্ম কে বুঝে, জাল-জুয়াচুরি কে বুঝে,—রায় বজায় থাকিলেই, চাকুরি বজায়,—পদোন্নতি।—সেইটা ঠিক থাকিলেই হইল।

“ব্যবসায়িগণের ত মিথ্যা কথার ব্যবসা। কাপড়ের দোকানে যাও, লম্বোদর ভদ্র দোকানদার বলিবে, “মহাশয়! গঙ্গাদরিমানে বলিতেছি, এ কাপড়-

জোড়াটী ৩৵১০ টাকায় খরিদ,—তা, আপনার নিকট চারিগণ্ডা পয়সার বেশী লাভ লইব না।” শেষে, একঘণ্টা—কষাকষি, মাজামাজি, হেস্তাহেস্তিতে ২৸০ টাকায় দোকানদার কাপড় বিক্রয় করিল। দশ গজ থান কেনো,—ঘরে আসিয়া মাপো, সাড়ে নয় গজের অধিক হইবে না। ইহারা কি চোর বঞ্চক নয়?—তবে আমি একলা কালাচাঁদ ধরা পড়ি কেন? সমাজের অন্যান্য লোক অপেক্ষা আমি যে, কি অধিক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা'ত আমি বুঝি না। সকলেই জানে, গোয়ালা দুধে জল দেয়; এতত্ত্ব হাকিম, উকিল, জমীদার, রাজা সকলেই অবগত আছেন। এ প্রবঞ্চনা-অপরাধের জন্য, সে, রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় না কেন? প্রকাশ্যত পথে পথে ফেরিকর অবিরত চীৎকার করে, “চাই, ভালো আম্! খাসা মিষ্টি আম্!” ফেরিকর ডাকিয়া, আম্ কাটিয়া, চাকিয়া দেখ,—টক্ আম্ড়া তার কাছে কোথায় লাগে? এইরূপ কতশত মূর্ত্তিমান্ প্রবঞ্চক প্রত্যহ রাজ-পথে সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রবঞ্চনা-গীত

গাহিতে গাহিতে হেলিয়া-দুলিয়া হাসিয়া-খেলিয়া চলিয়া যায়,—তাহার সংখ্যা কে করিবে?—কিন্তু ইহাদিগকে কারাগারে পাঠান হয় না কেন?

মহামতি কালাচাঁদের ভাবনার শেষ নাই। তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল,—"সমাজের প্রায় সকল লোকই তাঁহা অপেক্ষা অধিক জুয়াচোর, বঞ্চক, শঠ। কালাচাঁদ আরও দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন,—"দুষ্কর্ম্মের জন্য যাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হওয়া উচিত ছিল,—সেই লোক-টাই কিনা আজ সমাজের মান্য-গণ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"

শেষে কালাচাঁদ ঠিক্ করিলেন, সংসারে আবার পাপপুণ্য কি?—ধর্ম্মাধর্ম্ম কি?—মরিলাম ত সব ফুরাইল। ঐ যে লোকটা কালীতলার ঘাটে পুড়িয়া ছাই হইল,—উহার আর কি রহিল বল দেখি? বড় বড় দুষ্কর্ম্মের কথা ধরি না,—এই একটু সামান্য, সহজ কার্য্য—চুরি করায় দোষটা কি? পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণে পাপ্‌টা কি?—ধরা না পড়িলেই হইল!—রাজদ্বারে দণ্ডিত না হইলেই

হইল! আর আমার পক্ষে রাজদণ্ড—কারাবাস,—সে ত সুখের কথা। কোন্ দ্রব্যটা আমার তা'ত আমি বুঝি না। এইযে কোম্পানী, এ মুলুকটা নিয়েচে, এ মুলুকটা কি পরের নয়? জোর যার, মুলুক তার;—আপন-পব ইহাতে কি আছে? রাজা বলেন, "ঐ পাহাড়টা আমাব, ঐ নদীটে আমার, ঐ জমীটে আমার।" কিন্তু কেন যে উহা রাজার হয় তাহা'ত বুঝি না। সবই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি,—তবে উহা আমার হইল না কেন? আমি পাহাড়ে কাট কাটিতে গেলে, রাজা তাড়াইয়া দেয় কেন? ফল কথা, এ সংসারে কাহারই কিছুই নয়,—যে যাহা জোব করিয়া লইতে পারে, সে বস্তু তাহারই হয়। সংসারে বাস করিতে হইলে, কেবল কল, বল, কৌশল চাই। তাই বলি, পরদ্রব্য-গ্রহণে, অর্থাৎ চুরি করায় আর দোষ কি?

"সাধু হওয়ার অর্থ,—সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত এবং অনাহারে থাকা! কেন ভোগে বঞ্চিত হইব? —আমার অপরাধ কি?—এঁ—এঁ—

চুরি করায় দোষ কি?—"

কালাচাঁদ এইবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন,—আকাশ হইতে এ কথার উত্তর আসে কি না? চমকিয়া পশ্চাতে চাহিলেন; তাঁহার যেন মনে হইল, "চুরি করায় দোষ কি?"—এই প্রশ্নের উত্তর পশ্চাৎ হইতে আসিতেছে। কিন্তু পিছন ফিরিয়া তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সম্মুখে তাঁহার সেই শ্মশান-ঘাট ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হইল। সেই শান্তি-নিকেতন, সুপবিত্র, মহাশ্মশানকে সম্বোধন করিয়া কালাচাঁদ মনে মনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন, "শ্মশান! তুমি সর্ব্বজীবের পরিণাম, শেষ-আশ্রয়স্থল! তুমি বলিয়া দাও, আমি আজ অনাহারে মরি কেন? হুগলী সহরে চাল, ডাল, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, চিনির ত অভাব নাই,—আমি তাহার কিছুই পাইব না কেন? আমার অপরাধ কি?" নিম্নে প্রসন্ন-পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কুলকুল-নাদে প্রবাহিতা। কালাচাঁদ গঙ্গার দিকে চোখ ফিরাইয়া যোড়হাতে জিজ্ঞাসিলেন,—"মা, তুই-ই না হয় ব'লে দে,—

আমার অপরাধ কি?—আমি না খেতে পেয়ে মরিব কেন?”

কালাচাঁদের চোখে জল আসিল। বারিধারায় গণ্ডস্থল ভাসিল। কালাচাঁদের ইহজীবনে, অন্তরের ক্রন্দন আজ এই নূতন।

অবনী নীরব। শ্মশান নীরব। আকাশ নীরব। গঙ্গা নীরব। কালাচাঁদের কর্ণে কেহই সদুত্তর দিল না। বহুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন,—কিন্তু কেহই তাঁহার সহিত কথা কহিল না।

অমাবস্যার অন্ধকার-রাত্রি। আড়াই প্রহর অতীত। কালাচাঁদ মালকোঁচা-কাপড় পরিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবে বিহ্বল হইয়া, তীব্র চীৎকারে, আঁধার-তরঙ্গ কাঁপাইয়া, ভাগীরথীর জল ভেদ করিয়া কালাচাঁদ বলিলেন,—

“চুরি করায় তবে দোষ কি?

**কিছুই নাই, কিছুই নাই।”**

এবার গঙ্গা ঠিক উত্তর দিলেন, “চুরি করায়

তবে দোষ কি?—কিছুই নাই, কিছুই নাই।” প্রতিধ্বনিতে পৃথিবী চমকিত হইল।

কালাচাঁদ তখন হৃষ্টচিত্তে, সেই লাঠি ঘাড়ে করিয়া, লম্বা-লম্ফে ঘাটের চাঁদনীর ভিতর গেলেন। দেখিলেন, তথায় প্রহরী-কনষ্টেবল ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কালাচাঁদ, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপবিশিষ্ট লণ্ঠনটীকে, লাঠির আঘাতে ভাঙ্গিয়া, হাসিয়া দৌড়িলেন। লণ্ঠন-পতনের ঘোর শব্দে কনষ্টেবলের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিল। সে চমকিয়া উঠিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়া, ব্যাপার দেখিয়া, বলিল,—“এ—এঃ ঝড়্‌মে লণ্টেন্‌টোভি গিরূ পড়া!”

প্রথমপর্ব্ব সমাপ্ত।

# কালাচাঁদ।

প্রথম অংশ।

দ্বিতীয়পর্ব্ব—পিতামহ-দর্শন।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেস হইতে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুটে সঙ্গে মাছ হাতে লইয়া কালাচাঁদ।

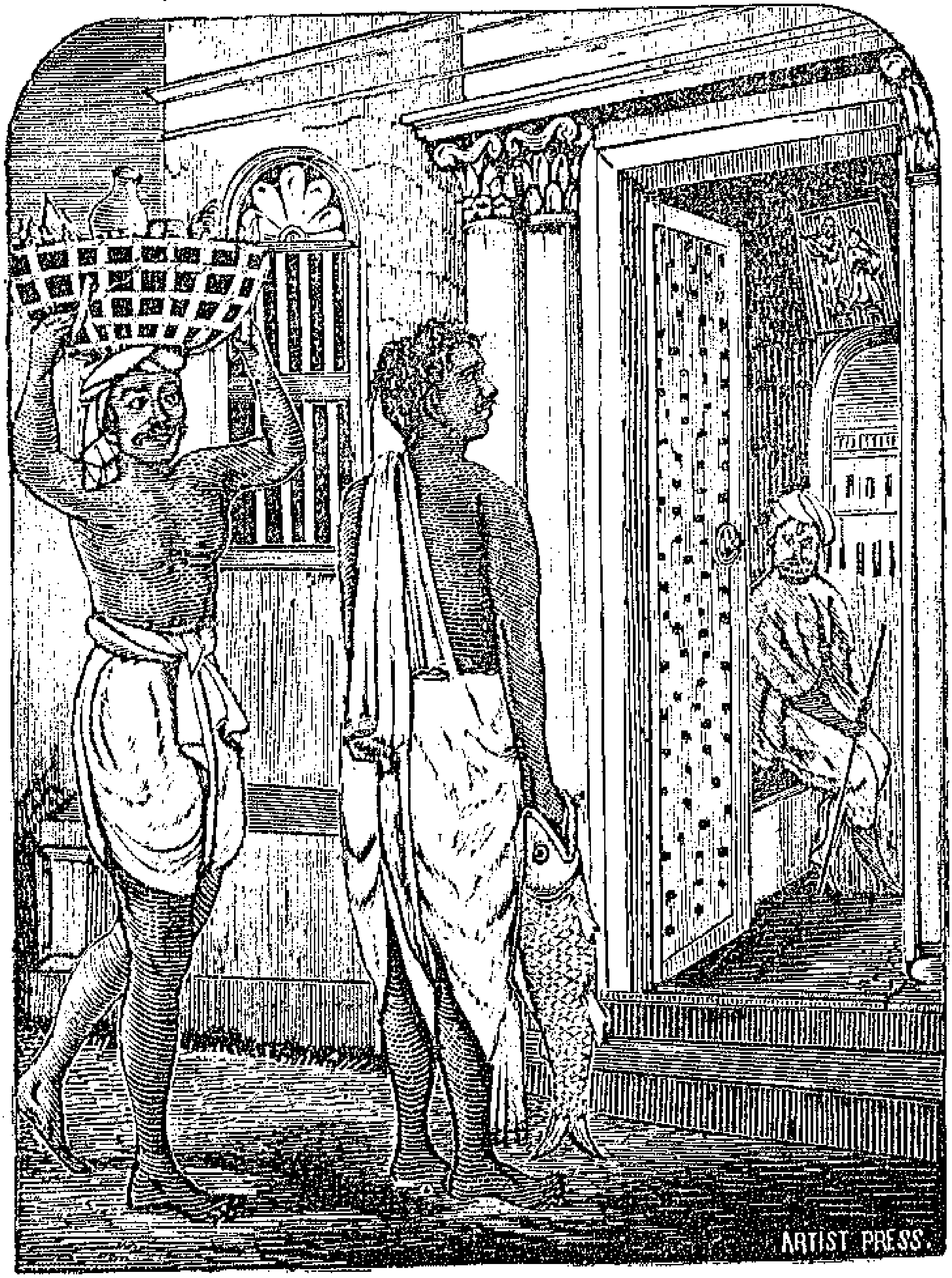

# কালাচাঁদ।

## দ্বিতীয়পর্ব্ব—পিতামহ-দর্শন।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে কালাচাঁদ হুগলী পিপুলপতি-সায়রে ঠাকুরদাদার বাসাভিমুখে হন্ হন্ চলিয়াছেন। তাঁহার হাতে একটা দশ সের রুই মাছ, সঙ্গে একটা মুটে। আজ কালাচাঁদের সহজ শরীর,—বেশ ভাল মানুষ। কোন ভাবনা চিন্তা নাই। যেন সদানন্দ ভাব—হাসি-হাসি মুখ। বাসায় পৌঁছিয়া, চৌকাট ডিঙ্গাইতে না ডিঙ্গাইতেই, কালাচাঁদ উচ্চকণ্ঠে হাঁক্ দিলেন, "দাদা মোশাই!—অ, দাদা মোশাই! বাড়ীতে আছেন কি?"

ডাকটীতে ভক্তি আছে, আদর আছে, আবদার আছে;—যেন নাতী-ঠাকুরদাদায় কত মাখামাখি ভাব,—উভয়েব মধ্যে প্রত্যহ কতই যেন স্নেহ-ভক্তির বেচা-কেনা হইয়া থাকে! কিন্তু রহস্য এই, এ জীবনে কালাচাঁদের সহিত ঠাকুরদাদার তিনবারের অধিক দেখা হয় নাই।

কালাচাঁদের মাতুলালয়েই জন্ম,—নিজের পৈতৃক ভিটা, একবার ব্যতীত, কখন তিনি দেখেন নাই। যখন তিনি বর্দ্ধমানে রাজস্কুলে পড়েন, সেই সময় লোক পাঠাইয়া ঠাকুবদাদা তাঁহাকে স্ব-গ্রামে লইয়া যান। ৺শারদীয় উৎসবের সময় এ ঘটনা ঘটে। ঠাকুরদাদা পূজাব ছুটীতে বাটী আসিয়া এ কাজ করেন।

ঠাকুরদাদারা দুই ভাই। জ্যেষ্ঠ রামতারণ, পরলোকগত; কনিষ্ঠ হরিতারণ—স্বয়ং ঠাকুরদাদা। রামতারণের পুত্রও মৃত,—এখন একমাত্র বংশধর স্বয়ং কালাচাঁদ। হরিতারণ অর্থাৎ বর্ত্তমান ঠাকুর-দাদার এক্ষণে ধনে-পুতে লক্ষ্মীলাভ।

হরিতারণ স্বনামাপুরুষো-ধন্য। স্বয়ং স্বহস্তে, স্বকলমে, স্বীয় ভাগ্যবলে বহুতর বিষয়-বিভবের অধিকারী হইয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি, বিশেষ কিছুই ছিল না বলিলেই হয়।

জ্যেষ্ঠ রামতারণ কোন জমীদারের তরফে নায়েব ছিলেন। অন্নকষ্ট ছিল না; বেশ গুছাইয়া-গাছাইয়া তিনি স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেন। তিনি বড় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কথায় যেমন ক্ষুরের ধার ছিল, শরীরেও তেমনিই অসীম শক্তি ছিল। সে সময় জমীদারীতে সদাই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ধর্ম্মঘট হইত। রামতারণ, বিদ্রোহী প্রজা-শাসনে, এবং লড়াই জয়-করণে সুপটু ছিলেন। প্রজারা রামতারণের নামে থর থর কাঁপিত।

এক সময় রামতারণ, একটা বিষম দাঙ্গায় জয়ী হইয়া, মনিবের নিকট দুই শত টাকা পুরস্কার পান। তিনি একদিন সেই বিবাদী গ্রামে, কাছারির ঘরে রাত্রে বেশ সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় ডাকাত পড়িয়া তাঁহাকে কাটিয়া গেল। কেহ কেহও

এমনও বলেন, প্রজারাই দলবদ্ধ হইয়া, ডাকাত সাজিয়া, তাঁহার নিধন সাধন করে।

রামতারণের এক পুত্র; নাম ভবানীচরণ। পিতার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে, তাঁহারও জ্বর-রোগে অকালে মৃত্যু ঘটে। ভবানীর মৃত্যুকালে কালাচাঁদ জননী-জঠরে অবস্থিত।

স্বামীর পরলোক-গমনের পর, কালাচাঁদ-জননী অগত্যা পিতৃগৃহে গমন করেন। শ্বশুর-সংসারে আর কেহই নাই। জন্মের মত কালাচাঁদ-জননীর শ্বশুর-ঘর করা ফুরাইল।

কালাচাঁদের যে কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাহাতে সামান্যই আয় হইত। কিন্তু দখল বজায়ের জন্য মামা সে আয় টুকু ছাড়িতেন না;—তিনি কালাচাঁদের বাটী হইতে ভাদ্র মাসে নারিকেল পাড়াইয়া আনিতেন, জ্যৈষ্ঠ মাসে আম আনিতে লোক পাঠাইতেন; দুই এক মাস অন্তর মাঝে মাঝে মাছ ধরিতে বর্দ্ধমান হইতে জেলে' প্রেরণ করিতেন। সম্পত্তির মধ্যে এক আম বাগান, দুই

পুকুর এবং কয়েক বিঘা জমী ছিল। রামতারণ ও হরিতারণের ইহা যৌত-সম্পত্তি।

তার পর কালাচাঁদের মাতুলালয়ে জন্ম, বৃদ্ধি, প্রভাব, প্রতিপত্তির ইতিহাস, পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন।

এদিকে যেমন রামতারণ দত্তের বংশ নির্ব্বংশ হইবার উপক্রম হইল,—একমাত্র কালাচাঁদে কেবল বংশফল পর্য্যবসিত হইল; অন্যদিকে সেইরূপ হরি-তারণের বংশাবলীর শাখা-প্রশাখা, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষভাবে, বহুবিস্তৃতি লাভ করিল। তাঁহার এক পুত্র, চারি কন্যা, এখনও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমান। ঐ এক পুত্র হইতে তিনি এক গুণময় পৌত্র লাভ করিয়াছেন।

ঐ চারি কন্যার চারি স্বামী ঘর-জামায়ে। দ্বাদশটী দৌহিত্রী। দ্বাদশটী দৌহিত্রীর দ্বাদশটী স্বামীর মধ্যে আটটী "ঘর-নাত-জামায়ে।" দৌহিত্র সাতটী। ইহাদের আবার যথানিয়মে বংশবিস্তার। সুতরাং হরিতারণের গৃহ একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। একদিকে কালাচাঁদ একা,—অন্য-দিকে ঠাকুরদাদা একশত। কোথাও বালুকাময় ভূমে একটী অর্দ্ধশুষ্ক বটবৃক্ষ। আর কোথাও নন্দন-কাননবৎ সুরম্য, সুখসেব্য উদ্যানে যূঁই-গোলাপ-রজনী-গন্ধের—আম-জাম-কাঁঠাল-তাল-নারিকেলের সমাবেশ। কোথাও পূর্ণিমার শারদ-গগনে তারাদল সহ শশধর হাসিতেছে। আর কোথাও অমাবস্যার মেঘময় আকাশ, চন্দ্র-অভাবে বারিবর্ষণ-ছলে কাঁদিতেছে। কাহারও দুধে চিনির উপর রাতাবি মণ্ডা; কাহারও শাকে বালির উপর ঘুটের কুঁচি।

দেখিতে দেখিতে, আট-দশ বৎসরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামতারণের বাড়ীর পাঁচীর পড়িল, ঘরের চাল উড়িল, কবাট জানালা কে খুলিয়া লইয়া গেল। প্রথম প্রথম দু-একবৎসর কালাচাঁদের মামা দুই এক-টাকা খরচ করিয়া, ঘরের চালে খড় দিয়া, গোঁজা-মিলনগোছ করিয়া, ঘর ছাওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু ভগ্ন-বাড়ী ক্রমশই ভঙ্গের দিকে প্রবণ হইল। মামা ক্ষান্ত হইলেন। ক্রমশ বাটী সমভূম হইল, জঙ্গলে পরিণত

হইল। আমগাছ, আতাগাছ, পেয়ারাগাছ, ভেরন্দা গাছে সেস্থান পূর্ণ হইল। শেষে তথায় বসতবাটীর চিহ্নমাত্রও রহিল না। কিন্তু এদিকে হরিতারণের খড়ো-ঘর হইতে তে-তোলা চকমিলন বাটী উত্থিত হইল! ফটকের উপরে নহবৎখানা বসিল। খিড়্‌কীতে অন্দরের সামিল, এক দীঘি খনন এবং বাগান তৈয়ারি হইল। দ্বারে দুইজন দ্বারবান্ কেবল ঢুঁইলু টিপিতে লাগিল। বৎসর বৎসর দোল, দুর্গোৎসব, রাস হইতে লাগিল। শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবালয়ের সংলগ্ন একটী অতিথিশালাও স্থাপিত হইল। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় ঠাকুর-বাটীতে শঙ্খ, ঘণ্টা এবং বম্‌বম্ হরহর-ধ্বনির ধমকে ধরা বিকম্পিত হইল।

দুই ভাই—ঠাকুরদাদা-দ্বয়, জীবদ্দশাতেই পৃথক্-অন্ন হন। অন্যান্য সম্পত্তি যৌতায় রহিল, কেবল বাস্তুভিটার ভাগ হইল। খিড়্‌কীতে একটা ছোট পুকুর ছিল,—বলা বাহুল্য, সেটার অংশ হইল না; তখন সে আবশ্যকও ছিল না। সেই ছোট

পুকুরটাই এক্ষণে হরিতারণের টাকার জোরে দীর্ঘিকায় পরিণত হইয়াছে।

হরিতারণ পাকা-লোক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই জঙ্গলময়, অধিকারি-বিহীন বাস্তুভিটাটা সহজেই দখল করিতে পারিতেন, কিন্তু একমাত্র উত্তরাধিকারী কালাচাঁদের জন্য, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তবে সেই খিড়কীর পুকুরটীর লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যথাকালে হরিতারণ জ্ঞাতিবর্গকে, প্রতিবেশি-মণ্ডলীরও কৌশলে জানাইলেন, এ পুকুরটী তাঁহার জ্যেষ্ঠ জীবৎকালে তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি ঐ পুকুরটীকে সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তাধীনে আনিতে সমর্থ। ঠাকুরদাদার তখন বুধাদিত্য মহাযোগ উপস্থিত,—সম্পদের যোলকলা পূর্ণ, সুতরাং কেহই এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিতে পারিল না। তিনি আপন মনে স্বচ্ছন্দে দীঘি কাটাইলেন।

হরিতারণ তাঁহার বাটীর তিন পার্শ্বের স্থান খরিদ করিয়া, গৃহের পরিসর খুব বৃদ্ধি করিলেন বটে,

কিন্তু একপার্শ্ব যে, কেবল কালাচাঁদের কারণে জঙ্গলময় থাকিবে, সেই জঙ্গলের জন্য যে তাঁহার বাটীর শোভা বিনষ্ট হইবে, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। বিশেষ, সেই স্থানটুকু পাইলে, তাঁহার চকমিলন বাটীর এক-পেশে দোষ ঘুচিয়া যায় ; পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ককালিমা আর থাকে না। তাঁহার জামাতা এবং দৌহিত্রগণ জোর করিয়া সেই জঙ্গলভূমি অধিকারের জন্য বড়ই বিব্রত হইল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাদিগকে বুঝাইয়া, থামাইয়া রাখিলেন।

ঠাকুরদাদা হিসাবী, পাকা, ঝুনো লোক। প্রথম প্রথম তাঁহার কেমন মনে হইত,—কালাচাঁদ আর ক-দিন ? ও-ছোঁড়া বাঁচিবে না,—শীঘ্রই মরিবে। যার পিতা, পিতামহ, মাতা অকালে মরে,—সে কখনই দীর্ঘজীবী হয় না। বিশেষ, কেলে-ছোঁড়াটা মামার বাড়ী খেতে-মাখ্‌তে না পেয়ে, পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হ'য়ে, শীঘ্রই সহজেই শমনসদনে গমন করিবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালাচাঁদ মরিলেন না।

তিনি বর্দ্ধমানে মামার বাসায় হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ হইলেন। ঠাকুরদাদা একবার পূজার ছুটিতে বাটী আসিয়া একথা শুনিয়া মহা বিরক্ত এবং চিন্তিত হইলেন। কালাচাঁদকে দেখিবার তাঁহার সাধ হইল। ধূতি, চাদর, এক হাঁড়ি সন্দেস দিয়া তিনি কালাচাঁদের তথ্য লইলেন। সেই সঙ্গে কালাচাঁদের মামাকে পত্র লিখিলেন;—"আমার নাতীটী কেমন হইল,. একবার দেখিবার বড়ই ইচ্ছা। কালাচাঁদ বাঁচিলে দাদার বংশরক্ষা, নামরক্ষা হয়; ভিটায় সন্ধ্যা পায়, আর পিণ্ডলোপও হয় না। আহা! ছেলেটী এক-শ বছরেব হয়ে বেঁচে থাকুক! আমার এমনি দুরদৃষ্ট। কেলেসোনার মুখটী এপর্য্যন্ত একবাবও দেখিতে পাইলাম না। বারমাস বিদেশে থাকা, সরকারী কাজ—অবকাশ ত এক দিনের জন্যও নাই, কাজেই বাছার মুখটী দেখ্‌তে পাই না। যাহা হউক, এই পূজার বন্ধে আমি বাটী আসিয়াছি, এসময় একবার কালাচাঁদকে পাঠিযে দিলে বড়ই সুখী হইব। বাটীতে মা এসেছেন,—যাত্রা গান ভোজ হবে;

কালাচাঁদ পূজাবাটীতে দেখ্‌বে শুন্‌বে, খেয়ে খেলিয়ে নেচে কুঁদে বেড়াবে, আমার আনন্দ হবে। কালা-চাঁদ'ত আমার পর নয়।"

পত্র পাইয়া, মামা ঈষৎ হাসিয়া মনে মনে লেন, "এই যে দেখ্‌ছি, বহুকালের পর ঠাকুর-দার নাতীকে মনে পড়েছে। আদর কিছু গুরু-তর দেখ্‌ছি।" মামা, পত্রানুযায়ী, ভাগিনেয় কালা-চাঁদকে ঠাকুরদাদার বাটীতে পাঠাইলেন,—কোনরূপ ওজর-আপত্তি করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

কালাচাঁদের সহিত, ঠাকুরদাদার ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ।

কালাচাঁদ তখন বড় দুরন্ত বালক। স্বগ্রামে গিয়া চারিদিন কাল থাকিয়া গ্রামকে তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। সমবয়স্ক ছেলেপিলেকে মারিয়া ধরিয়া দিগ্বিজয়ী হইলেন। ঠাকুরদাদার পুত্রের পুত্র, প্রিয়তম নাতী শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের গালে কালাচাঁদ এমনি এক বিভীষণ চড় মারিলেন যে, সুরেশ সরিষা-ফুল দেখিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

বিজয়াদশমীর দিন, বৈকালে ঠাকুরবিসর্জ্জনের পূর্ব্বেই, কালাচাঁদ বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভগবতীর মুকুট ছিঁড়িয়া, খুলিয়া লইয়া দৌড়িলেন। ইতিপূর্ব্বে পল্লীগ্রামে মাতুলালয়ে কালাচাঁদ সাধ সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, ঠাকুরদাদার তিনি আসিয়া তদনুরূপ কার্য্য-সম্পাদনে অমনোযোগ করিলেন না। কালাচাঁদের কাণ্ড দেখিয়া ঠাকুরদাদা ত অবাক্! তিনি, একাদশীর দিনই নাতীকে মাতুলালয়ে পাঠাইলেন। ইহাই নাতী-ঠাকুরদাদার প্রথম সাক্ষাৎ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম-সাক্ষাতের দুই বৎসর পরে নাতী-ঠাকুরদাদার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। এবার ঠাকুরদাদা স্বয়ং বর্দ্ধমানে গিয়া কালাচাঁদের সহিত দেখা করিলেন। স্বয়ং সশরীরে যাইবার একটু কারণও ছিল। ম্‌, প্রাতে বর্দ্ধমানে পৌছিয়া ঠাকুরদাদা কালাচাঁদকে নাহরূপ আদর অভ্যর্থনা করিলেন; ধুতি, চাদর, সন্দেসের সঙ্গে কালাচাঁদের বিদ্যাশিক্ষা-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে মামার হাতে নগদ পাঁচটী টাকাও দিলেন। ক্রমশ একটু বেলা হইলে ঠাকুরদাদা কালাচাঁদকে কোলে বসাইলেন, গায়ে হাত বুলাইলেন, চুম খাইলেন, হায়-হায় করিলেন, চোখে পফোঁটা জলও ফেলিলেন।

অা অপরাহ্নে নিভৃতে ধীরে ধীরে তিনি নানা ...
বল্‌ মামাকে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে
—আলাপ ইতিপূর্ব্বে ছিল না,—কিন্তু

আপনার কথাবার্ত্তায় বড়ই প্রীত হইয়াছি। আপনি আমার চেয়ে বয়সে এবং সম্পর্কে ছোট বটেন, কিন্তু আমা অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া মনে হয়। ইতিপূর্ব্বে আপনার সত্যপ্রিয়তা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা অনেক ভদ্র-ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য আমি স্বয়ং স্বচক্ষে আপনার সততা, সাধুতা ও ধর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া বড়ই মোহিত হইয়াছি।"

যিনি যেমন কেন লোক হউন না,—তোষ মোদের হাত হইতে এড়ানো বড় কঠিন কাজ। মামা সেকেলে মোক্তার—এবং স্বল্পার্থ-উপার্জ্জনক্ষম আর ঠাকুরদাদা প্রবীণ সেরেস্তাদার, এবং বহু-অর্থ রোজগারী। সুতরাং বয়সে, সম্পর্কে, অর্থে, সম্মানে প্রভুত্বে ঠাকুরদাদা বড়, মামা ছোট। এরূপ স্থলে ঠাকুরদাদার কথায় মামা যে সহজে গলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষ, সুবিধাম সুকৌশলে, ধীরগম্ভীরে, নরমে গরমে, তোষামে সুধা যদি কাহারও কাণে ঢালিতে পারা যায়—

তিনি যেমন কেন হোঁমরা-চোম্‌রা বড়লোক হউন না, তাঁহাকে নিশ্চয়ই নিপতিত হইতে হইবে। মামা'ত কোন্ ছার!—কোন্ কীটাণুকীট!

ঠাকুরদাদার সেই প্রশংসা-খাঁড়ার কোপ্‌টা একেবারে অধিকমাত্রায় বসিয়া যাওয়ায়, মামা কিছু কাতর হইলেন। ঠাকুরদাদা এ সব বিষয়ে ওস্তাদ,—রোগ বুঝিলেন। তখন তিনি কিছু নরম ভাঁজে, খাদে আরম্ভ করিলেন, "দেখুন, আমি মনে মনে একটী মানস করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত সে-কথা কাহাকেও বলি নাই। কিন্তু আপনাকে না বলিলে আর চলে না। কারণ আপনি সহায় না হইলে, আমার সে কাজ উদ্ধার হইবে না। তা,—

মামা। বলুন, বলুন—আমার সাধ্য থাকে, নিশ্চয়ই আমার দ্বারা হবে। আপনি, মহাশয়-ব্যক্তি, পূজনীয় লোক,—আমার বাটীতে আজ আপনি পায়ের ধূলা দিয়াছেন, তা, প্রাণপর্য্যন্ত পণ ক'রে আপনার কার্য্যোদ্ধারে চেষ্টা করিব;—সে কথা বলাই বাহুল্য।

ঠাকুরদাদা। দেখুন, আমার বয়স হয়েচে,—দেহও ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে,—তিনকাল গিয়ে এই এককালে ঠেকেচে,—আমরা আর ক-দিন বাঁচবো? চাকরী-বাকরী আর ভাল লাগে না; ছেলেপিলের সদাই কিচি-কিচি ঝিকি-ঝিকি আর সহিতে পারি না;—আজ এর অসুখ, কাল ওর মাথা-ধরা, পরশু তার গা-জ্বালা, বুড়া-বয়সে এ-সব আর কত শুনিব বলুন? আপনি আমার সন্তান-তুল্য, আপনাকে বলি,—আমি সংসারের দায়ে, হাড়ে-নাড়ে জ্বালাতন হয়েচি,—চারিদিকে যেন সহস্র বিছায় দংশন করিতেছে! একদণ্ড যে, ঠাকুর-দেবতার নাম করি, এমন অবকাশটুকু নাই। এই দেখুন না কেন,—কালাচাঁদকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি;—ওর বাপ-ঠাকুরদাদা নাই, আমার নিজের ছেলে-নাতীর অপেক্ষা ওকে বেশী ভাল-বাসা উচিত। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট, এমনি বিধির বিড়ম্বনা,—বাছার আমার, মাসে মাসে খবরটী লইতে পারি না। তা আপনার কাছে কালাচাঁদ আছে

ব’লেই, আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছি। আপনি পরম ধার্ম্মিক লোক। সে যা’হউক, এখন বুঝেছি, সংসারে সুখ নাই! আমার যেন সংসার, ছাড়লে-বাঁচি, ছাড়লে-বাঁচি হয়েচে।

মামা মোহিত। পূর্ণ-মাত্রায় ঔষধের গুণ ধরিয়াছে। মামা ঘাড় দুলাইয়া বলিলেন, “আপনি যা বলিতেছেন, সবই সত্য।—”

ঠাকুরদাদা, মামার নিকট আরও একটু সরিয়া গেলেন। ক্রমে অঙ্গে-অঙ্গে ঠেকাঠেকি হইবার উপক্রম হইল। তখন ঠাকুরদাদা, মামার কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, খুব আস্তে আস্তে অর্দ্ধ-স্ফুট-স্বরে বলিলেন, “দেখুন, এ-কথা পূর্ব্বে কাহাকেও বলি নাই, আজ আপনাকে বলি,—এখন গোপনে রাখিবেন।—আমি ৺শ্রীবৃন্দাবন-বাসের মনন করিয়াছি। বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সেবার জন্য উইল করিয়া যাইতেছি।—ছেলে-পিলের জন্য মাসিক মাসহাবার বন্দোবস্ত করিয়াছি; যে যেমন উপযুক্ত, তার জন্য সেইরূপ

হিসাবে কিছু কিছু বিষয়ও দিয়াছি। কিন্তু দেবতার সেবায় অবশিষ্ট যথাসর্ব্বস্বই অর্পণ করিয়াছি। এ সংসারে সবই মিথ্যা, কেবল এক লক্ষ্মীনারায়ণই সত্য! তাঁদের সেবা উত্তমরূপে চালাইবার জন্য কোন্ ব্যক্তি না সর্ব্বস্ব প্রদান করিবে? আহা! সে যাহা হউক, কিন্তু এ অতুল বিষয় রক্ষা করিবার উপযুক্ত লোক আমি দেখিতে পাই না। তবে আপনি যদি এ সময় আমার একটু উপকার করেন, তাহা হইলে, আমার শ্রীবৃন্দাবন-বাসটী হয়।”

মামা। আমাকে যা করিতে বলেন, সাধ্য থাকিলে, আমি তাহাই করিব।

ঠাকুরদাদা। এই আমার সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার আপনাকে লইতে হইবে। আপনার মত দূরদর্শী লোক, এ বর্দ্ধমান জেলায় কয়জন আছে? আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া এই ভার গ্রহণ না করিলে, আমার আর উপায় নাই। আপনি আমার ৺শ্রীবৃন্দাবন-বাসে আর বাধা দিবেন না।

মামা। আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য। আমার উপর এত গুরুতর ভার দিবেন কেমন করিয়া? আপনার পুত্র এবং জামাতারা'ত বেশ উপযুক্ত হয়েছেন—একজন জামাই উকিল হয়েছেন নয়?

ঠাকুরদাদা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) শিব যদি উপযুক্ত হবে, তা'হলে আমার ভাবনা কি ছিলো?

ঠাকুরদাদার পুত্রের নাম শিবচন্দ্র।

মামা জিজ্ঞাসিলেন, "কেন? কেন? তিনি বড় অমায়িক লোক শুনেচি—"

ঠাকুরদাদা। সে,—যে শিব, সেই শিব!—সদাশিব—ভোলানাথ!—কিছুই জানে না,—বিষয়কর্ম্ম কিছুই বুঝে না! তার দ্বারা কি কখন বিষয় রক্ষা হয়?—আর, কি জানেন, কলিকালে,

জন জামাই ভাগ্না।
তিন নয় আপনা॥

তা, জামাইদিগে বিষয় রক্ষার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কৈ?—টাকা অতি খারাপ জিনিস! এক ভরসা, সুরেশের উপর। সে খুব

চালাক চতুর হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। তবে সুরেশ এখন বালক। সুরেশ একটু বড় হইলে, আপনার পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইতে পারে। তাই ঠিক করেছি,—দেবসেবার জন্য একজন উপ-যুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত ক'রে বিষয়ের আয় থেকে ছেলে-পিলেকে কিছু কিছু মাসহারা ভাগ করিয়া দিব।

মামা ক্রমশ গলিয়া দ্রব হইলেন। তাঁহার বাক্-শক্তি পর্য্যন্ত যেন লোপ পাইল।

ঠাকুরদাদা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আপনার অবকাশ কম বটে, কিন্তু আমার খাতিরে এ-কাজটী করিতেই হইবে। তা, আমি এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিব যে, তাহাতে মোক্তারীর বিশেষ কোন ব্যাঘাত পড়িবে না। এই বর্দ্ধমানে বসিয়াই কাজ চলিতে পারে। তবে মাসের মধ্যে আমার বাটীতে গিয়া দু'চারি দিন থাকিলেই হইবে।—আপনার পরিশ্রম এবং দক্ষতার উপযুক্ত, আমি টাকা দিতে পারিব, সেরূপ আমার সঙ্গতি

নাই; মাসিক একশত টাকার অধিক দিতে পারিব না। আপনাকে আমি যোড়হাতে বলিতেছি, আমার এই উপরোধটী আপনি রক্ষা করুন।

মামা বহুকাল ধরিয়া মোক্তারী করিতেছেন, জমীদারী বিষয়-সংক্রান্ত কাজ কখনও করেন নাই, তথাচ কেমন তাঁহার মন হইল, তিনি এ-কাজে সক্ষম হইবেন। নিজের বল, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা কেহই কম দেখে না।

মামা আম্‌তা-আম্‌তা করিতে লাগিলেন—"এঁ—আমি আপনার অগাধ-সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণে সমর্থ হইব কি?"

ঠাকুরদাদা। কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে অনেকেই সক্ষম,—আপনি ত নিশ্চয় সক্ষম হইবেনই। কিন্তু আপনার মত বিশ্বাসী, ধার্ম্মিক লোক আমি পাইব না। (পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া) এই দেখুন, উইলের সবই লেখাপড়া হইয়াছে, কেবল অনুমতি করিলেই, আপনার নাম বসাইয়া, কল্য ষ্টাম্পে তুলিয়া রেজেষ্টরী করিয়া পাকা করি।

মামা। আচ্ছা, তবে রেজেষ্টরীর পর তিন চারি মাস আপনি এখানে থাকিয়া যদি বিষয়-কার্য্য কতক কতক বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে কার্য্য চালাইতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। তা, আমার জানত আপনার পাই-পয়সা লোকসান হইতে দিব না। আপনার একটী পয়সা আমার পক্ষে গো-রক্ত, ব্রহ্ম-রক্ত বলিয়া জানিবেন।

ঠাকুরদাদা। (হাসিয়া) তা, নহিলে কি এত লোক থাকিতে আপনাকে আসিয়া এ কাজের জন্য ধরি ?—

মামা, খসড়া-উইলনামা লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি উইলটা খুলিয়া পড়েন। কিন্তু ঠাকুরদাদার অনুমতি ব্যতীত, সে কাজে সাহসী হইলেন না। বিচক্ষণবুদ্ধি ঠাকুরদাদা, ব্যাপার বুঝিয়া বলিলেন, "আপনিওত আইন-কানুন বেশ ভাল বুঝেন, আজ ২৫ বৎসর আদালতে কাজ করিতেছেন—একবার উইলটা পড়িয়া দেখুন না—যদি কোন দোষ থাকে ?"

মামা কৃতার্থ হইয়া, একাগ্রমনে উইল পড়িতে লাগিলেন। উইলের শেষভাগে এই মর্ম্মে লিখিত আছে, “কালাচাঁদ আমার বড় স্নেহের পাত্র। সে মাতৃপিতৃহীন। তাহাকে আমি বার্ষিক তিনশত টাকা মুনফার কিসমৎ মহেশপুর নামক আয়মাটী দান করিলাম। নিম্ন-তপশীলে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য। আর তাহাকে কুড়িবিঘা লাখেরাজ-জমী, একটী পুষ্করিণী, বসত-বাটী নির্ম্মাণের জন্য নগদ ৫০০৲ টাকা ও আড়াই বিঘা জমী দান করিলাম। নিম্নে বিবরণ দ্রষ্টব্য। ইহা ব্যতীত কালাচাঁদ মাসিক কোম্পানী এগার টাকা মাসহারা পাইবে। কালাচাঁদ সাবালক হইলে, এই বিষয় স্বয়ং ভোগ-দখল করিবে। তখন আর মাসহারা পাইবে না।”

মামা চমকিলেন। ঠাকুরদাদাকে যথার্থ সাধুপুরুষ জ্ঞান করিলেন। কালাচাঁদের কপালে ভবিষ্যতে এত সুখভোগ আছে, তাহা তিনি ভাবেন নাই। মামা বলিলেন, “এ উইল অতি সুন্দর হইয়াছে; এতদনুসারে কাজ করিলে, সন্তান-সন্ততির মধ্যে

বিবাদের আশঙ্কা কিছুই থাকিবে না। বেশ সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। ৺লক্ষ্মী-নারায়ণের কীর্ত্তিকলাপও বজায় থাকিবে। আর, কালাচাঁদের উপর আপনার স্নেহ মমতা দেখিয়া আমার মন বড় পুলকিত হইয়াছে—”

ঠাকুরদাদা। (হাসিয়া) কালাচাঁদ কি আমার পর?

এইবার ঠাকুরদাদা তাকিয়া ঠেশ দিয়া চক্ষু মুদিয়া, তামাক খাইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় সাতটা বাজিল। তখন তিনি হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া মামার হাতে হাত দিয়া বলিলেন,—“দেখুন, এখনও একটা বিবাদের বীজ আছে। সে বীজের আর অঙ্কুর যাহাতে না হইতে পায়, এখন হইতেই তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। এখন ঘোর কলি উপস্থিত। ছেলেপিলের সব, মেজাজ গরম।—কথায় কথায় পরস্পরে ঝগড়া বাধায়। আমার দাদার যে ভদ্রাসন বাটী ছিল, তাহা এখন আর নাই; সেখানে এমন জঙ্গল হয়েছে যে, বাঘ লুকিয়ে

থাক্‌তে পারে। আমার পৌত্রটী এই বালক বয়সেই বড় গোঁয়ার,—সে বলে, আমাদের চকমিলন দালানের পাশে জঙ্গল রাখা হবে না। জঙ্গলে সাপের ভয়ও হইয়াছে। তার ইচ্ছা যে, জঙ্গল কাটিয়ে ঐখানে সে বাড়ী তৈয়ারি করে। আমি বলিলাম,—না, সে কাজ এখন হবে না, কালাচাঁদের মামাকে এ-কথা একবার জিজ্ঞাসা না ক'রে আমি তোমাকে জঙ্গল-কাটা বা বাড়ী তৈয়ারির বিষয়ে উত্তর দিতে পারি না।"

মামা। তা, স্বচ্ছন্দে আপনি সে স্থানের জঙ্গল কাটুন, বাড়ী তৈয়ারি করুন,—তাহাতে আমার কিছুই আপত্তি নাই। আপনার উপরই কালা-চাঁদের ভার। আপনি যা কর্‌বেন, তাই হ'বে।

ঠাকুরদাদা। (চমকিয়া) আঃ, আপনি বলেন কি? কালাচাঁদের বিষয়টা কি আমি অমনি লইব? তা হ'লেত রাতও মিথ্যা, দিনও মিথ্যা। চন্দ্র-সূর্য্য জানেন, আমি কালাচাঁদকে কত ভালবাসি! মন্দ মতলব থাক্‌লেত এতদিন সে ভিটা জোরেই

দখল করিতাম;—সেখানে আমার ভোগ-দখলে হস্তা হয়, এমন সাধ্য কার?—তা, নয়, ভবিষ্যতে ছেলেয়-ছেলেয় ঝগড়া ঝাঁটি না হয়,—এমন বন্দো-বস্তটী ক'রে মরতে পেলেই আমার সুখ।—সে ভিটাটার ত দাম বড়?—দশটাকা দিয়াত কেহ লইবে না। কিন্তু ঐ সামান্য স্থানটুকুই কোন্দলের বীজ হইতে পারে,—তাই আমার এখন থেকে ভাবনা। কারণ, আজ-কালের সব ছেলে-পিলে বড়ই গোঁয়ার!

মামা। আপনি থেকে যা ক'রে দেবেন, তাতে কি আমার কখন অমত হ'তে পারে?

ঠাকুরদাদা। দেখুন, সেই ভিটাটী এবং একটী বাগান ও পুকুরের অর্দ্ধাংশের জন্য আপনার হাতে আমি নগদ সাতশত টাকা দিব। সে টাকাটী আপনি কালাচাঁদের জন্য তুলিয়া রাখিয়া দিবেন, সুদে খাটাইয়া কালাচাঁদের টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

মামার আ[illegible]র অবধি রহিল না। মুখে পুনরায় তিনি সেই কথাই উচ্চারণ করিলেন

ঠাকুরদাদা এবং মামা।

'আপনি যা কর্‌বেন, তাতে কি আমার অমত আছে ?"

ঠাকুরদাদা। তা'হলে কাল দুটা কাজই শেষ করা যাবে ; একবারে ভিটা এবং উইল, দুইটাই রেজষ্টরি হবে।

মামা। আমি একটা কথা ভাবিতেছি, কালাচাঁদ ত নাবালক,—সে, ভিটা বিক্রয় বা রেজষ্টরি করিবে কেমন করিয়া ?

ঠাকুরদাদা। হাঃ হাঃ হাঃ—তার উপায় আমি করিয়া দিব। আমি আদালতে দেওয়ানী কাজ করিয়া মাথার চুল প্যাকাইলাম,—সে উপায় কি আর জানি না ?—আপনিও ত মোক্তারি করেন। কালাচাঁদের লেখাপড়ার ব্যয়, ভরণ-পোষণের ব্যয়, চিকিৎসাদির ব্যয়,—বহন করিবে কে ? কায়স্থ-সন্তানকে ত মুর্খ করিয়া রাখা চলে না। কাজেই ভিটা-আদি বিক্রয় বা বন্দক দিয়া, কালাচাঁদকে মানুষ করিবার জন্য ইত্যাদি ;—বুঝিলেন কি ?

মামা। হ্যাঁ, তা একরকম হ'তে পারে বটে।

ঠাকুরদাদা। একরকম কেন? বেশ ভাল রকমই হয়?—

মামা। হাঁ,—তা, হয় বটে। আপনি যা কর্‌বেন, তাতে আমার আর আপত্তি কি? কালা-চাঁদ ত আপনারই!

ঠাকুরদাদা তখন সাড়ে তিনশত হিসাবে সাত-শত টাকার দুইটী তোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দুইটী আপনি রাখিয়া দিন। কল্য প্রাতে লেখাপড়া হইবে। টাকাটা রাত্রে আপনার কাছেই থাকা ভাল।"

মামা তোড়া দুইটী সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর-দাদা বলিলেন,—"টাকা গণিয়া লউন।"

মামা। সে কি কথা?—আপনার নিকট হইতে টাকা লইতেছি, তাহা আর গণিয়া লইব কি?

ঠাকুরদাদা। সে কথা নয়!—আমারই যদি গণিতে ভুল হইয়া থাকে! তাই বল্‌ছি,—আর একবার গণিয়া দেখা ভাল।

এই বলিয়া, ঠাকুরদাদা স্বয়ং একটা তোড়ার

মুখ খুলিয়া টাকা ঢালিয়া ফেলিলেন। খন্-খন্ ঝন্-ঝন্ ঠন্-ঠন্ শব্দে সেস্থান পূর্ণ হইল। অগত্যা মামা আর একটা তোড়ার মুখ খুলিতেছিলেন। ঠাকুরদাদা, তাঁহার হাত হইতে সে তোড়াটা লইয়া, আরও জোরে পূর্ব্ব-নিক্ষিপ্ত টাকার উপর, এ টাকাও ঢালিতে লাগিলেন। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ অধিক শব্দ হইল।

শব্দ শুনিয়া করুণাময়ী দৌড়িয়া আসিয়া অন্দর হইতেই জানেলার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিতে লাগিলেন। ঠাকুরদাদার চক্ষু তখন সেই সদর-মুখ অন্দরের জানেলার দিকেই ছিল। করুণাময়ীর সহিত চক্ষে চক্ষে চাওয়া-চায়ি হওয়ায়, ঠাকুরদাদা চক্ষু নামাইয়া লইলেন। মনে মনে বলিলেন, "আর ভাবনা নাই,—চারে বড়-মাছ আসিয়াছে! গাঁথিতে কতক্ষণ!"

তখন ঠাকুরদাদা, কণ্ঠের স্বর ঈষৎ উচ্চ করিলেন,—যেন করুণাময়ীকেই উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,— "কালাচাঁদ অতি সুবোধ-বালক। অমন নধর গড়ন

আমি কারো দেখি নাই। মুখের চেহারা ঠিক যেন রাজপুত্রের মত। মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি যেন মধু-মাখা। কালাচাঁদ সুমুখ দিয়ে চলে যায়, মনে হয় যেন ইন্দির-চন্দর চলে যাচ্চে! আহা! এখন বেঁচে থাকুক্,—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক-শ বছরের হয়ে বেঁচে থাকুক্। আপনি যেমন ওকে কষ্ট ক'রে মানুষ করেচেন, ও তেমনি আপনাকে এরপর বড় হ'য়ে ভক্তিমান্য ক'র্‌বে!—তা, ঠিক মা-বাপের মতনই আপনাদিগে দেখ্‌বে! কালাচাঁদ তেমন ছেলে নয়,—প্রকৃতি অতি ধীর। আহা! ও আমার সাত-রাজার ধন একটী মাণিক! বেঁচে থাকুক্—বেঁচে থাকুক্। বাঁচাই মূলাধার।"

ঠাকুরদাদা, স্বর একটু নরম করিয়া মামাকে বলিলেন, "টাকাগুলি গণিয়া, দশটাকা করিয়া থাক্ দিন্। উঃ—এক রাশ্ টাকা!! কেলেসোণার যা বিষয় আছে, তা, অম্‌নি দিলে কেউ লয় না,—সে একবারে বন, জঙ্গল, শেয়াল, কুকুর, সাপ, বিছা, মাছি, মশা, উই, পিঁপড়াতে পরিপূর্ণ।

তবে কি জানেন, কালাচাঁদ আমার বড় স্নেহের সামগ্রী,—ওর জন্য অন্তরটা সদাই কাঁদে,—তাই বলি, এই সাত-শ-টাকা ওর থাকুক্,—আপনি ওর নামে ঐ টাকা চোটা-সুদে খাটা'তে পারেন, অথবা একটা ব্যবসা-বাণিজ্য কবিতে পারেন,—তখন যদি আরও বিশ পঞ্চাশ টাকা নগদ দরকার হয়,—আমার নিকট হইতে চাহিলেই আমি তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিব।"

মামা ক্রমশ টাকা গণিয়া সত্তরটী থাক্ দিলেন,—একটী টাকা বেশী হইল। মামা বলিলেন, "সাত-শ এক টাকা হইয়াছে, আপনি এই এক টাকা ফেরত লউন।"

ঠাকুরদাদা। (জিহ্বা কাটিয়া) বলেন কি,—বলেন কি?—আমি কি, তা, ফেরত লইতে পারি! কালাচাঁদ আমার হৃদয়ের ধন,—আমি কি ওকে ঠিক ৭০০৲ টাকা,—শেষে দুইটী "শূন্য" দিতে পারি!! ৭০১৲ টাকাই উহার প্রাপ্য।

এইরূপ কথা-বার্ত্তা সাঙ্গ হইলে, ঠাকুরদাদা

রাত্রি নয়টার সময় উত্তমরূপ আহারাদি করিয়া বৈঠকখানায় সুখে নিদ্রা গেলেন। মামাও তোড়া দুইটী লইয়া হৃষ্টচিত্তে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। টাকার তোড়া দেখিয়া করুণাময়ী রুক্ষ-স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "টাকা কিসের?" মামা, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। করুণাময়ী বলিলেন,—"তা' কখনই হবে না; সাত-শ কেন, সাত হাজার টাকা দিলেও, ঘর-ভিটা বেচা হইতে পারে না। তোমাকে এ বুদ্ধি কে দিল? বুড়ো এসে বুঝি মিষ্টি কথা কয়ে ভুলিয়েচে! বাছা কালাচাঁদের টাকার ভাবনা কি?—ঘর-ভিটে কি বেচ্‌তে আছে? যারা নিতান্ত কাঙ্গাল-গরীব, ভিক্ষে করে খায়, তারাও ভিটে বেচে না! বাপ্‌রে! আমি ভিটে বেচ্‌তে দিব না,—ভিটে বেচ্‌লে যে বাছার অকল্যেণ হবে!!"

করুণাময়ী এবং মামা উভয়ে প্রায় সমস্ত রাত্রি এই বিষয় লইয়া বিষম বাদানুবাদ করিলেন। কাহারও নিদ্রা হইল না। করুণা বুক চাপড়াইলেন,

কপালে করাঘাত করিলেন, নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাইলেন ;—শেষে করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে রাগ করিয়া বলিলেন, "তুমি যদি ৭০০৲ টাকা নিয়ে বাছার আমার, ভিটাটুকু বিক্রয় কর, তা হ'লে আমি গলায় দড়ী দিয়া মরিব।"

মামা যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। প্রাতে তিনি ঠাকুরদাদাকে সাতশত টাকার তোড়া দুটী ফেরত দিয়া বলিলেন, "এ বিষয় একবার বাটীতে আমার জ্যেষ্ঠকে সংবাদ দিয়া সমাধা করিব। এখন আপনি টাকা ফেরত লউন। আমার কিছুই অমত নাই। তবে কি জানেন, এসব কাজ দাদার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই করা ভাল। শেষে না দোষ পেতে হয়।"

ঠাকুরদাদা এ-কথা শুনিয়া যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। তথাচ অচলভাবে থাকিয়া, সহজ কথায়, উত্তর দিলেন, "তা হোক, তাতে আমার আপত্তি নাই। কালাচাঁদ দীর্ঘজীবী হইলেই আমার সুখ। পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা ক'রে, যাতে ভাল হয়, তাহাই করুন।"

মামা। তবে উইল রেজষ্টরি আজ হবে ত?

ঠাকুরদাদা। তা হবে বৈকি? আহারাদির পর দুজনে একত্র কাছারী যেয়ে এখনি রেজষ্টরি ক'রে আসিব। প্রথম প্রথম খুব সাবধানে কাজ-কর্ম্ম করিবেন। আপনিই আমার ৺শ্রীবৃন্দাবন-বাসের ভরসা।

ঠাকুরদাদার সঙ্গে মামার বাসায় একজন মাত্র খানসামা আসিয়াছিল। এইরূপ কথা-বার্ত্তার এক ঘণ্টা পরে একজন দ্বারবান্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ঠাকুরদাদাকে এই ভাবে সংবাদ দিল,—"আমি বাটী হইতে এইমাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছি,—আপনার পৌত্র সুরেশের বড় ব্যারাম,—আপনাকে এখনি যাইতে হইবে।"

তিনি অমনি বিব্রত হইয়া,—"হায়.—হায়!—হায়!—" করিতে করিতে পাল্‌কি-যানে চলিয়া গেলেন। যাত্রাকালে তাঁহার কেবল এই ভাবনা হইল,—বিষ ত উত্তম ধরিয়াছিল,—ঝাড়াইয়া আরাম করিল কে?

ইহাই হইল,—কালাচাঁদের সহিত ঠাকুরদাদার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ।

এ ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মামার এবং করুণাময়ীর মৃত্যু ঘটে, কালাচাঁদের কারাবাস হয় ;—তাহা পাঠক অবগত আছেন।

তৃতীয় সাক্ষাৎ। কারামুক্তির পরই কালাচাঁদ বন্ধু পতিত-পাবনের সহিত স্বয়ং গিয়া ঠাকুরদাদার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু এবার আদর অভ্যর্থনা দূরে যাউক, বরং উপহসিত হইলেন। মুখে আদর দেখাইলেও, বুড়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে দুই একটা যে ব্যঙ্গ করেন, বিচক্ষণবুদ্ধি কালাচাঁদ তাহা বুঝিতে পারিলেন। ব'স কিম্বা থাক, খাও কিম্বা পর—এসব সম্ভাষণ তিনি কিছুই করিলেন না। বিশেষ, ঠাকুরদাদার বাসার লোকে, কালাচাঁদকে "মাষ্টার" "মাষ্টার" বলিয়া যৎপরোনাস্তি বিব্রত করিয়া তুলে। কালাচাঁদ বড়ই বিরক্ত হইয়া, ভগ্নমনে, শূন্য-হৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় সাক্ষাতের পাঁচ মাস পরে, অদ্য চতুর্থ

সাক্ষাতের দিন। কালাচাঁদ মহাস্ফূর্ত্তির সহিত ভাবে গদগদ হইয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়কে আবার ডাকিলেন,—"দাদা-মোশাই! অ,—দাদা-মোশাই! বাড়ীতে আছেন কি?—"

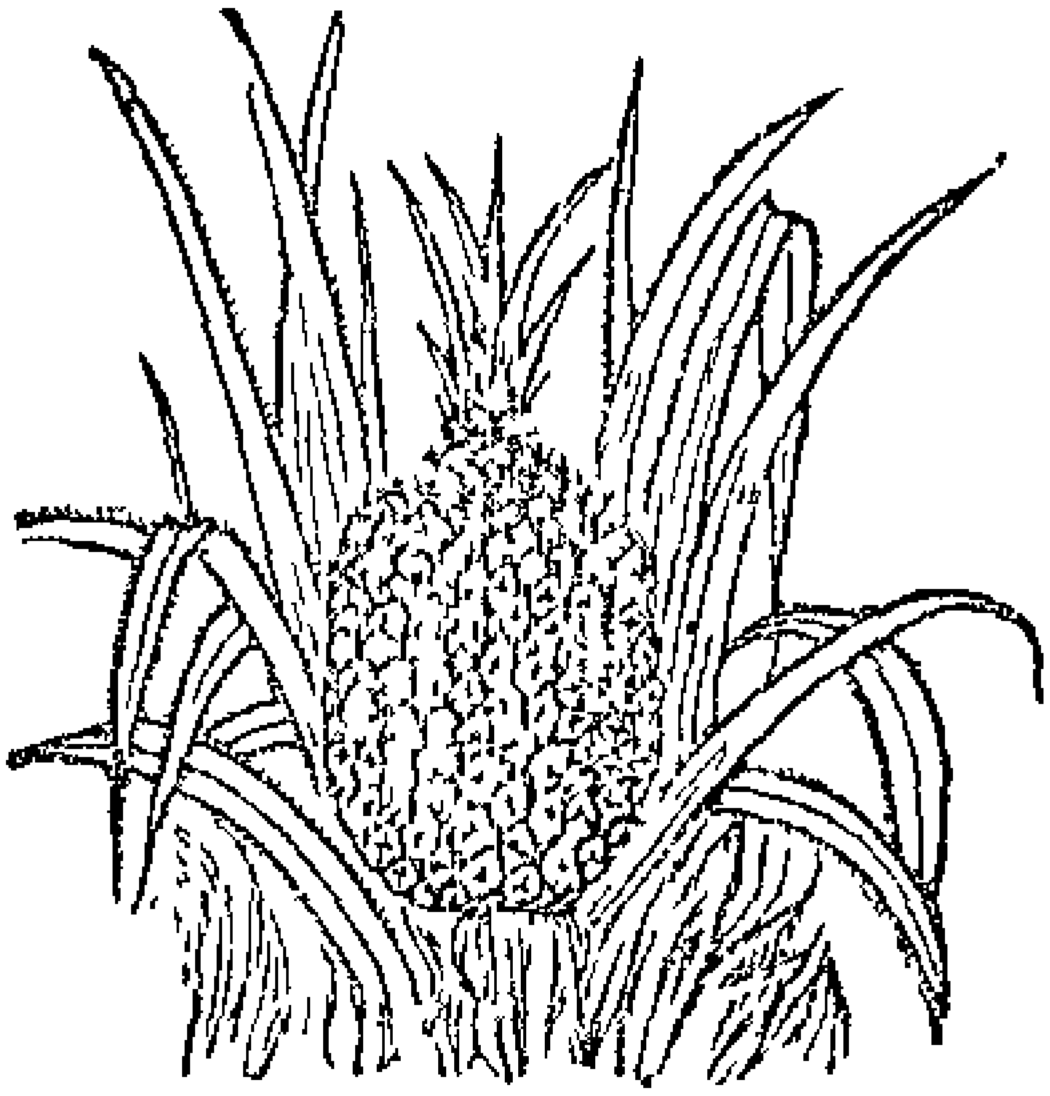

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরদাদা প্রাতঃস্নান করেন। যত বেলাই হোক, প্রাতঃস্নানের নিয়ম লঙ্ঘন হইবার যো ছিল না। সকালে উঠিয়া দুইটা ছোক্‌রা চাকর তাঁহাকে তেল মাখাইতে বসিত। তৈল-মর্দ্দন-কালে, তিনি একখানি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাপড় পরিয়া,—কখন বাঁকা, কখন সোজা, কখন কাত, কখন উবুড় হইয়া,—খণ্ডৈক জীর্ণ মস্‌লন্দ-মাদুরোপরি উপবেশন করিয়া, অভ্যাগত লোকমণ্ডলীর সহিত খোষ-গল্প করিতেন। এইরূপে প্রায় একঘণ্টার অধিক সময় অতিবাহিত হইত।

বৈঠকখানা-ঘরের দাওয়ায় এইরূপ তেলমাখা-কাণ্ড চলিত; "হলে" নানা-লোকের মজ্‌লিস্‌ বসিত।

সেকেলে সেরেস্তাদার বা দাওয়ান্‌জীর অতুল পসার-প্রতিপত্তি ছিল। কাজেই বহুব্যক্তি অনু-

গ্রহ-ভিখারী হইয়া ঠাকুরদাদার সহিত দেখা করিতে আসিত। তিনি কাহাকেও অনুগ্রহ-সুধা বিতরণ করুন বা, না করুন, লোকে যোদ্ধা আসিতে ছাড়িত না। বিষম ওলোপ-দেওয়া মধুর হাঁড়াতেও পিঁপ্ড়া ধবে। আশা মায়াবিনী।

প্রাতঃস্নান করিয়া, গা-মুছিয়া কাপড় পরিতে প্রায় তাঁহার সাড়ে-আটটা বাজিত। তৎপরে সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, নাকে তিলক প্রভৃতি অঙ্কিত হইত। পূজা-আহ্নিক শেষ না হইতে-হইতেই সাড়েনয়টা বাজিত। তার পর, তিনি কিছুক্ষণ কাছারীর কাগজপত্র দেখিতে বসিতেন। বেলা ১১টা হইলে আহার। আহারান্তে নিদ্রা। এমনি সু-বন্দোবস্ত ছিল—বারটা বাজিলেই ঘুম ভাঙ্গিত। তৎক্ষণাৎ অমনি তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া পাল্কী-যানে কাছারী যাইতেন।

যাক্, ও-কথা। কালাচাঁদ যখন প্রাতে দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতে লাগিলেন, "দাদা মোশাই! অ,—দাদা-মোশাই!"—তখন ঠাকুরদাদা ওরফে হরিতারণ,

রামঠাকুরের সহিত খোষগল্পে একাগ্রচিত্তে নিযুক্ত ছিলেন। রামঠাকুরের নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়; পাড়ার পুরোহিত; অর্দ্ধ-প্রবীণ; এবং ঠাকুরদাদার বন্ধু। এ ছাড়া, তাঁহার গুরুগিরি ব্যবসাটাও আছে। পাড়ার সর্ব্বরকম পূজা-কার্য্যই তাঁহার একচেটিয়া; সে অঞ্চলে অন্য ব্রাহ্মণের লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। হুগলী অঞ্চলে বড় বড় শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হিসাবে তাঁহাব সর্ব্বাগ্রে নিমন্ত্রণপত্র আসিত। হরিতারণের বিশেষ অনুগত বলিয়াই, তিনি এতটা বাড়িয়াছিলেন।

রামঠাকুর, হরিতারণের এত ভালবাসার সামগ্রী কেন? এ-কি অকৃত্রিম প্রণয়, নিঃস্বার্থ প্রেম,—না নিষ্কাম-ধর্ম্ম? কি,—তাহা কেমন করিয়া বলিব? তবে এইমাত্র জানি, রামঠাকুরের সহিত ঠাকুরদাদার সময়ে সময়ে কাণাকাণি কথা হইত,—ইঙ্গিত, ঈসারায় কথা চলিত।

রামঠাকুরের অন্যান্য সদ্‌গুণ যত অধিক মাত্রায় থাকুক্ না কেন, সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার লোক-

প্রসিদ্ধি ছিল। সংসারে সম্ভবত এমন কোন বিষয় নাই, যাহার সংবাদ তিনি রাখেন না। ইস্তক রাজনৈতিক-গগনের ঘন-ঘটা, নাগাইদ সমাজ-নৈতিক-অন্দরের আলোক-ছটা,—এতৎসমস্তই তাঁহার চক্ষুর গোচরীভূত ছিল। ভিতর-বাহির, সদর-মফস্বল, তেমাথা-চৌমাথা, গলি-ঘুঁজি,—সমস্তই তাঁহার নখ-দর্পণে। যিনি যে কথা তুলুন না কেন, তিনি নিশ্চয়ই তাহাতে "হাঁ—না" একটা সায় দিবেন। ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কথা পাড়, তিনি বলিবেন, "তর্কপঞ্চানন একজন অবতার-বিশেষ ব্যক্তি; ইংরেজী না প'ড়ে, ইংরেজীতে তিনি বক্তৃতা ক'রেছিলেন। সেই গঙ্গার বাঁধাঘাটে ব'সে, চক্ষু বুজিয়া আহ্নিক করিতে করিতে, আহা!—দুইটা গোরার ইংরেজী-গালাগালি কেমন তিনি শুনে মুখস্ত করেছিলেন! তর্কপঞ্চাননের দক্ষিণ উরুতে একটা তিল ছিল।"—রামঠাকুরের কথা অনর্গল এই ভাবেই চলিতে থাকিবে। কেহ যদি জিজ্ঞাসেন,—"রামঠাকুর! কপিলা-গাই দেখিয়াছ?" তিনি উত্তর দেন—

"আমি আর, কপিলা-গাই দেখি নাই? আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহের একযোড়া কপিলা ছিল। রাত্রে পাছে মশা খায় বলিয়া তিনি তাদের জন্য দুটা রেশমের মশারি তয়েরি ক'রে দিয়েছিলেন! দুধ যেন মিছরির তার! জয়পুরের রাজা সে দুইটী কপিলা-গরুর দাম দশহাজার টাকা দিতে চাহিলেও, তিনি তাহাতে বেচিতে স্বীকার হন নাই। সেই গাই দুটী যেন সাক্ষাৎ ভগবতী; বাড়ীতে একশত কুটুম্ব আসিয়াছে; বুড়া-ঠাকুরদাদা গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাতে কপিলার কাছে গিয়া বলিলেন, "মাগো, লজ্জা নিবারণ কর, আজ শতলোক অতিথি।" কপিলা দুটী হুড়্‌হুড়্‌ করে অমনি দু-হাঁড়া দুধ ঢেলে ফেলিল। তখন দুধ, দিয়ে ফুরাতে পারি না।"

ডুমুর-ফুল, দিনে তারা, সাপের পা—রামঠাকুর এ সমস্তই দেখিয়া থাকেন। অধিক কি, তিনি আমগাছে কাঁঠাল, নারিকেল গাছে লিচু, এবং কলাগাছে ওল ফলিতেও দেখেন। অসাধারণ গুণ।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার দৃষ্টি অধিক—রমণীকুলের উপর। কোন্ রমণী কখন্ কি দিয়ে ভাত খায়, কখন্ কি রকম কাপড় পরে, কার কত ভরির ক-খানি গহনা আছে,—এ সমস্তই তিনি জানেন। কোন্ রমণী দাঁতে মিশি মাখে, অধরে আল্‌তা দেয়, হাতে উল্‌কি পরে—এ সমস্ত তাঁহার কণ্ঠাগ্রে। কোন্ রমণীর নাকটী মুখটী চোখটী কেমন,—দাঁতটী হাতটী ঠোঁটটী কেমন,—নামটী, ধামটী, শ্যামটি কেমন,—চুলটি, ফুলটি, দুলটি কেমন,—এ সমস্তই তাঁহার নখ-দর্পণে। কোন্ রমণীর চলন, দোলন, হেলন কেমন,—হাস, ভাষ, শ্বাস, কেমন,—তাল, মান, রসান কেমন,—এ সমস্তই তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত।

বাস্তবিকই নারীজাতির প্রতি রামঠাকুরের বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি পথে চলে যান, আর ফিরে ফিরে চান, পাছে পশ্চাতের রমণী দেখিতে না পান। পথি-পার্শ্বস্থ প্রত্যেক জানেলার প্রতি তিনি নিদারুণ নয়ন-বাণ নিক্ষেপ করেন। জানেলায়

যে কিছু পদার্থ থাকে, তাহার সার-সত্ত্ব বাণবিদ্ধ হইয়া, মহাকর্ষণে তাঁহার হৃদয়কন্দরে আসিয়া পড়ে। তৃণ-গাছটিরও এড়ান্ নাই।

বিশেষ-বিশেষ রমণীর গুণাগুণ-সমালোচনে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পটু ছিলেন। মহিলা-কাব্যের তাঁহাকে মল্লিনাথ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে সমালোচন, সময়ে সময়ে কিছু তীব্র কটুকষায় হইয়া পড়িত। ইহাতে সমালোচকের দোষ কি? বিষয় বুঝিয়া ব্যাখ্যা হইবে ত! অবোধ দুষ্ট লোকে এই সমালোচনকে—ব্যাখ্যা, টীকা, বা ভাষ্যকে—কখন কখন 'কুৎসা' নামে অভিহিত করিত। বলিত, রামঠাকুর লোকের কলঙ্ককাহিনী কীর্ত্তন করিতে বেশ মজপুত।

মজপুত—মজপুতই;—কিন্তু কুৎসায় দোষ কি? সংসারের মধ্যে সারসামগ্রী—কুৎসা। একাজে বক্তা-শ্রোতা—উভয়পক্ষের মন যেমন প্রফুল্লিত, পুলকিত, কণ্টকিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। প্রথম বৈশাখে বেলা আড়াই প্রহরে, ঝাঁ-ঝাঁ রোদের

সময়, নুন-লঙ্কা-বিমিশ্রিত কাঁচা আম-ছেঁচা যেরূপ মিষ্ট, ইহা সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক মিষ্ট। অথবা একদিকে পাকা ফজ্‌লী আম, অন্যদিকে কুলকামিনীর কুৎসা,—তুমি কোন্‌টী চাও? আকাশে যেমন পূর্ণ-চন্দ্র, সরোবরে যেমন প্রফুল্ল-পঙ্কজ, উদ্যানে যেমন নবমল্লিকা,—কথার মধ্যে সেইরূপ কুৎসা। গৃহস্থাশ্রমের অদ্বিতীয় অবলম্বন, মনুষ্যজীবনের একমাত্র ইষ্টমন্ত্র, এমন সর্ব্বজনপ্রিয়, এমন সর্ব্বজনমোহকর কুৎসাকে ছাড়িয়া কে থাকিতে পারে?

যাই-হউক, রামঠাকুর নারী-চরিত্র-সমালোচনে সদাই নিযুক্ত থাকিতেন।

যাহাতেই নিযুক্ত থাকুন না কেন,—রামঠাকুরের নাম ছিল গেজেট। গেজেটে যে কেবল রাজনীতি, সমাজনীতি, নারীনীতি, যুবক-যুবতী থাকিত, তাহা নহে; স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল ত্রিভুবনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—এই ত্রিকালের সংবাদ দৃষ্টিগোচর হইত।

রামঠাকুরের দৈনিক কার্য্য—প্রাতে গঙ্গাস্নান করা। গঙ্গাস্নানে প্রত্যহই যে সমান সময় নষ্ট—এবং

তজ্জনিত প্রত্যহই যে সমান কার্য্যক্ষতি হইত, তাহা নহে। যেদিন গঙ্গার ঘাটে কেহ কোথাও থাকিত না, রামঠাকুর সেদিন "হুপ" করিয়া ডুব দিয়া, মাথা মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কোনও পর্ব্ব উপলক্ষে যেদিন গঙ্গার-ঘাট লোকপূর্ণ হইত, সেদিন রামঠাকুরের প্রায় একঘণ্টা সময় বৃথা কাটিত। গঙ্গাগর্ভে বসিয়া নানারূপ প্রক্রিয়া সাধিত হইত; তপ জপ পূজা আহ্নিক—কত রকম কি যে করিতেন, তাহা কেমন কবিয়া বলিব? —তিনি নীরবে নিষ্পন্দে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ঘাটে বসিয়া থাকিতেন। মাসের মধ্যে দশদিন এইরূপ দৈববিড়ম্বনা ঘটিয়া সময় নষ্ট হইতে থাকিলে, তিনি শেষে—এত ভোরে স্নানের বন্দোবস্ত করিলেন যে, তখন সাধারণত জীবমাত্রই ঘোর-ঘুমে অভিভূত থাকিত,—গাছ-পালায় রাত্রির শেষচিহ্ন দেখা যাইত। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। এক-আধ দিন এক আধ জন দুষ্ট লোক তাঁহার অনুসরণ করিয়া, গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থ উপনীত

হইত। মাসের মধ্যে অন্তত তিন চারি দিন এরূপ দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

ভদ্রসম্ভ্রান্ত কুলবধূগণও প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন। ঘাটে যেদিন সুন্দরীকুলের সমাগম কিছু অধিকমাত্রায় হইত, সেদিন রামঠাকুর আর সহজে ঘাট ছাড়িতেন না। তিনি সেদিন অনিমিষলোচনে মহাধ্যানে মহানিযুক্ত হইয়া মহামহিমান্বিত-ভাবে মহাতপ সাধন করিতেন।

স্নানের পর ঘরে গিয়া রামঠাকুর একখানি জীর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন। নাকে তিলক কাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে নানারূপ ছাপ্ দিতেন। তৎপরে অর্দ্ধঘণ্টার কিঞ্চিৎ অধিক কাল আপন শয়নঘরে খিল দিয়া, নির্জ্জনে কোন মহৎ কাজ সম্পাদন করিতেন। প্রচার ছিল, তিনি যোগসাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই দুষ্টলোকগুলা রটাইত,—রামঠাকুর ঘরে খিল দিয়া, লুকাইয়া গুড়মুড়ি খাইতেন। কিন্তু এ কথা কি কখন সম্ভবপর হয়? যাঁহাকে প্রত্যহ দশটার পর যজমানবাড়ী অন্তত আট-দশটী বিষ্ণুপূজা

গঙ্গার ঘাটে রামঠাকুরের আহ্নিক।

করিতে হয়, তিনি কি কখন প্রভাতে স্নানের পরই গুড়মুড়ি উদরে দিতে পারেন? তবে এ কথা সত্য যে, যে ঘরে তিনি খিল দিয়া গোপনে ধ্যানস্থ হইতেন, সে ঘরে গুড় এবং মুড়ি উভয় পদার্থই সদা বর্ত্তমান থাকিত; এবং খিল-খোলার পর গুড় এবং মুড়ি অনেক পরিমাণে কমিত। কিন্তু তাই বলিয়াই যে, সেই গুড়মুড়ি নিশ্চয়ই রামঠাকুর খাইতেন, তাহার প্রকৃত প্রমাণ কি? ঘরে ইন্দুর আছে, আরস্থলা আছে, ছারপোকা আছে, মশা আছে,— নাই কি? ইহাদের দ্বারাওত গুড়মুড়ির কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হওয়া সম্ভব! বিশেষ, গৃহাভ্যন্তরে বায়ু সদা প্রবহমাণ; বায়ুওত কতক উড়াইয়া লইতে পারে। সময়ে সময়ে ঘরের মাঝে রোদও গিয়া থাকে। রোদের তাপে শুখাইয়া গুড়মুড়ির ওজন কম হওয়া অসম্ভব কি? সুতরাং ওজনে এবং পরিমাণে কম হইলেও রামঠাকুর তাহাতে নিতান্ত নির্দ্দোষ!

একদিন একটা দুষ্টলোক কপাটের ফাঁক দিয়া দেখিল, রামঠাকুরের মুখ ভরা, গণ্ডস্থল পূর্ণ, সম্মুখস্থ

ধামিতে মুড়ি, এবং দক্ষিণ-হস্ত সেই ধামিতে সমর্পিত। এরূপ অবস্থা দেখিলেই যে, রামঠাকুর নিশ্চয় মুড়ি খাইতেছেন বলিতে হইবে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণই বা কৈ? মুড়িব ধামিতে হাতটী সংলগ্ন বলিয়াই যে, তিনি নিশ্চয় মুড়ি মুখদ্বারা খাইতেছেন,—তাহা কেমন করিয়া বলিব? মুখ ভরা, গণ্ড পূর্ণ বটে, কিন্তু রেচক-কুম্ভক-যোগেও যে ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে না, তাহারই বা খাঁটি প্রমাণ কি? কিন্তু সেই দুষ্ট ব্যক্তি না বুঝিয়াই, বিশেষ প্রমাণ না পাইয়াই বলিল, "ওকি ঠাকুদ্দা?—ওকি ঠাকুদ্দা?—নেয়ে এসেই মুড়ি খাচ্চ যে!! ঠাকুরপূজা না কবেই মুড়ি খাওয়া কি? এই কি তোমার আহ্নিক?"

ভয়-চকিত রামঠাকুর বুদ্ধি-বলে, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের গুণে, উত্তর দিলেন,—"কেহে—ভায়া নাকি?—তা, ভেবো না,—তা, ভেবো না,—সে সব কিছু নয়। রজ্জুতে বোধ হয় তোমার সর্প-ভ্রম হচ্চে। বেদান্তের নিয়মই তাই। এ সংসার মায়াময়। বস্তু এক,—আরোপ অন্যের। যথা—

রামঠাকুরের কুম্ভকযোগ।

ব্রহ্মাদি তৃণং পর্য্যন্তং মায়া দ্বারা কল্পিতং জগতং। আচ্ছা ভায়া,—দাঁড়াও, দাঁড়াও—যাচ্চি আমি,—তা, কি জান, তোমার বাপের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল! সেদিন দেওয়ানজীব বাসায় ব্রাহ্মণ-ভোজনে একহাঁড়ি সন্দেস পেয়েছিলাম,—তা, ভায়া, কিছু খেয়ে যাও! অতি উপাদেয় জিনিষ,—তোমার জন্যই রেখেছি।” এই বলিয়া রামঠাকুর খিল খুলিয়া ভায়ার গায়ে হাত বুলাইয়া, আপ্যায়িত করিয়া, সন্দেস খাওয়াইলেন।

সে যাহা হউক, এইরূপ ধ্যানের পরই রামঠাকুব প্রত্যহ প্রাতে হুগলী-সহর একবার পবিক্রমণ করিতেন। নিকটেই সদরামীনের বাসা; তাঁহার নিকট প্রথমে উপস্থিত হইয়া, এক ছিলিম তামাক খাইয়া, সদরামীন যে সকল নূতন দৈনিক-সংবাদ অবগত আছেন, তাহা সংগৃহীত করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিতেন। তারপর উকীলবাবুর নিকট উপনীত হইয়া, রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং তারের সংবাদ গ্রহণ করিতেন। অবশেষে ডাক্তার-বাবুব

বাসায় গিয়া রোগ, রোগী, হাঁসপাতাল এবং গৃহস্থের অবস্থা অবগত হইতেন।

অতঃপর রামঠাকুর উচ্চ-স্তর হইতে নামিয়া মধ্যস্তরে সমাগত হইতেন। চকের বাজারে ময়রাদের দোকানে বসিয়া, দুই-ছিলিম তামাক পুড়াইয়া খরিদ-বিক্রয় দর-দস্তুরের সমালোচন করিতেন। অনন্তর সাহাদের দোকানে গিয়া নিশাচর বাবুদের রাত্রির সংবাদ লইতেন। মধ্য-স্তরের কার্য্য-সমাধা হইল, তিনি নিম্ন-স্তরে নামিতেন। তখন চৌমাথার মোড়ে দাঁড়াইয়া ঝী এবং খানসামারন্দের সহিত তাঁহার সদালাপ হইত। চোখ-ঠেরাঠেরি, রসিকতা, মুচ্‌কি হাসি—কত যে রঙ্গভঙ্গ বহিয়া যাইত, তাহার নির্ণয় কে করিবে?

এইরূপ প্রত্যহ প্রাতে উচ্চ-নীচ-মধ্য-শ্রেণীর নিকট সর্ব্বসংবাদ সংগ্রহ করিয়া, রামঠাকুর বেগে সেই সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত হরিতারণ দত্তের বাসাভিমুখে ধাবিত হইতেন।

অদ্য উপনীত হইয়াই, বিশ্ব-গেজেট রামঠাকুর

সভাস্থলে মহা খোষগল্প যুড়িয়া দিলেন। সেই মহাগল্পের মোহিনী-মায়ায় লোক সকল চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া রহিল। তৈলমর্দ্দক চাকর-ভুটা, তেল মাখাইতে ভুলিয়া গিয়া, দেওয়ানজীর মাথায় ও গালে হাত রাখিয়া, অচলভাবে, গড়া-সঙের মত, হাঁ করিয়া গল্প গিলিতে লাগিল। তখন সেই সভাস্থ সর্ব্বচক্ষু যেন নির্নিমেষে রামঠাকুরেব বদন-চন্দ্র দর্শন করিতে লাগিল। সর্ব্বকর্ণ রাম-ঠাকুরের কথা-সুধা পান করিতে লাগিল। সর্ব্ব-নাসিকা সুধা-সৌরভে মোহিত হইয়া উঠিল। সর্ব্ব-লোকই যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া, শমীক-ঋষির ন্যায়, ভগবৎচিন্তায় ভোব হইলেন।

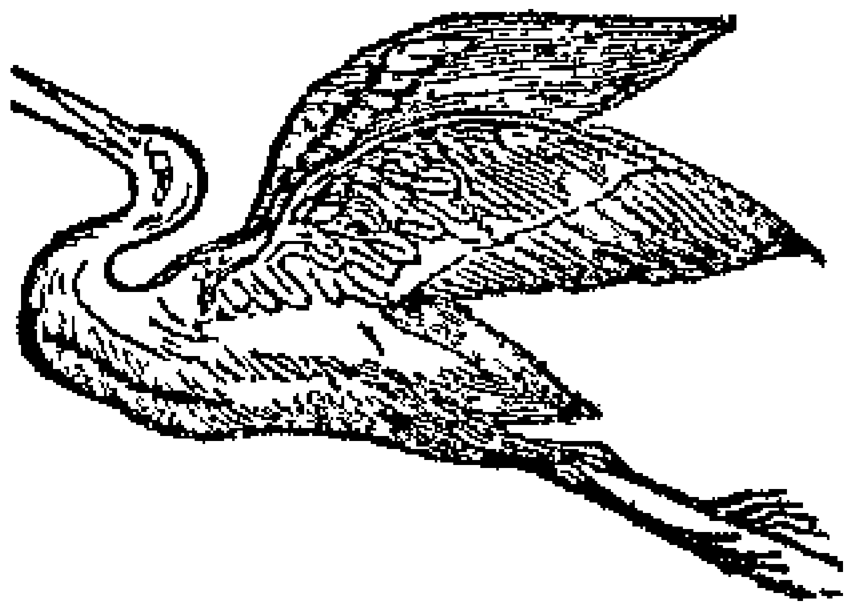

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামঠাকুর। সে অতি অদ্ভুত! এমন কথন শুনি নাই, দেখি নাই! হ'বে না, হ'বার নয়! সে ভারি মজা! নিশ্চয়ই এর ভিতর মেয়ে-মানুষ আছে!—আমি বল্‌চি, সে-পক্ষে কোন সন্দেহ নাই!

সকল লোকের মন অমনি পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রামঠাকুর। একটা কথা একটু তলিয়ে বুঝে দেখ-না গা? লোকটা চাবি ভেঙ্গেচে, ঘরে ঢুকেচে, তেল মেখেচে, কুয়া থেকে জল তুলে নেয়েচে, এক খুলি রসগোল্লা এবং এক হাঁড়ি ক্ষীর খেয়েচে। শেষে বাক্স ভেঙ্গে নয়টী টাকা নগদ নিয়েচে—আর বুঝিবার বাকি কি?—হাঃ—হাঃ—মজা শুনুন;—ভোলা ময়রা পুলিসে এজেহার দিয়াছে যে, তার বাক্সে নোটে, টাকায়, রেজ্‌কীতে এবং পয়সায়

৬১৸১০ মজুদ ছিল; কিন্তু ভাঙ্গা বাক্সে, নয়টাকা মাত্র কমিয়াছে। পুলিস হাসিয়া বলিল, 'চোরে বাক্স ভাঙ্গিলে সব টাকাই লইত,—কেবল নয়টাকা লইবে কেন? আর, রাত্রে সদর-রাস্তার উপর চুরি হ'লে কি আমাদের পাহারাওয়ালা দেখ্‌তে পেতো না? অবশ্যই ইহার ভিতর কোন গুপ্ত রহস্য আছে।'—এই কথা ব'লে দারোগা-সাহেব রাগ ক'রে ভোলা-ময়রাকে থানায় বসিয়ে রেখেচে। রাগইত হ'তে পারে!—এমন ষড়যন্ত্রে কারই না রাগ হয়! চাবি ভাঙ্গিয়া, চুরি করিতে ঢুকিয়া, চোর কি কখন স্নান করে?—আর যদি স্নানই করে, তা হলে কি কখন ব'সে ব'সে ক্ষীর, সন্দেস, রসগোল্লা খায়? আচ্ছা, এমন চোর কি কখন দেখেচো,—৬১৸১০ মজুদ থাকিতে কেবল ৯৲ টাকা মাত্র লয়? আমি ঠিক্ বল্‌চি, ইহার ভিতর নিশ্চয় স্ত্রীলোক আছে। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটী কে?

সেরেস্তাদার হরিতারণকে হুগলীর সকলেই কর্ত্তা

বলিত। যখন তিনি সকলের কর্ত্তা, তখন তিনি আমাদের কর্ত্তা না হইবেন কেন? এবার হইতে আমরাও তাঁহাকে মাঝে মাঝে কর্ত্তা বলিয়া সম্বোধন করিব।

মৃদু-মন্দ-স্বরে কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন,—"কাকে সন্দেহ হয়? ভোলা-ময়রার দোকান ত চকের বাজারে;—ঘর তার বাবুগঞ্জে নয়? কার সঙ্গে কিরূপ ঘটনা হলো,—তার কিছু সন্ধান পেয়েছ কি?"

রামঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—"সে-সব ঠিক না ক'রে কি আমি এখানে এসেচি? যোদ্দা, আমার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স হলো, এমন রঙ্গ-রসের চুরি কখন দেখি নাই। আরে মোশাই!—টাকা, পয়সা, সিকি, আধুলি—সব পড়ে রৈল,—চুরি ক'ল্লে কিনা এক হাঁড়ী ক্ষীর? তাই বা চুরি ক'রে নিয়ে গেল কৈ?—ক্ষীরটে খেয়ে হাঁড়ীটে ভেঙ্গে রেখে গেল!! অদ্ভুত রহস্য বটে।"

কর্ত্তা। রকমটা কি বল দেখি?

রামঠাকুর। (কর্ত্তার প্রতি হাসি-হাসি চাহিয়া) ভোলা ময়রার তৃতীয়-পক্ষের বিবাহ। স্ত্রীটী উপ-যুক্ত হ'য়ে, এই সবে আজ তিন মাস ঘর কর্‌তে এসেছিলো। তা, আস্‌বার পরদিন থেকেই স্ত্রীপুরুষে দুজনে বিবাদ আরম্ভ হয়। সে ভারি এক রগড় উপস্থিত হলো! মেয়েটা তিনদিন ভাত খেলে না। আরে মোশাই!—পুরুষটা ক'ল্লে কি,—মেয়ে-টাকে বল্লে, তুমি ভাত না খেলে, হয় আমি গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌বো, না হয় বিবাগী হয়ে চ'লে যাবো! পাড়ার লোক এ-কথা শুনে ত আর হেসে বাঁচে না—

এইরূপ হুগলী-নৈমিষারণ্যে, রামঠাকুর-সূতের মুখে, ঠাকুরদাদা-প্রমুখ-মুনিগণ একান্ত-মনে যখন ভোলা-ময়রাণীর মহা-রাসলীলার মধুর কথা শ্রবণ করিতেছিলেন,—তখনই আমাদের সেই কালাচাঁদ দ্বারে দাঁড়াইয়া মাছ হাতে করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "দাদামোশাই! অ দাদামোশাই!—বাড়ীতে আছেন কি?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালাচাঁদের আজ সরস ভাব, প্রফুল্ল মুখ। তাঁহার পশ্চাতে একটী নগ্‌দা-মুটে। মুটেব মাথায় বাজরা। বাজরায় আলু, পটল, বেগুন, কাঁচকলা, এক হাঁড়ি দই, এবং পাঁচ সেব সন্দেস আছে।

কালাচাঁদ, "দাদামোশাই! অ দাদামোশাই"—ডাক ডাকিতে ডাকিতে, মাছ হাতে করিয়া মুটের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ঠাকুরদাদা, নাতী-কালাচাঁদকে তদ্‌ভাবে হঠাৎ দেখিয়া, অন্তরে চমকিয়া উঠিলেন। অন্তর চমকাইলেই বাহির চমকে। ঠাকুরদাদার দেহও তুলিয়া উঠিল। কিন্তু সেই দোলন-কম্পনভাব মুহূর্ত্তমধ্যে প্রশমিত হইল। কর্ত্তার হৃদয়-মাঝারে কি একটা যে, ভয়ঙ্কর বৈত্যুতিক তরঙ্গপ্রবাহ বহিয়া গেল,—সভাস্থ কোন লোকই তাহা বুঝিতে পারিল না।

কম্পন দূর হইলে, ঠাকুরদাদা খানিক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি কালাচাঁদের মুখের দিকে

তাকাইয়াই থাকিলেন, সহজে বাঙনিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। কর্ত্তা—ওস্তাদ;—পাকা হাড়! শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইলেন। ইত্যবসরে কালাচাঁদ দোযারে উঠিয়া, মাছটী ধড়াস্ করিয়া ঠাকুর দাদার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

কর্ত্তা তখন স্বকীয় মুখকে হাস্যময় করিলেন। প্রীতির সহিত মধুরকণ্ঠে পৌত্রকে সম্বর্দ্ধন করিয়া বলিলেন, "এস, এস, ভায়া এস। ভাল আছ?"—

এই কথা বলিতে না-বলিতে, কালাচাঁদ ঠাকুর-দাদাব সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইলেন। দাদার চরণ-ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন।

দাদা, দক্ষিণহস্ত পৌত্রের মাথায় দিয়া বলিলেন, "চিরজীবী হও, সুখে থাক, আমোদ আহ্লাদ কর।—ওরে, কে আছিস্, মুটের মাথা থেকে মোটটা নাবা।"

মোট নামানো হইল,—কালাচাঁদ তাহাকে চারি পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

ঠাকুরদাদা। ভায়া আজ ভাল হয়ে ব'স—

ব'সে বিশ্রাম কর। সেদিন এলে,—দেখা দিয়ে অমনি চ'লে গেলে। তোমার ঠাকুরমা তোমার জন্য ভাতবেড়ে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। কিন্তু সেদিন তুমি হঠাৎ যে কোথায় উঠে চ'লে গেলে, আর খুঁজে পাওয়া গেল না। আজ এখানে থাক,—খাও, পর, শোও, মাখ,—এ'ত তোমার ঘর!—

কালাচাঁদ। তা, আমার ভারই'ত আপনার উপরেই। আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে?

ঠাকুরদাদা। তা'ত বটেই ভায়া! তুমি আমার সুরেশ অপেক্ষা বড়।

এইরূপ আপ্যায়িত হইয়া কালাচাঁদ বৈঠকখানায় সেই সভামণ্ডপে বসিলেন।

কর্ত্তা উচ্চধ্বনিতে বলিলেন, "অরে, কে আছিস্! ঐ মাছ, সন্দেস, দই—তরকারি বাড়ীর ভিতর দিয়ে আয়!—গিন্নিকে বল্, কেলেসোণা তাঁকে দই-সন্দেস দিয়েছে,—আর কেলেসোণা এইখানে থাক্‌বে, আর আমার সঙ্গে একত্র আহার কর্‌বে।"

আদেশমত ভৃত্যবৃন্দ সর্ব্বকর্ম্ম সমাধা করিল।

কর্ত্তা সেই তৈলমর্দ্দক অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের মধ্যে একজনের কাণে কাণে কি কথা বলিলেন। সে অমনি উঠিয়া, এক ছিলিম খাস্ অম্বুরী-তামাক সাজিয়া, হুঁকায় বকুল-পাতার নল লাগাইয়া, কক্ষান্তরে নির্জ্জনে তাহা রাখিয়া দিল। তৎপরে কালাচাঁদের নিকট গিয়া, অতি বিনীতভাবে, ধীরে ধীরে, অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "হুজুর! একবার ওঘরে পায়ের ধূলা দিন্—তামাক তৈয়েরি।"

কালাচাঁদ হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "আজ যে অতিরিক্ত আদর দেখ্‌ছি! যা'হোক,—তামাকটা ছাড়া হবে না।"

বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ সেই নিভৃত ক্ষুদ্র কক্ষে, কালাচাঁদ সপের উপর বসিয়া, প্রাণ ভরিয়া সেই খাস্ তামাক খাইতে লাগিলেন। মুখের সজোর টানে সেই দোষশূন্য সুবৃহৎ হুঁকা গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। সুগোল ধূম্ররাশির ঘনসন্নিবেশে গৃহ পূর্ণ হইল,—শেষে উড়িয়া সভামণ্ডপে ছুটিল।

কালাচাঁদ এক একবার সুখটান মারেন, হাসেন আর মনে মনে বলেন, "আচ্ছা, এ কি রকম সামাজিক নিয়ম? বাহিরে গুরুজন আছেন বলিয়া, আমি লুকাইয়া ঘরের ভিতর তামাক খাইতেছি;—আমার ধূমপান গুরুজন জানিতে না পারেন, ইহাইত উদ্দেশ্য। কিন্তু হুঁকার এই ঘোর ঘর্‌ঘর্‌-ধ্বনি তাঁহারা কি শুনিতে পান নাই? এই ধূম্ররাশি এতক্ষণ কি তাঁহাদের নাকে, চোখে, মুখে লাগে নাই? তাঁহাদের নিকট হইতে আমি উঠিয়া আসিলাম, এই ঘরে বসিলাম, আর হুঁকার গড়্‌গড়্‌ শব্দ হইল,—ধূমে পৃথিবী যেন পরিব্যাপ্ত হইতে চলিল,—আমা ব্যতীত এ-কাজ কে করিবে? তবে আর না জানিতে পারিলেন কৈ? যখন তাঁহারা নিশ্চয় জানিতেই পারিলেন,—তখন লুকাইয়া তামাক খাইবার দরকার কি? বিশেষ, স্বয়ং ঠাকুরদাদাই ত, আমার জন্য তামাক সাজিতে বলিয়াছেন,—তখন জানাজানি সম্বন্ধে আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? এক কথা, গুরুজন ত

স্বচক্ষে তামাক খাওয়া দেখিতে পাইলেন না,—ইহাই তাঁহাদের উপর যথেষ্ট সম্মান-প্রদর্শন। কিন্তু এরূপ "জানা" যে, "দেখার" বাবা। তাই বলি, এ কি রকম সামাজিক নিয়ম?"

কালাচাঁদ এইরূপ ভাবেন, আর হাসেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অরণ্যচর নিষাদ, কামমোহিত বিহঙ্গকে বধ করিয়া শাপগ্রস্ত হয়। হরিণ-বধ পাপে পাণ্ডু রাজার মৃত্যু ঘটে। অম্বুবতী নর্ত্তকী, ইন্দ্রের সভায় সামান্য তালভঙ্গ-অপরাধে, মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। স্বর্গবেশ্যা-উর্ব্বশীর অপমান করায়, অর্জ্জুন নপুংসক হন। অন্যেত কোন্ ছার্—কীটাণুকীট? এইমাত্র যে, অতি কুকাজ সাধিত হইল, তাহার জন্য দায়ী কে? দোষ কার?—তাহার দণ্ডই বা কি? এ মহাপাপ হইতে কি উদ্ধারের উপায় নাই?

কোথায় মনোমোহিনী ময়রাণীর তত্ত্বকথা আরম্ভ হইয়াছিল, রাসলীলার রঙ্গরসে রসিক-সুজনের রসনা লহ-লহ করিতেছিল,—এমন সময় কি-না একটা মিস্‌কালো মিন্‌সে এসে, সব মাটী করে দিল। সুধাবৃক্ষ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল! ময়রাণী-মহা-

ভারতের আদিপর্ব্বেই অস্তিত্ব-লোপ হইল। এ শোক-শক্তিশেলে কাহার না বক্ষ বিষম বিদীর্ণ হয়? এবং যে দুষ্ট, এ দুর্ঘটনা ঘটাইবার মূল-কারণ, তাহাকে দ্বিগুণ দণ্ড দিলে দোষ কি?

দাও। কিন্তু গ্রন্থকার নির্দ্দোষ! আমি যে ইচ্ছা করিয়া, এ মহারসের মাঝে কালাচাঁদকে আনিয়াছি, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। কেহ বলে নাই, কেহ ডাকে নাই, কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই,—কালাচাঁদ আপনা-আপনিই আসিয়াছেন। তা, আমি কি করিব? যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই বিবৃত করিয়াছি। আমার বশে'ত ঘটনা নহে, ঘটনার বশে আমি। তবে এমনটা বলিলেও বলিতে পার, দোষ যাহা কিছু, তাহা ত কালাচাঁদেরই;—সে আসিল কেন? কিন্তু কালাচাঁদ কহিতেছেন, "আমার দরকার, তাই আসিয়াছি; তোমাদের যদি এত গরজ ছিল, ঘরে খিল দিয়া গল্প কর নাই কেন? আর, খিল খুলিয়া রাখাই যদি অভিপ্রেতই ছিল, তবে দ্বারে দ্বারবান্ বসাও নাই কেন,—

সে আমাকে দেখিলেই দূর করিয়া দিত?” রামঠাকুর উত্তর দিতেছেন,—“তুমি কালাচাঁদ-কালাপাহাড়, তুমি যে এ মুখ্যকালে—জমাট-গানের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িবে, তাহাই বা আমি কেমন করিয়া জানিব? আর, তুমি আসিলেই যে, কর্ত্তা আদরে গলিয়া গিয়া তোমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, এই গল্প ভুলিবেন—তাহাই বা কেমন করিয়া বুঝিব? আমি জ্যোতিষীও নই, জান-ও নই, গণৎ-কারও নই,—যে, ভবিষ্যৎ ঘটনা ভাবিয়া রাখিব!”

তবে দোষ কার? ভগবানের কি? কেন তিনি এমন ঘটনা ঘটাইলেন? ভগবান্ বলেন, “আমি কিছু জানি না; কর্ম্মফলে মানুষের ভোগাভোগ নিয়মিত। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমন ভোগ পায়,—আমি কর্ম্মফলদাতা মাত্র।

এতক্ষণে বুঝা গেল, দোষ কাহারো নহে, দোষ কপালের। রামঠাকুরে যশোভাগ্য যদি পুষ্পিত হইত, শ্রোতৃবৃন্দের সুকৃতি যদি ষোলকলা থাকিত,—তবে কি এই ময়রাণী-মাহাত্ম্য,—এই

মধুমাসের মিঠা গান, মাঠে মারা পড়িত?—না, সেই শোকে আজ দুনয়নে দশধারা দর্‌দর্‌ বহিত?

রামঠাকুর প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, মাছ-দই-তরকারী বাড়ীব ভিতর গেলেই, তিনি আবার গল্প আরম্ভ করিয়া দিবেন। তৎকার্য্যাবসানে, তথাচ কর্ত্তা কালাচাঁদের সহিত এক আধটী কথা কহিতে থাকিলেন;—কাজেই রামঠাকুর গল্প যুড়িবার ফাঁক পাইলেন না। কালাচাঁদ বিছানায় উপবিষ্ট হইলে, কর্ত্তা ঈষৎ অন্যমনস্ক হইলেন; রামঠাকুর গল্প অল্প আরম্ভ করিয়া আবার বন্ধ করিলেন। তার পর, কালাচাঁদ তামাক খাইতে অন্যকক্ষে গমন করিলে, রামঠাকুর ভাবিলেন, পাপ বিদায় হইল। তখন আর কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া, কাহারো অপেক্ষা না করিয়া, পঞ্চমে সুর চড়াইয়া, রামঠাকুর একেবারে কথা আরম্ভ করিলেন;—"চ'কে এমন চমৎকার চুরি আমি কখন দেখি নাই! অতি অদ্ভুত! অতি অদ্ভুত! ভোলাময়রার কপাল একবারেই ভেঙ্গেছে! মেয়েটা তার একরাত্রে সর্ব্বনাশ করে গেল

গা? স্ত্রী রূপবতী হইলে, তা'তে অনেক দোষ ঘটে। সে যাহোক, তারপর পূর্ব্বকথা শুনুন,—ভোলাময়রা তার স্ত্রীকে অনেক বুঝালে। কিন্তু মেয়েটা মোটেই কথা কয়না,—বুঝ্‌বে কি? একে কাঁচা বয়স, তা'তে দারুণ অভিমানিনী, তাহার উপর গায়ের রঙটী যেন কাঁচা-সোণা;—তা, আমি ময়রার ঘরে অমন সুন্দরী মেয়েমানুষ কখন দেখি নাই,—বল্‌বো কি মোশাই,—ভোলাময়রা মেয়েটাকে কথা কওয়াবার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগলো!"—

রামঠাকুরের গল্প-গানে এত গরমমস্‌লা পড়িলেও, কর্ত্তার সে রস-পানে সাধ রহিল না। তিনি পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কই রহিলেন। ধীরে ধীরে একজন ভৃত্যকে বলিলেন, "কালাচাঁদ যদি আর একবার তামাক চায়, দাওগে।"

এদিকে কালাচাঁদ তামাক খাইতে খাইতে সামাজিক চিন্তায় নিমগ্ন। গুরুজন-অসাক্ষাতে তামাক খাইবার রীতির অসারত্ব ভাবিয়া কতই হাসিতেছেন, কতই মুখভঙ্গি করিতেছেন, কখন বা স্থিরচক্ষে

চাহিতেছেন! বিধাতার নির্বন্ধ কেমন করিয়া বুঝিব?—কিন্তু গত কল্য হইতে কালাচাঁদ প্রকৃতই প্রগাঢ় চিন্তাশীল এবং সূক্ষ্ম-সমালোচক হইয়াছেন। বন্ধু-পতিতপাবন কর্ত্তৃক বিতাড়িত, আশ্রয়-রহিত, অভুক্ত, অর্থশূন্য, ক্লিষ্ট কালাচাঁদ গঙ্গার উপকূলে শ্মশান-সম্মুখে একাকী উপবেশন করিয়া, গতকল্য নিশীথে, ঘোর দুর্দ্দিনে, ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুতের মধ্যে, অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা ভাবিয়াছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তখন তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, সংসারের সকল বেটাই চোর, সকল বেটাই বঞ্চক, সকল বেটাই বদমাইস্! সংসারে ভাললোক একটাও নাই,—তবে কেহ উনিশ, কেহ বিশ,—এইমাত্র তফাৎ। তখন হইতে তিনি সামাজিক সর্ব্বপ্রকার রীতিপদ্ধতির পদে পদে ভুল দেখিতে লাগিলেন। আজ কালাচাঁদের চক্ষে এমন কোন বিষয় নাই, বস্তু নাই,—যাহা প্রমাদে পরিপূর্ণ নহে। যাহাই পর্য্যালোচনা করেন, তাহাই নিতান্ত অসার, ক্ষুদ্র, হেয় বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মে। সংসারকে

যতই অসার দেখেন, ততই তাঁহার স্ফূর্ত্তি হয়, আনন্দ হয়, গাম্ভীর্য্যের সহিত বিকট হাসি বৃদ্ধি পায়।

এইরূপ হাসিতে হাসিতে কালাচাঁদের কাণ রামঠাকুরের গল্পের দিকে গেল। গল্পের মর্ম্ম অবগত হইয়া কালাচাঁদ মর্ম্মান্তিক হাসিয়া উঠিলেন। হাসির তেজে তামাক খাওয়া বন্ধ হইল; মুখ আর হুঁকাছিদ্রে সংলগ্ন করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"হোঃ হোঃ—ভোলা-ময়রার দোকানের চুরি কি স্ত্রীলোক দ্বারা সংঘটিত হইল? সেই স্ত্রীলোকটী আবার, ভোলারই স্ত্রী? বেশ বেশ! মজা বেশ! সংসারটা হলো কি?—বাঃ—বাঃ—"

কালাচাঁদ এবার কুল-কুল করিয়া একমুখ হাসিয়া ফেলিলেন। অতি-দুঃখে একরকম হাসি আসে, এ হাসি কি তাই?

কর্ত্তার আদেশমত এমন সময় ভৃত্য গিয়া বলিল, "হুজুর! আর একবার তামাক সেজে নিয়ে

আসি!” হাস্যময় কালাচাঁদ উত্তর দিলেন, “বহুত আচ্ছা!”

ও-দিকে অনর্গল-গল্পকারী রামঠাকুরকে কর্ত্তা বলিলেন, “আজ ঠিক সন্ধ্যার সময় তুমি একবার এসো! কোন বিশেষ কথা আছে।” কর্ত্তার কথার সুর, মুখের ভঙ্গি, চোখের চাহনি,—দেখিয়া-শুনিয়া রামঠাকুর ঠিক করিলেন, অদ্যকার গতিক বড় মন্দ,—কর্ত্তা গল্প শুনিতে রাজী নহেন।—ভাবিলেন,—“ময়রাণীর কথায় কর্ত্তা এত বিরক্ত কেন? ময়রাণীর সঙ্গে কর্ত্তার কোন গোলযোগ আছে নাকি? কিন্তু আমার কাছে ত তাঁহার কোন কথাই গোপন নাই;—আমাকে না বলে তবে কি ডুবে-ডুবে জল খেয়েচেন নাকি?—আচ্ছা, তা হোক, সন্ধ্যার পর সব জানা যাবে,—আমার কাছে কতক্ষণ কথা ছাপা রাখিবেন?”

রামঠাকুর প্রকাশ্যে বলিলেন, “যে-আজ্ঞে! আপনি যা আদেশ কর্‌চেন, তাই হবে—”

কর্ত্তা। ঠিক সন্ধ্যার সময় এসো—

রামঠাকুর। আজ্ঞে, আমি না-হয় বৈকালে এসে খানিক ব'সে থাক্‌বো। এখন আজ্ঞে করেন ত, এখন আমি আসি—

কর্ত্তা। আচ্ছা,—এসো।

গল্পের গেজেট রামঠাকুব দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

কর্ত্তার বৈঠকী-সভায় প্রায় ষোল জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বস্ব-গৃহে গমনের নিমিত্ত চাদর গুটাইতে লাগিলেন। অকালে,—সভার কার্য্য অসমাপ্ত থাকিতে, সভা-ভঙ্গহেতু, সভ্য-মণ্ডলী নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহাদের সাধ ছিল,—রামঠাকুরের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিবেন যে, ময়রা-মহিলার বয়স সপ্তদশ বৎসরের অধিক হইবে না,—তদুপরি নব-যৌবনের নব-লাবণ্য ঢলঢল্‌ করি-তেছে; মুখশশী সদা সুধা বিলাইতে উদ্যত; উচ্চকুচগিরি আকাশ-ভেদ করিয়া এখনি চলিয়া যাইবে; বঙ্কিম-নয়নে পুরুষের পাগল-প্রাণ কাড়িয়া লইবে; ক্ষীণকটী বায়ুভরে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে;

এবং নামটী অন্তত ভুবন-মনো-মোহিনী হইবে। "সর্ব্বাবয়বানবদ্যা, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, সর্ব্বভূতপ্রিয়ম্বদা সেই ময়রাণী-রমণী, বৃদ্ধ-পতির আনুগত্য ঈষৎ—অতি অল্পমাত্রায়,' উপেক্ষা করিয়া, রাজপুত্রবৎ এক নবযুবকের হাত ধরিয়া—(অভাবপক্ষে)—রাজপথে হাসিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন ;—" এরূপ ঘটনাও তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে চ'কের দোকানে চাবি-ভেঙ্গে ক্ষীর খাওয়া মিলে কৈ? গল্পের সামঞ্জস্য থাকে কৈ?—আচ্ছা, মিলাইয়া লও,—"যুবক-যুবতী রাজপথে অনুরাগ-ভরে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতা হইলেন। সন্ধ্যার পর নিশা আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা ধারাবাহিক বিচরণ-জন্য ক্ষুৎপিপাসা-শ্রমাতুর হইয়া, শেষে দোকান-ঘরের চাবি খুলিয়া, জলযোগ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।" মিলিল'ত! সামঞ্জস্য হইল'ত! তৃপ্তি হইল ত!

কিন্তু এ আশার এক কণাও পূর্ণ হয় নাই।

সভ্যগণ, ভগ্নমনে চাদর ঝাড়িয়া, কাঁধে ফেলিয়া, বিদায়ী-তামাকের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অহো কি মন্দভাগ্য! তামাকও কেহ দিল না, কেহ দিতেও বলিল না। ভগ্ন-হৃদয় আরও ভাঙ্গিল। তাঁহারা বহুকষ্টে বুক ধরিয়া উঠিয়া নিস্ক্রান্ত হইলেন।

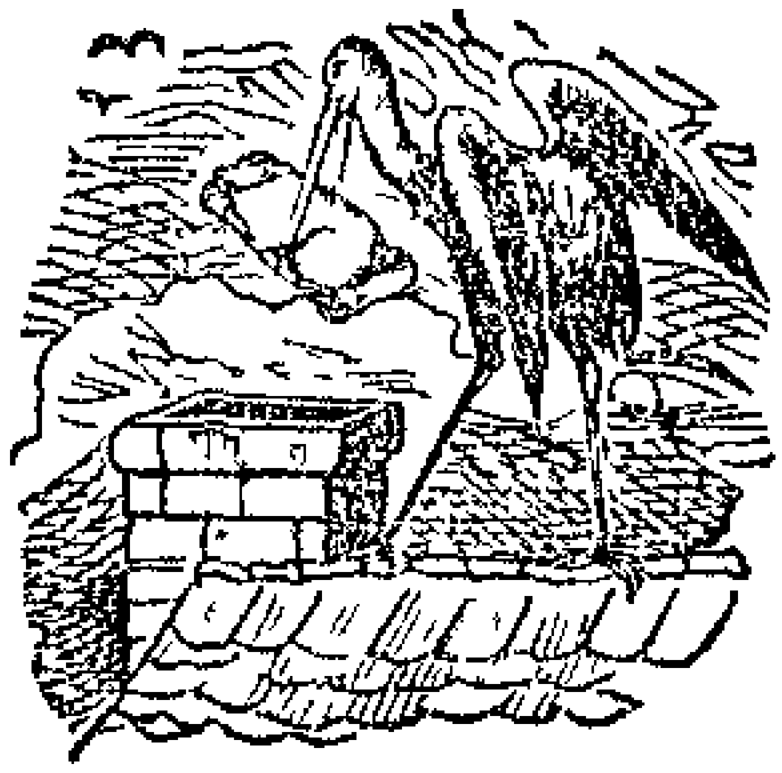

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুই ছিলিম তামাক পোড়াইয়া কালাচাঁদ বাহির হইলেন। কর্ত্তা স্নানার্থ অন্দরে গেলেন। ভৃত্যগণ বাহিরের বারান্দায় কালাচাঁদকে তেল মাখাইতে বসিল।

খান্‌সামা কর্ত্তৃক তৈল-মর্দ্দিত হওয়া,—কালাচাঁদের পক্ষে নিতান্ত নূতন জিনিস। তাঁহার ইহ-জীবনে এরূপ ঘটনা কখন ঘটে নাই। এই অভিনব ব্যাপারে আজ কালাচাঁদ কিঞ্চিৎ বিব্রত।

যখন ভৃত্য বলিল, "হুজুর! আপনাকে তেল মাখাইব,"—তখন কালাচাঁদ ভাবিলেন, "ডুবেচি, কি ডুব্‌তে আছি, দেখে আসি পাতাল কত দূর। তেল-মাখানো কি রকম লাগে, একবার দেখা যা'ক না কেন?"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা, মাখাও।"

ভৃত্য, প্রথমেই কালাচাঁদের পা লইয়া পড়িল। সে'ত পা নয়, ঠিক যেন, শ্রীচরণ,—যেন দুঃখীর

দ্বারের সজীব 'আগড়,'—উনিশ-ইঞ্চ থান্-ইট কোথায় লাগে? যদি শ্রীচরণ-আশীর্ব্বাদে কোনও জনের কখন 'সমস্ত-মঙ্গল-হয়-বিশেষ' হইয়া থাকে, তবে সে এইরূপ শ্রীচরণ দ্বারা। বলিরাজ, বামনরূপী শ্রীহরির ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা দিতে বরং সক্ষম, কিন্তু কালাচাঁদের এই একপাদেই আক্কেল-গুড়ুম্। এ পদ-প্রতিষ্ঠা করিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে, গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্ম-মহিমা কতক যে কমিবে, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি?

ভৃত্য, দক্ষিণ-শ্রীচরণ-খানি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল,—পায়ের তলায় 'ইন্দুর-জালি';—গোড়ালীটী ফাটা-ফাটা। ইতিপূর্ব্বে কারাবাসে কালাচাঁদ তিন বৎসরকাল জুতা পায়ে দেন নাই; মুক্তিলাভের পর, জুতা তাঁহার তাদৃশ মনোযোগাকর্ষণ করে নাই; ছিন্ন চটীতেই চিত্ত বিমোহিত ছিল। বিশেষ, খালি-পায়ে বিচরণই আজ কাল তাঁহার অধিকতর প্রিয়। কাজেই পদতল নানা দোষে দুষ্ট। পায়ের কাণ্ড দেখিয়া ভৃত্যের অধর-প্রান্তে

কালাচাঁদের তৈলমর্দ্দন ।

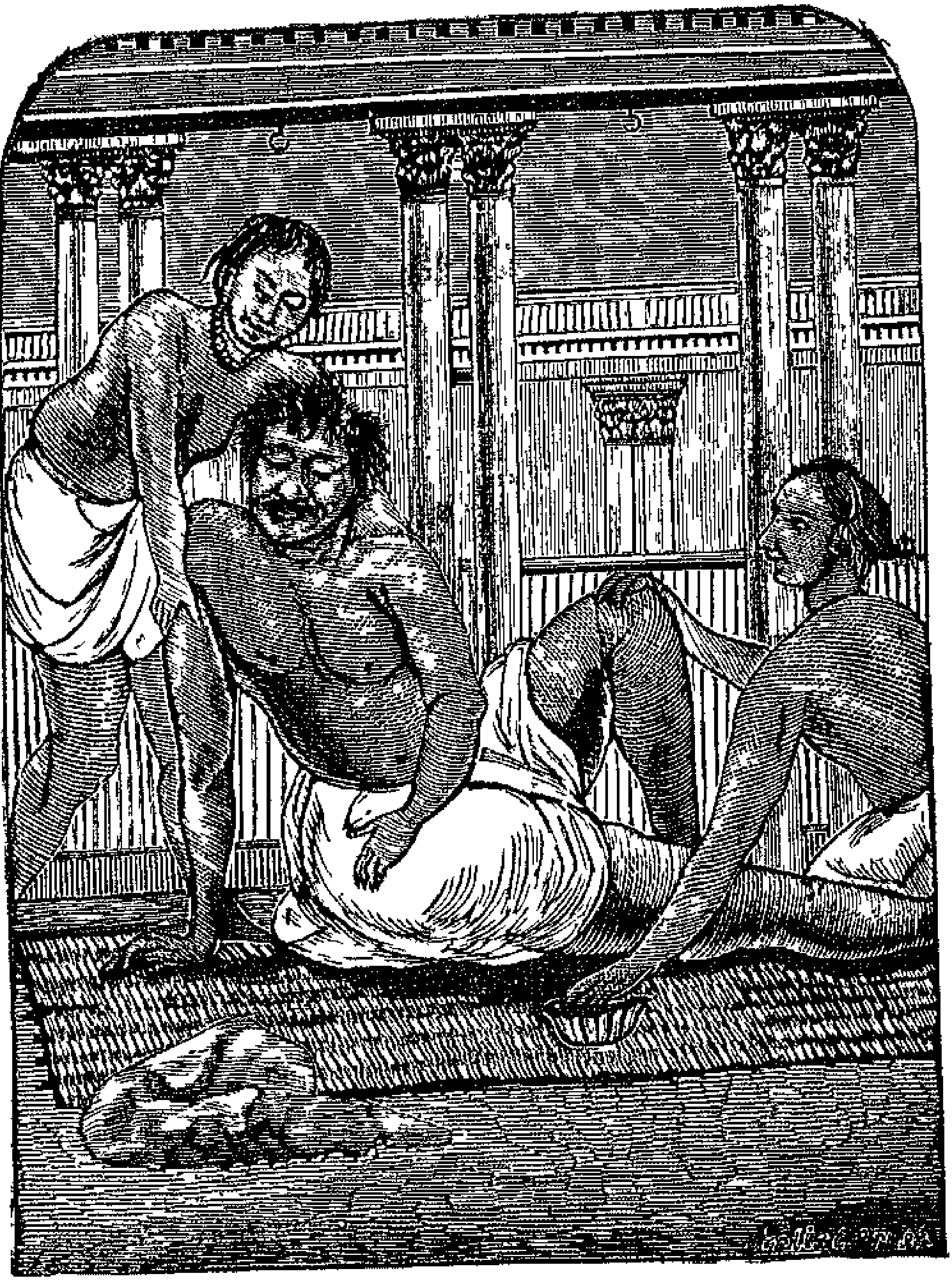

হাসি আসিল। চিত্ত সংযত করিয়া ভৃত্য নিজের গামছা-দ্বারা পা-খানিকে ভাল করিয়া মুছিল। নখ বড় বড় দেখিয়া নরুন আনিয়া নখ কাটিয়া দিল। কালাচাঁদের সাড়া-শব্দ নাই, চক্ষু বুজিয়া আড় হইয়া বসিয়া আছেন। এ-সময় কালাচাঁদের কাণ মলিয়া দিলেও, তিনি এখন কথা কহেন না; কারণ তিনি ভাবেন,—ইহা বুঝি তেল-মাখানোর একটা অঙ্গ।

দুইজন ভৃত্য, কালাচাঁদের দুখানি পা কোলে রাখিয়া, পায়ের চাটুতে ফুলাল-তেল মাখাইতে আরম্ভ করিল। কালাচাঁদের পায়ে বিষম সুড়্সুড়ি বাজিতে লাগিল। যন্ত্রণায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। তবু কালাচাঁদ কথাটী কহিলেন না। মুখ ফোটে ফোটে ফুটিল না। একবার ভাবিলেন, পা-দুটা কাড়িয়া লই। আবার ভাবিলেন, তা হ'বে না; তাহ'লে চাকর দুটা আমাকে নিতান্ত চাসা ভাব্‌বে। তা, ভাব্‌লেইবা,—তা'তে ক্ষতি কি?—না, পা-তুলিয়া লওয়া হবে না,—মজাই দেখা যাক্ না কেন?—উঃ,

আর যে থাকিতে পারি না!—উহুহুহুঃ,—উঃ, গেলাম! —এই বলিয়া কালাচাঁদ, অনিচ্ছাসত্ত্বে, হঠাৎ, ইতি-কর্ত্তব্যতা-বিবেচনার পূর্ব্বেই, সজোরে পা কাড়িয়া লইতে বাধ্য হইলেন। সেই পদাকর্ষণরূপ বিষম সংঘর্ষণে চাকর-দুটা চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহারা আর হাসি রাখিতে পারিল না; হো হো হাসিয়া উঠিল। কালাচাঁদেরও অধরোষ্ঠ-রূপ হাসির বাঁধ ভাঙ্গিয়া মুখ-বিবর খালি হইয়া গেল। তখন এই লোক-ত্রয়ের হাসি একত্র হইয়া লোকত্রয়ই যেন পূর্ণ করিয়া ফেলিল। হাসির তুমুল কোলাহল শুনিয়া, বধূকুল অট্টালিকার গবাক্ষের দিকে দৌড়িয়া আসিয়া, এ বিরাট ব্যাপার আয়তলোচনে অবলোকন করিতে লাগিল। স্ত্রীগণ হাসির প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই বুঝিল না,—কেবল কালাচাঁদের হৃষ্টপুষ্ট-কৃষ্ণাকৃতি দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিল, "ওমা, এ মিন্‌সে কে গো! কা'দের গো! দেখো, দেখো, চেহারা দেখো।" একজন নবীনা মুচ্‌কি-হাসি হাসিয়া মিহি-সুরে তাহার বয়োজ্যেষ্ঠাকে উত্তর দিল,—"অ

দিদি! তুমি আর ভেব না; উনি যে তোমার ঠাকুরপো! পুন্নিমের রাত্রে আকাশে গোল-পানা "মা" উঠে, তা'তে তুয়াতের "তা" মাখালে যা হয়,—তাই ওঁর নাম।

বয়োজ্যেষ্ঠা। ঠাকুরপো কেন হতে গেল্ল না? উনি যে আমার ভাসুর!

নবীনা। দিদি! তা নয়,—তা নয়,—উনিই তোমার ঠাকুরপো,—আজ ওঁর সাক্ষাতে বেরিয়ে তোমাকে পরিবেশন কত্তে হবে।

বয়োজ্যেষ্ঠা। (হাসিয়া) ওরে বাবা!. তা পারবো না,—ঠাকুরপো-ই হউন, আর ভাসুরই হউন, উনি আমার মাথায় থাকুন! কিন্তু সাত-রাজার ধন একটী মাণিক হাতে দিয়ে, কেউ যদি বলে, ওঁর সুমুখে এক থালা ভাত ধরে দিতে হবে,—তাতে আমি রাজী হই না,—

মহিলাগণ এইরূপ বলিয়া বলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, পরস্পারের গায়ে ঢলিয়া ঢলিয়া, পড়িয়া পড়িয়া, চলিয়া গেল।

এদিকে আবার তৈল-মর্দ্দন পর্ব্ব আরম্ভ হইল। ভৃত্যদ্বয়, কালাচাঁদের পদদ্বয়ে আর করপদ্ম অর্পণ করিতে সাহস করিল না;—পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিল। তখন তালে তালে তৈল-মর্দ্দনের মহাধ্বনি উত্থিত হইল। দুপ্-দাপ্, ধুপ্-ধাপ্, টুপ্-টাপ্;—থপাস্-থপাস্, ধপাস্-ধপাস্, ঝপাস্-ঝপাস্;—চড়্-চড়্-চড়্, ছড়্-ছড়্-ছড়্, ঝড়্-ঝড়্-ঝড়্;—গুডু-গুডু-গুডু-গুডু গুম্; ডুডু-ডুডু-ডুডু-ডুডু দুম্; ধুটু-ধুটু-ধুটু-ধুটু ধুম্;—এইরূপে ঘোররবে তৈলমর্দ্দন-কার্য্য চলিতে লাগিল। তৈলমর্দ্দন-প্রপীড়িত কালাচাঁদ দুর্দ্দিনে ভাবিতে লাগিলেন,—"এ আবার একটা নূতন বিপদ উপস্থিত হলো, দেখ্‌চি! এ চড়, চাপড়, কীল, ঘুষি কতক্ষণ খাইব?—এই যে, মধ্যে মধ্যে রঘু-টিপুনিও আছে। সুড়সুড়িটে যে নিতান্ত নাই, তাও নহে। পাপ দুটা যে ছাড়্‌লে বাঁচি!"

কালাচাঁদ আরও চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এরূপ অবৈধভাবে প্রহারিত, জর্জরিত দেহ হইবার জন্য বড়লোকে মাহিনা দিয়া চাকর রাখে কেন?

ঘরের টাকা দিয়ে মার খাওয়া!! এ নিয়ম ভাল, ভাল!! লোকের এতে বেশ সুখশান্তি হয়! আচ্ছা,—এ কাজে সুখটা কি? এতদিন তেল মাখাইবার লোক ছিল না বলিয়া, তন্নিবন্ধন কখন'ত আমার অসুখ হয় নাই। সুখের মাত্রা'ত কখন কমে নাই! বলিতে পার—আমি অসভ্য, মূর্খ,—সুখের মাত্রা কমিল, কি বাড়িল, কি সমান রহিল,—তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব? যখন আমি কস্মিন্‌কালে তেলমাখানোর আস্বাদন পাই নাই, তখন ইহাতে সুখ বৃদ্ধি পায় কি না, তাহা কেমন করিয়া জানিব? জানি না বটে, কিন্তু সুখের আরম্ভে যাহা দেখিলাম, তাহা'ত বড় আশা-জনক নহে। কি বড়লোক, কি ছোটলোক—সকলকেই এইরূপ আরম্ভে উত্তীর্ণ হইয়া, অন্তিমে বর্দ্ধিত-হারে সুখ পাইতে হইবে ত!—দণ্ডবৎ!—এমন সুখবৃদ্ধিতে আমার কাজ নাই! এখানে আরম্ভেই যে মৃত্যু!—শেষ দেখিবে কে?"

কালাচাঁদের হৃদয়পটে, সুখদুঃখের নানা কথা,

এইরূপ গোলমাল-ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল। অন্য সময় হইলে, তিনি চাকর-দুটাকে গলা টিপিয়া সরাইয়া, স্বয়ং গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িতেন; কিন্তু অদ্যকার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র,—তাই আদব্-কায়দার উপর কতক্‌টা দৃষ্টি। তিনি ধীর-ভাবে ভৃত্যদ্বয়কে বলিলেন,—"থাক্, আর তেল মাখাইতে হইবে না,—"

ভৃত্য। হুজুর! এখনো মাথাটা বাকি আছে।

কালাচাঁদ। (ঈষৎ হাসিয়া স্বগত) বাকি, মাথাটাই বটে;—কিন্তু তোমাদের হাতে আর কাঁচা মাথাটা দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। (প্রকাশ্যে) মাথায় তেল আমি নিজেই দিচ্চি,—তোমরা এখন ছাড়ো,—আমি শীঘ্র গঙ্গাস্নান করিয়া আসি—"

ভৃত্য। সে কি হুজুর! আপনার স্নানের জন্য দুই ভার গঙ্গাজল ঐ এনেচি,—এই খানেই স্নান করুন,—গঙ্গায় যেতে গেলেন কেন?—ততদূর যেতে যে রোদে আপনার কষ্ট হবে!!

কালাচাঁদের মুখে হাসির রেখা ঈষৎ অঙ্কিত

হইল। এ হাসির বোধ হয় অর্থ এইরূপ;—আমি কালাচাঁদ,—ঘণ্টায় চারি ক্রোশ পথ চলিতে পারি;—পাঁচদিনে শ্রীক্ষেত্র যাইতে সক্ষম,—আমাকে বলে কি না, "আপনার গঙ্গা নাইতে যেতে রোদে কষ্ট হবে।"—ঠাকুরদাদার বাসা হইতে গঙ্গা এক পোয়া পথের অধিক নহে। কালাচাঁদ, ভৃত্যকে ধীরস্বরে বলিলেন,—"আচ্ছা, তবে এই খানেই স্নান কর্‌চি,—মোদ্দা, তোমরা কেউ আমার কাছে এসো না।"

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘষামাজা নাই,—কালাচাঁদ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, ক্রমশ চারি কল্‌সী জল মাথায় ঢালিলেন। ভৃত্যগণ গামছা-তোয়ালে লইয়া তাঁহার গা মুছাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। কালাচাঁদ বলিলেন,—"মুছাইয়া দিতে হইবে না। কেবল গাম্‌ছাখানা আমাকে দাও।"

অঙ্গ পরিষ্কার হইলে, ভৃত্য, কালাচাঁদের সম্মুখে এক চমৎকার পট্টবস্ত্র ধরিল। তিনি হাসিয়া তাহাই পরিলেন। পরিয়া, একবার আপন

চেহারা আপনি দেখিয়া লইলেন। দেখিয়া, যেন মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন,—এইবার উত্তম-মধ্যম আহারটা হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এমন সময় ঠাকুরদাদা স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া, খড়মের ঠক্‌ঠক্‌ ধ্বনিতে চারিদিক যেন বিরক্তিভাবে পূর্ণ করিয়া, অন্দর হইতে সদরে আসিলেন। তাঁহার নাকে তিলক; সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ্‌; স্কন্ধে রেশমের নামাবলী। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "ভায়ার স্নান হয়েচে,—তা' বেশ!" চাকরগণের উদ্দেশে বলিলেন,—"হাতীর দাঁতের বগুলা-দেওয়া সেই আবলুস্‌-কাঠের বড় খড়ম-জোড়াটা নিয়ে আয়;—আর, তোরা একজন ভাল ক'রে কালাচাঁদের পা-ধুইয়ে-পুঁছিয়ে দে—"

কর্ত্তার কথায় কালাচাঁদ কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না; নচেৎ ভৃত্য স্ব-ইচ্ছায় পা ধুয়াইতে আসিলে তিনি এতক্ষণ তাহাকে ধমকাইয়াই দূর করিতেন। কিন্তু খড়ম নিকটে আসিলে কালাচাঁদ পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন। বিষম বিব্রত এবং কাতর

হইলেন।—এ কাষ্ঠ-যন্ত্রে পদন্যস্ত করিলেইত পড়িয়া যাইব। কখনো অভ্যাস নাই, কেবল পায়ের তুইটী অঙ্গুলের সাহায্যে কাঠের উপর ভর দিয়া চলিলেই ত চিৎপাত হইব! কিন্তু কর্ত্তার আজ্ঞা অবহেলা করিইবা কেমন করিয়া? পড়িলে মরিব না বটে,—মরিলে ক্ষতিও নাই বটে,—কিন্তু এ দেহ হঠাৎ ধরাশায়ী হইলে, পাড়ার লোক ভাবিবে, বড়কর্ত্তার বাড়ী হঠাৎ ভূমিকম্প হইল কেন? নিশ্চয়ই দিক্‌দিগন্ত হইতে—বহুলোক দৌড়িয়া এ ব্যাপার দেখিতে আসিবে। তখন কেহ বলিবে, আহা! মুখে চখে জল দেও, পাখার ব্যজন করো। কেহ বলিবে, চুণে-হলুদ বাটো! কেহ বলিবে, ডাক্তার ডাকিয়া আনো। কেহ গায় হাত বুলাইয়া বলিবে,—যাতুমাণিক! কোথায় লেগেচে বলত? পড়ায় আমার যত না কষ্ট, এইরূপ সেবা-শুশ্রূষায় তদপেক্ষা সহস্র-গুণ অধিক কষ্ট হইবে। ইহাকেই বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা!—আমি আপনি পড়িব, আপনিই উঠিব,—যদি অন্য কেহ

তখন আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া নিকটে না আসেন, আহা-আহা না করেন, তাহা হইলে আমি খড়ম পায়ে দিতে রাজী আছি। কিন্তু সে করার্ করে কে? সে একরার্‌নামা দেয় কে?—আমি এইবার বুঝি মজিলাম!

দেখিতে দেখিতে পদধৌত-ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। ভৃত্য খড়মটী পায়ের নিকট ধরিল। সঙ্কটকাল আসিল! বিলম্ব নাই!—এখনি মহাগ্নিতে ঝাঁপ দিতে হইবে। ত্রাহি মধুসূদন! কালাচাঁদ দেব-দেবী মানেন না; কিন্তু এইবার তাঁহাকে আকাশপানে তাকাইতে হইল! ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া মনে মনে কাহার্ শরণ লইলেন, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

কালাচাঁদ অগত্যা ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পদ খড়মে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু পা খড়মে কুলাইল না; গোড়ালীটা বাহির হইয়া রহিল। কষ্ট আরও বাড়িল। কিন্তু উপায় নাই। তিনি উভয়পদে খড়মযন্ত্র আঁটিয়া, উঁচু-নীচু, সচল-পিছল পথ দেখিয়া, আড়ষ্ট হইয়া, উরুদেশে ব্যাধিবিশিষ্ট রোগীর

ন্যায়, ধীর মন্থরগতিতে যেন খুঁড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

এ দারুণ দৈব-বিপত্তি-কালে বোধ হয় কালাচাঁদ ভাবিয়াছিলেন,—“ঠাকুরদাদার কাছে আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে কাজ নাই, খড়ম ফেলিয়া এখনি সটান দৌড়িয়া পলাই।”

এরূপ ভাবুন, আর নাই ভাবুন,—কালাচাঁদ কিন্তু পলাইলেন না। এই-পড়িলাম, এই-পড়িলাম, এই-মজিলাম, এই-মজিলাম-ভাবে তিনি তদবস্থায় চলিয়া আসিয়া, বহুকষ্টে বৈঠকখানার খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণেক বিশ্রাম লইলেন। সিঁড়ি দিয়া বৈঠকখানায় না উঠিয়া, সেই খুঁটি ধরিয়া উঠিলেন। কারণ সিঁড়ি দূরে, এবং তাহার ধাপ্‌গুলা পিছল।

যে ঘরে তিনি তামাক খাইয়াছিলেন, তদবস্থায় তিনি সেই ঘরেই উপনীত হইলেন। খড়ম খুলিয়া সম্মুখে যাহা দেখিলেন, তাহা মনোমত বটে। পশমের এক বিচিত্র আসন,—সম্মুখে বেল, তরমুজ

এবং মিছরি—এই তিন রকমের সরবৎ; তদুপরি ডাব; রৌপ্যথালে কিছু বেদানা ছাড়ানো; কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ ধোয়া; অল্প মুগের ডাল ভিজানো এবং তদুপযুক্ত চিনি। স্বর্ণথালে দুইটী কাঁচাগোল্লা। জলযোগের বন্দোবস্ত দেখিয়া কালাচাঁদের মন নরম হইল। খড়ম-পায়ে দিবার সন্তাপ কতক দূরে গেল। সন্তুষ্টমনে কালাচাঁদ আসনে উপবেশন করিলেন। কেবল এক খুঁত রহিল। কাঁচাগোল্লার সংখ্যা যদি দুইটী না হইয়া, দ্বাদশটী বা দ্বাত্রিংশৎটী হইত, তবে সোণায় সোহাগা পড়িত। কালাচাঁদও একটু সংশয়াপন্ন হইলেন,—"জলখাবারের এত মহামহোৎসবে উদর-পূর্ণের আসল সামগ্রী সন্দেস্ এত কম কেন? চাকর বেটা ত চুরি করিয়া খায় নাই?"

সম্যক্ অনুশীলন না থাকিলেও, কালাচাঁদের দেহে ক্ষুধা-বৃত্তির স্ফুরণ, কিছু অধিক 'পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছিল। বিষম ভাবনা-নিবন্ধন পতিত-পাবনের বাসায় তাঁহার দুই একমাস অন্নে অরুচি

হইয়াছিল বটে, কিন্তু অরুচির অবস্থায় তিনি যে পরিমাণ অন্ন উদরস্থ করিতেন, অন্যলোকে সুরুচির কালে তাহার অর্দ্ধেকগুলি খাইতে সক্ষম কিনা সন্দেহ। মহামায়া চামুণ্ডা, ক্ষুধারূপে কালাচাঁদের অন্তরে বোধ হয় চব্বিশ-ঘণ্টাই অবস্থিতি করেন। নহিলে দিনে-রেতে অষ্টপ্রহরই তাঁহার সমভাবে ক্ষুধা থাকিবে কেন? এই দ্বিপ্রহরে আকণ্ঠপূর্ণ-অন্নাহার করিয়া উঠিলেন; এমন সময় কেহ যদি কালাচাঁদকে বলেন, "আপনি এখন তুসের রসগোল্লা খেতে পারেন কি?" তিনি হাসিয়া বলেন, "খাইতে পারিলে, কি দাও?" উত্তর,—"আচ্ছা, কাল প্রাতে আর তুসের অধিক রসগোল্লা দিব।" তখন কালাচাঁদ বলিলেন, "তবে, রসগোল্লা আনো।" আনিবামাত্র অমনি টপাটপ্ গালে পূরিয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে, যেন যাদুমন্ত্রবলে সমস্ত উড়াইয়া দিলেন।

কালাচাঁদের মধ্যাহ্নে সহজ আহার—৮২॥৵০ ওজনের খর-খর পাঁচপোয়া চাউলের অন্ন। যেদিন

আহারের উপকরণ অধিক থাকে, সেদিন তুসেরে ঘা দেন। আম তুই চারিটা বা কাঁঠাল তু-চার কোয়া—তিনি কখন খান না। তিনি বলেন,—"কাঁঠাল খাইতে হয়, তু-আড়াইটা; বড় কাঁঠাল একলা গোটা খাবো। যদি আম খাইতে হয়, তবে আসনের সম্মুখ-ভাগটা আঁটি এবং খোলায় মানুষ-সমান উঁচু হইয়া উঠিবে। ও-সব সামগ্রী অমন অল্পস্বল্প খেয়ে আমি মুখ নষ্ট করিতে চাহি না।"—এইরূপ তাঁহার বুলি ছিল। তিনি সিদ্ধ-পিঠা খান, কাহন-হিসাবে। কলা খান, কান্দি-কান্দি। পায়স খান, ডাবা-ডাবা।

কাজেই কালাচাঁদ তুইটীমাত্র সন্দেস দেখিয়া একটু খুঁৎ খুঁৎ-ভাবাপন্ন হন।

যাহা হউক, শুভকার্য্যে আর অধিক বিলম্ব হইল না। অত্যল্প সময়ের মধ্যে সমস্তই উদর-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইল; মুগের ডালের একটী কণাও পাত্রে পড়িয়া রহিল না।

বেলা দশটা বাজিল। কালাচাঁদ সেই ঘরে

চৌকির উপর বসিলেন; খড়ম পায়ে দিবার দায়ে বাহিরে আসিতে সাহসী হইলেন না। ইত্যবসরে কর্ত্তা কয়েকজন মুহুরি-পরিবেষ্টিত হইয়া আদালতের কাগজপত্র, অভিনিবিষ্ট-চিত্তে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শীঘ্রহস্তে দস্তখত করিতেছেন,—লেখায় যেন ঝড় চলিয়া যাইতেছে।

১১টা বাজিল। অল্পক্ষণ পরে বাটীর ঝী ইঙ্গিতে, সরু-স্বরে সংবাদ দিল,—স্থান হইয়াছে। অল্পক্ষণ পরে কর্ত্তা কাগজপত্রের কাজ সারিয়া উঠিলেন। কালাচাঁদের কক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া, স্নেহের ভাব দেখাইয়া কর্ত্তা বলিলেন,—"এস ভায়া! ভাত খাওসে—"

কালাচাঁদের ধারণা ছিল, যখন জলখাবার বাহিরে দিয়াছে, তখন ভাতও বাহিরে দেওয়া সম্ভব।

এই ভাবিয়া এতক্ষণ কিছু নিশ্চিন্ত মনে তিনি নানাকথা চিন্তা করিতেছিলেন। যদি ঠিক বুঝিতেন যে, তাঁহাকে অন্দরেই অন্নাহার করিতে হইবে, তাহা হইলে খড়ম-পদে গমনরূপ চিন্তাই

তাঁহার হৃদয়ে একাধিপত্য লাভ করিত,—এতক্ষণ হয় ত অধীর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেন। সে কি কম লজ্জার কথা! বাহিরে পুরুষগণের নিকট পড়িলে বরং পদে আছি, অন্দরে মেয়েদল-মাঝে চিৎপাত হইলেই একেবারেই গেছি!! পতনে পুরুষের হাসি বরং সহ্য হয়, কিন্তু মেয়ে-মুখের সেই অর্দ্ধস্ফুট, অর্দ্ধলুক্কায়িত, অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনাবৃত,—সেই ফিক্-ফিক্ অনন্ত হাসি কখন সহ্য হইবার নহে। সেই বিষম ব্রহ্মাস্ত্রে একেবারেই বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

তাই ঠাকুরদাদার "ভায়া, বাড়ীতে এস"—ডাক শুনিয়া কালাচাঁদের চক্ষুস্থির হইল। সর্ষপ-পুষ্পদ্রষ্টা, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, 'নযযৌ-নতস্থৌ'—কালাচাঁদের কণ্ঠ হইতে কিছুক্ষণের নিমিত্ত কথা নিঃসরণ হইল না। হায়! বিধি আমার ললাট-লিপিতে কি এই লিখিয়া-ছিলেন যে, অদ্য আমি মহিলাকুল-মাঝে ভূপতিত, ভূলুণ্ঠিত হইয়া, ভবধামে ভূতাধম প্রতীয়মান হইব? আমার দেহ এখনি ভস্মীভূত হউক না কেন?

তেজস্বী কালাচাঁদের অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইল। জিহ্বা শুকাইল!—চক্ষুও স্থির হইল।

প্রথম-ধাক্কা সামলাইয়া, কালাচাঁদ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলেন, "কপালে যা থাকে, হবে,—ঠাকুরদাদা যা বলেন, বলিবেন,—আমি যোদ্ধা খালি পায়েই খাইতে যাইব,—কিছুতেই খড়ম পায়ে দিব না;—"এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, কালাচাঁদ শূন্যপদে গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

ঠাকুরদাদা। ভায়া, তোমার খড়ম কি হলো,—কৈ পায়ে দাও নাই?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, আজ্ঞে—খড়মটা একটু পায়ে ছোট হয়, তাই পায়ে দি-নাই,—

পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন ভৃত্য আসিতেছিল। ঠাকুরদাদা তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"অরে ভূতো! আজই একজন খড়মওয়ালা ডেকে নিয়ে এসে কালাচাঁদের পায়ের মাপ দিয়ে এক-জোড়া খড়ম ফরমাস্ দে'ত—"

ভৃত্য আদেশ-পালন করিবে বলিয়া অঙ্গীকার

করিল। কালাচাঁদ দেখিলেন, ঘোর বিপদ উপস্থিত। পায়ে হয় নাই বলিয়া কাজ ভাল করি নাই। এবার ফরমাসী-খড়মের চিরস্থায়ী দশসালা বন্দোবস্ত হইল। তখন আর কোন ওজর-আপত্তি থাকিবে না। তখন অষ্টপ্রহরই ত্রিশূন্যে খড়মের উপর বেড়াইতে হইবে।

যাইতে যাইতে এই দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে একটা মহাহ্লাদের কথা কালাচাঁদের মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল। সেটা—আহার। আহার বিষয়ে তাঁহার অরুচি স্বভাবত কম ছিল। জলখাবারের নমুনা দেখিয়া তিনি মধ্যাহ্নের অন্নাহারটা কিরূপ উচ্চ-দরের হইবে, তাহা কতকটা আঁচিয়া লইয়াছিলেন। বিশেষ, গত কল্য হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার অন্নাহার হয় নাই।

কলিতে জীবের,—প্রধানত বাঙ্গালীর, অন্নগত প্রাণ। কেবল সন্দেস, মিঠাই, জিলিপি খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। খাসা-দই বা ক্ষীরোদ-সমুদ্রে ডুবিয়া থাক, তথাচ ভাতের জন্য

তোমার প্রাণ পড়িয়া থাকিবে। ভাতটা এমনি জিনিস। সে ভাত, প্রায় ৪৮ ঘণ্টা গত হইল, কালাচাঁদের উদরে যায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গত পরশ্ব দিন, পতিতপাবনের গৃহে তাঁহার একবেলা অর্দ্ধাশনের অপেক্ষাও কম আহার হইয়াছিল; গতকল্য ত দিবাভাগে আদৌ অন্নাহার হয় নাই, গভীর নিশীথে গঙ্গাগর্ভ হইতে, লাঠিদ্বারা বাঁধাঘাটের লণ্ঠন ভাঙ্গিয়া, লাফাইয়া গমনের পর, তিনি যে কোথাও ভাত পাইয়াছিলেন, এমন ত বোধ হয় না। তবে মিষ্টান্নে যদি কোথাও মুখশুদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা। যাহাই হউক, কালাচাঁদের এখন ক্ষুধা প্রবলা;—এক এক গ্রাসে এক এক পোওয়া অন্ন উঠাইবেন,—ইহাই যেন সঙ্কল্প!

সেই কমনীয় কৃষ্ণ-কান্তি কলেবর, সেই হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ-সহিষ্ণু দেহ, সেই মদমত্ত ভগদত্তবৎ কারাকক্ষের কালাচাঁদ-কুঞ্জর,—আশায়—অন্নের আশায়, উৎসাহিত হইয়া, উৎফুল্ল-চিত্তে, পিতামহের পশ্চাৎ

পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। সর্ব্ব ভাবনা ভুলিয়া গিয়া, তিনি যেন এখন দিব্য-চক্ষে দেখিতে লাগিলেন,—এক সুবৃহৎ অখণ্ড আণ্ডট-পাতে প্রফুল্ল-মল্লিকার ন্যায় সাদা ধব্‌ধবে পর্ব্বত-প্রমাণ অন্নের রাশি সজ্জীকৃত; এক বকুনা কড়ায়ের ডাল পাতের দক্ষিণ-পার্শ্বে টল্‌টল্‌ করিতেছে; একতাল আলু-ভাতে, মন্দিরের ন্যায় উচ্চ-ভাবে অবস্থিত; ঘুযো-চিঙড়ি-মাছ দিয়া এক মালসা কাঁচা আমড়ার টক, একটা গোটা ইলিশমাছ ভাজা, এক হাঁড়ি দই, আড়াই সের গোল্লা এবং এক তিজেল পায়স—যথানিয়মে পত্রের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহার যেন আরও মনে হইতে লাগিল,—এক তিজেল পায়স ফুরাইতে না-ফুরাইতে পরিবেষ্টা আর এক মালসা পায়স আনিয়া তাঁহাকে জেদ ধরিল,—আর একটু খাইতে হইবে। তিনিও উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সে মালসাটীও উদর-সই করিলেন। আবার উপরোধ, আবার উদর-গহ্বরে পায়স নিক্ষেপ। মহাক্ষুধায় প্রপীড়িত

কালাচাঁদ, জাগ্রত অবস্থায়, দুই চক্ষু চাহিয়া, দাঁড়াইয়া, পথ চলিয়া যাইতে যাইতে ঐরূপ সুখ-স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

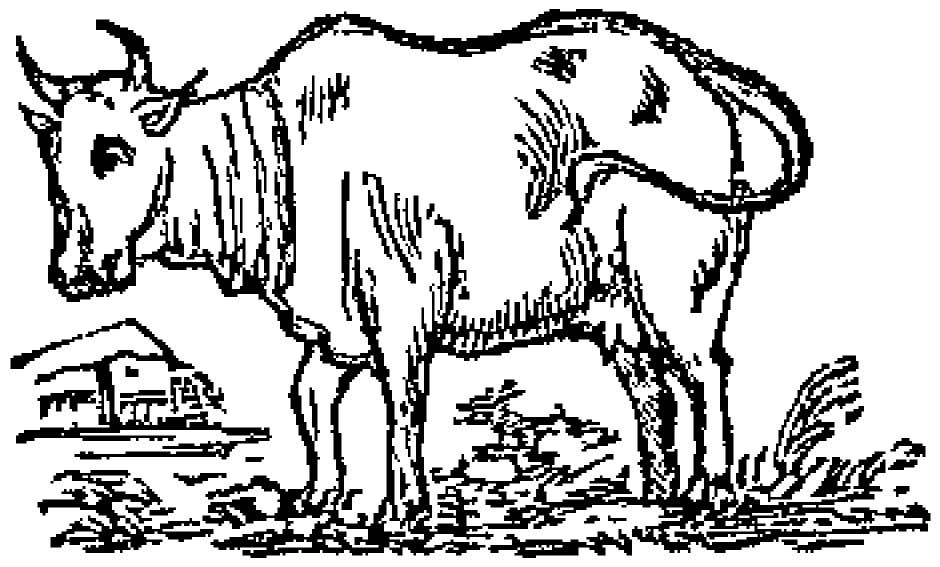

# কালাচাঁদ।

প্রথম অংশ।

তৃতীয়পর্ব্ব—ভুরি-ভোজন।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেস হইতে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# কালাচাঁদ।

## তৃতীয় পর্ব্ব—ভূরি-ভোজন।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

ব্যাপার বৃহৎ। বিষয় গুরুতর। উদ্দেশ্য মহান্। ঘটনা অঘটনীয়।

অদ্য মহাসমারোহে মহোৎসব। যেন মরুৎ-রাজার মহাযজ্ঞ। একশত আট-রকম ভোগের বন্দোবস্ত। ক্ষুধার্ত্ত কালাচাঁদের কামনা ষোলকলায় সম্পূর্ণ হইবে! বড়-লোকের বাড়ী দরিদ্র অন্নার্থীর এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

কর্ত্তা এখন বড়লোক;—পণ্ডিত, বিজ্ঞ, এবং বলবান্। তিনি যাহা করেন, তাহাই ভাল; যাহা

বলেন, তাহাই ভাল; যাহা লেখেন, তাহাই ভাল;—কেননা কর্ত্তা আজ অর্থবান্। কর্ত্তা পণ্ডিত, কেননা অর্থযুক্ত; কর্ত্তা বিজ্ঞ, কেননা অর্থযুক্ত; কর্ত্তা বলবান্, কেননা অর্থযুক্ত। যিনি পণ্ডিত, বিজ্ঞ, বলবান্—তিনিই বড়লোক।

অধুনা এ সংসারে মূলমন্ত্র—অর্থ। তপ, জপ, যাগ, যজ্ঞ—অর্থ। তাল-মান, যন্ত্র-তন্ত্র—অর্থ। ভাব-ভক্তি, প্রেম-প্রণয়—অর্থ। সুখ-শান্তি, সম্পদ-সৌভাগ্য—অর্থ। ঈশ্বর—অর্থ।

শ্রীকবিকঙ্কণ চণ্ডীগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

অহঙ্কার তাহার তাবৎ শোভা করে।
কৃপাময়ী লক্ষ্মী যাবৎ থাকে ঘরে॥
তুমি গো বল্লভা কৃপা নাহি কর যারে।
আছুক অন্যের কাজ দারা মন্দ বলে তারে॥
লক্ষ্মী থাকিলে মান সকল সংসারে।
লক্ষ্মী বাম হইলে ভাই কেহ না আদরে॥
সেইজন পণ্ডিত মাতা সেইজন ধীর।
যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির॥

মহাকবি ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ঠিক ঐ কথাই লিখিয়াছেন ;—

ঈষৎ কৃপায় যাঁর ভূপতি ভিক্ষুক।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি বাচাল হয় মূক॥
সদা সুখ সম্পদ সভায় সুসন্মান।
রথাদি গো গজ বাজী নর নৌকা যান॥
ভাগ্যবান্ ভারতভুবনে সেই ধন্য।
লক্ষ্মীর চরণে যার ভকতি অনন্য॥
সেই ধনী ধার্ম্মিক ধরণী মধ্যে ধীর।
যবে যার মন্দিরে কমলা হন স্থির॥
সমর-সুধীর বীর স্থির মতিমন্ত।
গণনীয় গায়ক গভীর গুণবন্ত॥
সে হয় সুকৃতী সৎ সজ্জন সংসারে।
কৃপাবতী শ্রীমতী লক্ষ্মীর কৃপা যারে॥
লক্ষ্মীর কৃপার পাত্র জেতে যদি হীন।
দরিদ্রে সজ্জন কত তাহার অধীন॥
সভায় সম্মান তার সর্ব্বলোকে করে।
বিফল জনম, যার লক্ষ্মী নাই ঘরে॥

কালিদাস লিখিয়াছেন ;—

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥

এ কথার অন্য একজন কবি উত্তর দিয়াছেন ;—

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোবিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনা হি তেন
দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।

অর্থই সংসারের সারভূত সামগ্রী। ম্লেচ্ছসমাজ, যবনসমাজ, বর্ব্বরসমাজ,—সর্ব্বসমাজেই অর্থ একমাত্র অদ্বিতীয় অধিপতি। কিন্তু হিন্দুর উপদেশ অন্যরূপ। অর্থ অকিঞ্চিৎকর! ক্ষুদ্র-অর্থ নিকৃষ্ট-বণিক্‌জাতিরই গ্রাহ্য, উৎকৃষ্ট-জ্ঞানীর গ্রাহ্য হইতে পারে না। হিন্দুসমাজ-শরীরের জ্ঞানই প্রাণ-স্বরূপ। তাই নগ্নপদ অর্থ-দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদধূলি,—মহারাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটে সসম্মানে স্থান প্রাপ্ত হয়। তাই মণি-কাঞ্চনে, মুক্তা-প্রবালে জ্ঞানী ব্রাহ্মণের স্পৃহা হয় না। তাই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মচারী বিলাস-বাস ছাড়িয়া,

কৌপীনে পরিতৃপ্ত, অগুরুচন্দন ছাড়িয়া চিতাভস্মে প্রফুল্লচিত্ত,—মহামূল্য সুকোমল শয্যা ছাড়িয়া শ্মশানভূমে বৃক্ষতলে সুনিদ্রায় অভিভূত।

কিন্তু কালবশে, যুগধর্ম্মে হিন্দুর সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান গিরি-গহ্বরে লুক্কায়িত, পাপ-অর্থ পূর্ণ-প্রতাপে প্রস্ফুটিত। অর্থ-শশধর শরদাকাশে ষোলকলা বিস্তার করিয়া সদা হাসিতেছেন, জ্ঞান-রাঘব পাতালে মহীরাবণের গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন! আগুন নিবিয়াছে, ছাই-ভস্মের আধিপত্য-কাল উপস্থিত হইয়াছে। সুধা নাই, ভগ্নভাণ্ড পড়িয়া আছে; মুক্তা নাই, শুক্তা সাদরে গৃহীত হইতেছে; সার-শস্য নাই, কেবল খোযাভুষির কারবার চলিতেছে!

চলুক। তথাচ,—এঘোর দুর্দ্দিনেও, হিন্দুসমাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠসমাজ,—আদর্শসমাজ। শ্রীকবিকঙ্কণ যাহাই বলুন, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী যাহাই লিখুন,—হিন্দুসমাজের এখনও যা-কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা অন্য

সমাজের অনুকরণীয়। হিন্দুসমাজরূপ মহা-অট্টালিকার বালিচূণ খসিয়াছে বটে, খিলান ফাটিয়াছে বটে, কার্ণিস চটিয়াছে বটে, ভিত দমিয়াছে বটে, কবাটে ঘুণ ধরিয়াছে বটে, কিন্তু বনিয়াদ পাকা,—অনন্ত-কালের সাক্ষী-স্বরূপ সমভাবেই অবস্থিত। কাল-নিশ্বাসে সে বনিয়াদের অন্তর-বাহির কালো হয় নাই,—বর্ষায় তাহা সিক্ত হয় নাই, শীতে শঙ্কুচিত হয় নাই, গ্রীষ্মে সম্প্রসারিতও হয় নাই,—অনন্ত-কাল অচল অটল,—সদা সমান সমুজ্জ্বল! বৌদ্ধদল-পতিগণের বীর্য্যবান্ বিষম মন্ত্রৌষধ-গুণে সে বনি-য়াদ উড়িয়া যায় নাই, মুসলমানের সাত-শত-বর্ষ-ব্যাপী তীক্ষ্ণধার তরবারি প্রহারেও তাহার ঈষৎ চূণ খসে নাই,—আর, ইংরেজ অবিরত অগণিত তোপ দাগিয়াও, সে মহাভিত্তিকে একচুল পরিমাণও টলাইতে সক্ষম হন নাই।

ভিত্তি এরূপ দৃঢ়, এত পাকা বলিয়াই, বড়কর্ত্তা আজও ব্রাহ্মণ দেখিলেই প্রণাম করেন, ব্রাহ্মণ-গোমস্তাকে 'সেবকশ্রী' পাঠ লেখেন, স্নানান্তে গায়ে

নামাবলী দেন, সন্ধ্যার পর মালা জপেন;—তাই আজও বড়কর্ত্তার গৃহে ভিখারী মুষ্টিভিক্ষা পায়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, বিষ্ণু-সেবা হয়;—তাই আজও বড়কর্ত্তার নাকে তিলক, গলায় মালা, বুকে ছাপ্। তাই বড়কর্ত্তা আজও আহারের পূর্ব্বে পদযুগল ধৌত করেন, চর্ম্মপাতুকার পরিবর্ত্তে খড়ম পায়ে দেন, ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি মুখে তুলেন। মহীরুহ শুকাইয়াছে,—কিন্তু মূল এখনও মরে নাই।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পৌত্র কালাচাঁদের জন্য, আজ একশত আট রকম ভোগের বন্দোবস্তই হউক, আর পাঁচটা খানসামাতেই কালাচাঁদকে ধরিয়া তেল মাখাইয়া দিউক, কর্ত্তা কিন্তু একপুরুষে বড়লোক। এগার বৎসর বয়সে হুগলীতে আসিয়া সদরামীণের বাসায় তিনি পেট-ভাতায় তামাক সাজিতেন; ছেলেপিলে কোলে করিতেন; এবং মেয়েদের ফরমাস খাটিতেন। ছেলেটীকে চালাক-চোস্ত দেখিয়া সদরামীণ-মহাশয় তাঁহাকে ভালবাসিতেন, মক্স করিতে বলিতেন, জমাখরচ রাখিতে শিখাইতেন। ক্রমে মনিবের অনুগ্রহ বাড়িল। আপন ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার কাপড় কিনিয়া দিতেন; পাতে একখানি মাছ পড়িয়া থাকিলে বলিতেন—'হরিকে দিও'; পূজা-পার্ব্বণে, দোলে-চড়কে বা রথে-রাসে হরিকে উৎসব দেখিবার পয়সা পুরস্কার করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই হরিতারণ হিসাবী,—একটী পয়সা মা-বাপ্। দুই-চারিটী যা পয়সা পাইতেন, তাহাই জমাইতেন;—জমাইয়া-জমাইয়া একটী টাকা পূর্ণ হইলে, তাহাই আবার অপরকে ধার দিতেন। নূতন কাপড় পাইলে, তিনি তাহা সহসা পরিতেন না,—পুতু-পুতু করিয়া তুলিয়া রাখিয়া, শেষে তাহা লুকাইয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিতেন। ক্রমশ বয়প্রাপ্তির সহিত হরিতারণ সদরামীণের বাসার হাটবাজার করিবার ভারও প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে বিলক্ষণ দু-পয়সা রোজগার চলিতে লাগিল। কিন্তু সদরামীণ তাঁহার বাজার-করা-কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ হরিতারণ ঘুরিয়া-ফিরিয়া, দেখিয়া-শুনিয়া, কষিয়া-মাজিয়া, এত সস্তাদরে জিনিসপত্র কিনিতেন যে, তাহাতে টাকা-প্রতি দু-গণ্ডা পয়সা রাখিলেও, সদরামীণের কোনও লোকসান বোধ হইত না। এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইল। হরিতারণের তখন বয়ক্রম চৌদ্দ বৎসর। এ পর্য্যন্ত তাঁহার মাহিনা ছিল না,—কেবল খোরাক-পোষাক। মাহিনা

না থাকুক,—সুদে আসলে তিন বৎসরে তাঁহার রোজগার তখন প্রায় ৫০০৲ টাকা হইয়াছে।

একদিন বালক-হরিতারণ অম্বুরী-তামাক সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে-দিতে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া সদরামীণের সম্মুখে উপস্থিত হইল;—তাঁহার হাতে হুঁকা দিয়া বিনীতভাবে হেঁট-মুখে ছল্‌ছল্‌ চোখে কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িল না। বাজারের সর্ব্ব-প্রধান দোকানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তামাক;—হরিতারণ-কর্ত্তৃক সযত্নে সাজা; তার উপর আবার হুঁকায় নূতন জল-ফেরা। দু-চারিবার টানিতেই সদরামীণের শরীর-গৃহ 'দেল্‌খোষ-বাগ' হইয়া উঠিল। তিনি, হরিতারণের মুখের দিকে ধূঁয়া ছাড়িয়া, খোষ-মেজাজে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হে হরি!—খবর্‌ কি? আজ তোমার মুখ এত শুক্‌নো কেন?"

হরি ইতিপূর্ব্বে তিন দিন স্নান করে নাই, তেল মাখে নাই, আধপেটা খাইয়াছে, এবং তিন দিনে অন্তত ছয়বার গোপনে শুধু শুধু ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া গা ঝাড়িয়াছে। প্রভুকর্ত্তৃক এইরূপ প্রশ্ন

জিজ্ঞাসিত হইয়া, হরিতারণ কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর দিল;—"বাড়ী থেকে পত্তর এসেচে, এবার জমীতে ধান হয় নাই। মা খেতে পাচ্ছেন না—তা কা'কে আর এ দুঃখ জানাই?—আপনিই মা-বাপ।"

সদরামীণ। তবে এখন তোমাদের চল্‌চে কিসে?

হরি। তা, এই ধার্-টার্ ক'রে মা চালিয়েছেন,—কিন্তু আর চলে না। কোন দিন আহার হয়, কোন দিন হয় না। তা, আপনি একটা কিনারা না ক'রে দিলে,—আমি আর দাঁড়াই কোথা?—মাসে যদি দুটী টাকা ঘরে পাঠাতে পারি, তবু মায়ের কতক দুঃখ ঘুচে।

সেইদিন হইতে সদরামীণ, হরিতারণের মাসিক ২৲ টাকা মাহিনা বরাদ্দ করিয়া দিলেন; এবং তিনি হরিতারণের ভবিষ্যৎ ভালোর জন্য স্বীয় সেরেস্তাদারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "হরি আমার বাসায় খাইবে, থাকিবে; আর তোমার বাসায় প্রত্যহ গিয়া লেখাপড়া শিখিবে; ছোকরাটী

থা;—গরীবের ছেলে,—ইহাকে একটু যত্ন করিয়া আদালতের কাজ-কর্ম্ম শিক্ষা দিও।”

সদরামীণ প্রভু; সেরেস্তাদার ভৃত্য;—প্রভুর আজ্ঞা ভৃত্য ‘অবশ্য পালন করিব’ বলিয়া স্বীকৃত হইল।

হরিতারণের বড়ই মজা হইল। সদরামীণের বাসায় খায়, থাকে, উপরি-রোজগার করে; এবং সেরেস্তাদারের বাসায় আদালতের কাজ-কর্ম্ম শিখে, পাঁচটা-পাঁচ-রকম দেখে-শুনে, এবং কিছু কিছু উপার্জ্জনও চলে। হরিতারণের হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার,—সেরেস্তাদার সে লেখা বড় পছন্দ করিতেন। ক্রমশ অনেক কাজ-কর্ম্ম তাহার দ্বারা তিনি করাইয়া লইতে লাগিলেন। শেষে তাহার মাসিক ৫৲ টাকা বেতন তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

এইরূপে হরিতারণের উনিশ বৎসর বয়স হইল।

সেরেস্তাদার বৃদ্ধ। দাঁত ফোক্‌লা। চুল-গুলি শণের নুড়ি। গাল দুটি চড়িয়ে-ভাঙ্গা। জাতিতে

সুবর্ণ-বণিক্। তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী সু-কিঞ্চিৎ প্রখরা। গলার আওয়াজ গুরুগম্ভীর,—সে চিহিঁহিঁ চীৎকার-শব্দে পথের পথিক চমকিয়া উঠে। রঙ্গিণী আবার সদাই রাগে ভরা,—সংসারের কিছুই যেন পছন্দ হয় না। বৃদ্ধ-সেরেস্তাদার তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াও, একটী দিনও তাঁহার মন পান নাই। বিশ ভরির ডায়মন-কাটা নিরেট বালা সযত্নে তৈয়ার করাইয়া সেরেস্তাদার প্রিয়ম্বদা প্রেয়সীর কর-কমলে স্থাপন করিলেন। প্রাণপ্রিয়া অমনি সে বালাকে হাতে করিয়াই বলিলেন,—“এ যে, হাল্কা বালা,—এ নিশ্চয় নিরেট নয়—আমার সঙ্গে তোমার প্রবঞ্চনা!—ভাল আমার পোড়া অদেষ্ট রে!—” বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ অমনি তিনি সেই বালা টান মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। এইরূপ ব্যাপার সদাই ঘটিত। সেরেস্তাদার পত্নীভয়ে সদা থরহরি কম্পমান—সদা ত্রাহি মধুসূদন।

প্রিয়ম্বদা-পত্নীর আর একটী সদ্‌গুণ ছিল। তিনি কিছু অধিক মাত্রায় বিবেকবতী হইয়া-

ছিলেন,—সুতরাং লৌকিক-লজ্জা-রূপ-পক্ষীটী তাঁহার দেহ-পিঞ্জর কাটিয়া উড়িয়া, নিভাও হইয়া পলাইয়াছিল। অতএব কটীর কসন, অঙ্গের বসন স্বভাবতই শিথিলভাব ধারণ করিয়াছিল। অনেক সময়, কি স্ত্রী, কি পুরুষ—সকলেরই নিকট তাঁহার সমভাব। উত্তমাঙ্গের অবগুণ্ঠন-মেঘ উন্মোচন-পূর্ব্বক পূর্ণ-মুখচন্দ্রখানিকে গবাক্ষরূপ আকাশে তিনি সদাই উদিত করিয়া রাখিতেন। তখন তাম্বূল-রাগে তাঁহার অধর রঞ্জিত হইত, হাসি-জ্যোৎস্নায় রাজপথ আলোকিত হইত, আঁখি-ঠারে পুরুষের পাগল-প্রাণ আকৃষ্ট হইত। তখন কেবল,—

অনিমিষে বিনোদিনী হেরিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ।
বিপরীত বিপরীত উপমা কি দিব।
ঊর্দ্ধে কুমুদিনী নিম্নে কুমুদ-বান্ধব॥

হরিতারণ কথঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি। উনিশ বৎসর বয়স হইলেও, তখন দেখিতে ১৪ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হইত না। এ-দিকে আবার হরিতারণ,

প্রিয়ম্বদা-পত্নীর বিবেক-ভাব।

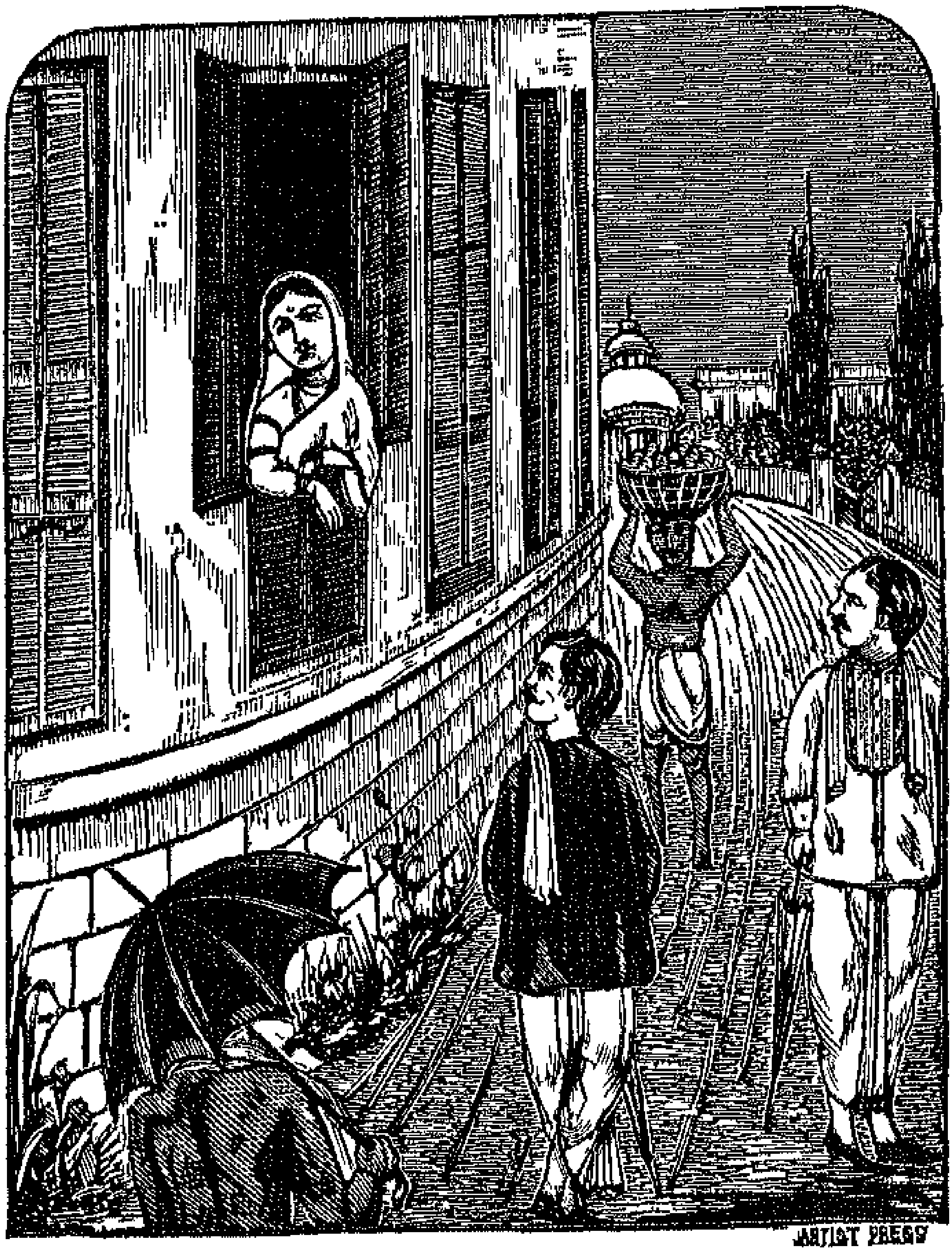

সদরামীণ মহাশয়ের বড় প্রিয়-পাত্র; সুতরাং সেরেস্তাদারের অতি-বড় প্রিয়-পাত্র। কাজেকাজেই সেরেস্তাদারের সদর-অন্দর, ভিতর-বাহির—সকল অংশেই হরিতারণের স্বাধীন-ভাবে গতিবিধি ছিল। কালক্রমে এই স্বাধীনতা ভাব হইতে প্রিয়ম্বদা-পত্নীর সহিত হরিতারণের সাম্যভাব সংস্থাপিত হইল। সাম্যের পর মৈত্রীভাব। তৎপরেই উদ্ধার। উপসংহারে মুক্তি। সুতরাং অচিরে বৃদ্ধ সেরেস্তা-দারের অপঘাত মৃত্যু ঘটিল। কেহ বলিল, সর্পদংশন তাঁহার মৃত্যুর কারণ;—কেহ বলিল, দুগ্ধের সহিত অজ্ঞাতসারে বিষ-পানই তাঁহার মৃত্যুর কারণ;—কেহ বলিল, গলায় রজ্জুবন্ধনই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। ফল কথা, যিনি যাহাই বলুন,—সেরেস্তা-দারের মৃত্যু নিশ্চয়ই হইল।

এই মৃত্যুতে হরিতারণ কতই কাঁদিল, কতই বিলাপ করিল, কতই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

সদরামীণ, হরিতারণকে বলিলেন,—"দেখ, হরি!—আমার ইচ্ছা, তুমি সেরেস্তাদারী চাকরীটা

লও,—একটা দরখাস্ত কর। তুমি যদিও এখন ছেলে-মানুষ,—আপাততঃ একজন ভাল-লোক তোমার কাছে আমি রেখে দিব—”

হরিতারণ ক্রন্দনের স্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিল,—“হুজুর মা-বাপ,—যা কত্তে বল্‌বেন, তাই কত্তে হবে! কিন্তু আমি অন্ততঃ তিনমাস কাল সেরেস্তাদারের চাক্‌রিটি নিতে পার্‌বো না—আজও তিন দিন অতীত হয় নাই,—তাঁর কথা মনে পড়্‌লে আমার দুই চক্ষু জলে ভেসে যায়,—তাঁর আসনে ব’সে আমি কেমন ক’রে চাক্‌রী কর্‌বো—আহা! তেমন লোকটী আর দেখ্‌তে পাবো না;—তিনি অতি মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন—”

সদরামীণ, বালকের কথা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—ছেলেটীরত বড়ই চমৎকার স্বভাব! প্রকাশ্যে বলিলেন, “দেখ, হরি!—তুমি যা বল্‌চো, তা সত্য বটে,—কিন্তু এ সরকারী চাক্‌রী ত খালি থাকিবার নহে;—তুমি এখনি ইহা গ্রহণ কর।”

হরিতারণ। আপনি যা বলচেন, তাই কর্‌বো—কিন্তু এক আমার আবেদন আছে। আমি যতদিন এ চাকরী করিব, ততদিন মাহিনার অর্দ্ধেক আমি সেই সেরেস্তাদারের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণার্থ প্রদান করিব।

সদরামীণ মনে মনে বলিলেন, "সাধু সাধু!"

হরিতারণ সেরেস্তাদার হইলেন; স্বতন্ত্র বাসা করিলেন; মাহিনার অর্দ্ধেক (সদরামীণকে দেখাইয়া) প্রতি মাসে প্রিয়ম্বদা-পত্নীকে দিতে লাগিলেন; এবং নাথ-হীন গৃহস্থের বাটীতে প্রত্যহ একবার দিবসে প্রকাশ্য তত্ত্বাবধারণের জন্য,—স-নাথ-করণের জন্য যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। চারিমাস পরে হঠাৎ একদিন শুনা গেল, প্রিয়ম্বদা-পত্নীর গৃহে হাপ্‌-ডাকাতিগোছ হইয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে।

হরিতারণ পরদিন প্রাতে আহা! আহা!—হায়! হায়!—মরি। মরি!—করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় নাই,—চোর পলাইয়াছে। ডাকাতির কিছু

দিন পরে, প্রিয়ম্বদার ঘরে রাত্রে ইঁট, পাটখেল পড়িতে আরম্ভ হইল;—কোন দিন বা আস্ত কাঁচা মড়ার মাথা উঠানে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন অগত্যা প্রিয়ম্বদা, 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' ভাবিয়া, কলিকাতায় আসিয়া অবাধ-বাণিজ্যে প্রাণ-মন-দেহ অর্পণ করিলেন। হরিতারণ নিষ্কণ্টক হইলেন।

দেখিতে দেখিতে হরিতারণ, সদরামীণের বিশ্বস্ত, প্রিয়তম সেরেস্তাদার হইয়া উঠিলেন। সদরামীণ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন,—লিখিতে হাত কাঁপিত। সুতরাং হরিতারণ মোকদ্দমার রায় পর্য্যন্ত লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার নাকে তিলক, মাথায় টীকি প্রভৃতির কিছু কিছু সূত্রপাত হইল। সময়ে সময়ে তাহার গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালাও শোভা পাইত। অনুগত লোকে বলিতে লাগিল, হরিতারণ স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

সেরেস্তাদার হওয়ার পর, হরিতারণ স্বতন্ত্র বাসা করেন। তিনি অলৌকিক মিতব্যয়ী ছিলেন। তখন সস্তা-গণ্ডা ছিল; সর্ব্বরকমে তাঁহার মাসিক

বাসাখরচ যায় কাপড় ১॥/০ এক টাকা নয় আনার অধিক হইত না। পৌনে দুই মাস অন্তর ধোবা-বাড়ী কাপড় কাচিতে দিতেন। একজন প্রতিবেশী দোকানদারের সহিত সবিশেষ প্রণয় জন্মিয়াছিল। বাদী-প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে পুরস্কার-স্বরূপ যে সকল সওগাদ পাইতেন, তাহার সমস্তই মুদীকে দিতেন,—ঘরে কিছুই রাখিতেন না। আম, কাঁঠাল, মাছ, দই, সন্দেস, ঘি, চাল, ডাল—এ সমস্ত উপহার-দ্রব্যই মুদীর দ্বারা বিক্রীত হইত। খরিদদারের অসুবিধাহেতু যেদিন মুদী মাছ লইত না, সেদিন তিনি পাড়ার ইতর-শ্রেণীর লোককে বাধ্য রাখিবার জন্য, তাহাদের মধ্যে মাছ বণ্টন-পূর্ব্বক বিলাইয়া দিতেন। তৈল-খরচ ভয়ে নিজে কিছুতেই ঘরে মাছ রাখিতেন না। হরিতারণের আহার ছিল,—কেবল খেঁসারির ডাল-ভাতে এবং ভাত। যেদিন খুব সমারোহ হইত,—সেদিন লবণ-সংযোগে সু-অম্ল তেঁতুলগোলা পাতের উপর শোভা সম্পাদন করিত। হরিতারণ দণ্ডে

দণ্ডে তামাক খাইতেন বটে, কিন্তু একদিনও এক পয়সার তামাক কিনিতেন না। সন্ধ্যার পর নিকট-বর্ত্তী একজন উকীলের বাসায় পাশা খেলিতে যাইতেন;—সেখানে তাঁহার হর্‌দম্‌ তামাক চলিত; খেলা-ভঙ্গে গৃহ-প্রত্যাগমনকালে তথা হইতে প্রায়ই দু-ছিলিম তামাক হাতে করিয়া আনিতেন। তাহা-তেই তাঁহার প্রাতঃকালটা চলিয়া যাইত।

সেরেস্তাদারী, মান্যের চাকুরী; তথাচ হরিতারণের বাসায় রযুয়ে ব্রাহ্মণ নাই; লোকে টেপাটিপি করিত। হরিতারণ কথায় কথায় প্রতিবেশীমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিতেন,—"আমি স্বপাক ভিন্ন কখন আহার করি না।"

হরিতারণ যে, মোকদ্দমার রায় লিখিতেন, তাহা ক্রমশ গোপনভাবে সর্ব্বত্রই প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমশ বাদী-প্রতিবাদীগণ তাঁহার যেন কেনা-গোলাম হইয়া দাঁড়াইল। তিনি মহা-মজায় উভয়-কুল হইতে মধু লুটিতে লাগিলেন। বহু মধু সঞ্চয় করিয়াও, তিনি প্রথম পাঁচ বৎসর

গরিবাণী-চাল্ ছাড়েন নাই। সেই স্বপাক অন্ন—সেই ১৷৴০ এক টাকা নয় আনায় বাসাখরচ বর্ত্তমান রহিল।

কারণ ছিল। চক্ষু-লজ্জা বল, ভক্তি বল, সম্মান বল,—তাঁহার যাহা কিছু, সেই সদরামীণের প্রতি ছিল। পাছে মনিব কোনরূপ সন্দেহ করেন, এই নিমিত্ত তিনি চা'ল-চলন কিছুই বদল করেন নাই। বিশেষ তিনি স্বভাব-কৃপণ। ব্যয়সংক্ষেপই তাঁহার সুখ। এইরূপে ছয় বৎসর অতীত হইলে, সদরামীণের মৃত্যু ঘটে। স্বর্ণ-ডিম্ব-প্রসবিনী রাজ-হংসীর মৃত্যুতে গৃহস্থের কিঞ্চিৎ অর্থ-কষ্ট হয় বটে,—কিন্তু হরিতারণের যেন মহান্ হর্ষোদয় হইল। তাঁহার বুক হইতে যেন শক্তিশেল খসিয়া পড়িল। তিনি সংসার সুখময় দেখিতে লাগিলেন।

নূতন সদরামীণ আসিয়া রাজকার্য্য গ্রহণ করিলেন। হরিতারণ, ইন্দ্রের শচীর ন্যায়, তাঁহারই অনুগমন করিতে লাগিলেন। নবভূপতির বাসায় প্রাতঃ-সন্ধ্যা দুই-বেলা আনাগোনা করিয়া, সন্তাদরে

হাটবাজার করিয়া দিয়া,—হরিতারণ অল্পকাল মধ্যেই নবপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। হাকিম-বশের পর তিনি স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথম—চোটায় টাকা ধার দেওয়া; দ্বিতীয়—বিষয় বা গহনা ইত্যাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া; তৃতীয়,—কখন স্বনামে কখন বেনামীতে মহাল ডাকা।

অদৃষ্ট যখন যাঁহার ফলে, তখন তাঁহার পক্ষে সবই সম্ভব হয়। পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি, হরিতারণ পাঁচ শত টাকায় কিনিয়া লইতে লাগিলেন। তিনি যে তালুক তিনশত টাকা মুনফা দেখিয়া লইলেন, ক্রমশ তাহার মুনফা তিন হাজার টাকায় দাঁড়াইল। হরিতারণের গৃহে যেন ভূতে টাকা বহিতে লাগিল। কথিত আছে, বার্ষিক বার হাজার টাকা জমীদারীর মুনফা করিয়া, হরিতারণ সন্দেস জল-খাবার খাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রথম প্রথম জল-খাবার আদৌ তিনি মুখে দিতেন না;—একবেলা রাঁধিয়া দুইবেলা চালাইতেন।

ক্রমশ, জল-খাবার হিসাবে তিনি মুড়ি ধরিলেন;—তার পর মুড়কি;—অন্তিমে, দ্বাদশ-সহস্র টাকার বার্ষিক আয়ের পর—প্রত্যহ একজোড়া হিসাবে সন্দেস সুরু করিয়াছিলেন। যখন মুড়কি চলিয়াছিল, তখন হইতেই একজন রঁধুয়ে-ব্রাহ্মণ তিনি রাখিয়াছিলেন। সে লোকটী পেটভাতায় রাঁধিত,—এবং আদালতের কাজকর্ম্ম শিখিত। যখন সন্দেস চলিল, তখন তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বলিল,—"এ সামান্য মাটীর ঘরে থাকা আপনার আর ভাল দেখায় না!—অন্তত নীচে-উপর চারকুঠারি একটী দালান করুন।"

হরিতারণ। বাপ্‌রে আমি কত দৌড়ের মানুষ!—আমার বেসাৎ কি? সঙ্গতি কি?—যে, বিদেশে আমি ইট গাড়িব? এ ইটেল-চণ্ডী ঘরে ঢুক্‌লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে!!

এইরূপে ক্রমশ নিজগুণে হরিতারণ কালেক্টরীর সেরেস্তাদার হইলেন। তখন আর তাঁহাকে পায়

কে? আকাশে শশধর ষোলকলায় হাসিল, নিম্নে কুমুদিনী কামকলায় ফুটিল;—মলয় বায়ু মৃদুমন্দ বহিল, বসন্তের প্রেমপাখী কুহু-কুহু ডাকিল; হরিতারণ কোটীপতি হইলেন।

প্রচুর অর্থ উপার্জ্জিত হইল, কিন্তু তাঁহার মন প্রফুল্লিত হইল না। তিনি রাজ-সম্মান, সামাজিক-সম্মান,—অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সেই সময় হুগলীতে প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁহার অপূর্ব্ব অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইল। স্বগ্রাম হইতে পরিবারবর্গ আসিল। দাসদাসী নিযুক্ত হইল। সোণা-রূপার হুঁকা, ফরসী, গুড়গুড়ি তৈয়ারি হইল। সোণা-রূপার থাল, রেকাবী, বাসন, বাটী হইল। পাল্‌কী করিয়া কাছারি যাতায়াত আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি ভক্তি বাড়িল,—দুই চারি টাকা দান-খাতে খরচ পড়িতে লাগিল। ছেলেরা মাহিনা দিয়া স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিল। বার্ষিক পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে হুগলীর বহুলোক তাঁহার বাসায় পাত পাড়িতে থাকিল।

এইরূপে হরিতারণ সমাজে সম্মানিত হইতে লাগিলেন,—সমাজের একজন হইয়া উঠিলেন।

তখন তাঁহার ধার্ম্মিক হইতে সাধ হইল। তিনি স্বদেশে—স্বগ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন; অতিথিশালা বসাইলেন; আশ্বিনে দুর্গোৎসব, ফাল্গুনে দোল, আষাঢ়ে রথ—এ সমস্তই চলিতে লাগিল। কোন কোন বৎসর পৌষমাসে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বনাত, এবং কাঙ্গালীগণকে কম্বল-দান করিতে লাগিলেন।

একটা কথা বলিয়া রাখি, হরিতারণ এইরূপ ধর্ম্মকর্ম্মের প্রথমাবস্থায় শিবভক্ত বা শৈব ছিলেন; ক্রমশ বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব হইলেন। পূর্ব্ব-নির্ম্মিত শিবমন্দির ভাঙ্গিলেন না বটে, কিন্তু শিবপূজার জাঁকজমক কমাইয়া দিলেন। পুরাতন শিবমন্দিরের সম্মুখেই ৺লক্ষ্মী-নারায়ণজীউর এক বৃহৎ নাট-মন্দির উত্থিত হইল। ধূমধামে সেবার বন্দোবস্ত হইল। সে যাহাই হউক, এখন হরিতারণ স্বয়ং প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পর বন্ধুজন-বেষ্টিত হইয়া, খোষ-

গল্প করিতে করিতে হরিনামের মালা জপ করিয়া থাকেন; এবং মধ্যে মধ্যে "রাধা রাধা বল," "হরি হরি বল"—ধ্বনি করিয়া উঠেন।

তার পর, তাঁহার রাজসম্মান পাইবার বাসনা বলবতী হইল। সময়ে-অসময়ে, পর্ব্বে-অপর্ব্বে, বড়-দিনে-ছোটদিনে,—জজ, মাজিষ্টর, এবং কমিশনরের বাড়ী ভেট যাইতে লাগিল। কাঁচামিঠে আম, লিচু, কুল, নেবু, কলা,—পাকা ফজ্‌লী আম, বোম্বাই আম, জাম, কাঁঠাল,—পাঁঠা, খাশী, ভেড়া, শাম্পেন,—ফুল, মালা, তোড়া,—ভেট স্বরূপ বাজারের সমস্ত উৎকৃষ্ট সামগ্রীই ঐ ত্রিমূর্ত্তির নামে যথাক্রমে উৎসর্গীকৃত হইতে লাগিল। ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,—হরিতারণের উপর করুণা প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা, সার্ব্বভৌম হিতের জন্য, চাঁদার খাতায় সহি করাইয়া লইতে লাগিলেন। পরমপুরুষ প্রভুত্রয়ের প্রেমে পুলকিত হইয়া হরিতারণ অকাতরে দুই শত, পাঁচ শত, দুই হাজার, দশ হাজার, টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দিতে

আরম্ভ করিলেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ সম্মান ছিল,—"রায়বাহাদুর।" অচিরে, উপাস্য দেবতাগণের প্রসাদ-স্বরূপ তিনি 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার নামটী দাঁড়াইল,—'রায় শ্রীহরিতারণ দাসদত্ত বাহাদুর'।

অতঃপর হরিতারণ, প্রকৃত বড়মানুষ হইবার জন্য নানারূপ ঢঙ, রঙ, সঙ—শিখিতে, ফলাইতে, এবং সাজিতে লাগিলেন। তখন একটু মোটা হইবার তাঁহার বাসনা হইল; নেয়াপাতি-রকমের ভুঁড়ি নামাইবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই পাকা, পাকসিটে, ঝুণো খর্ব্ব-শরীরে ভুঁড়ি কিছুতেই নামিতে চাহিল না। তবে টাকার গরমে এবং রাজ-ভোগে, যেরূপ একটু নুদুস-নাদুস, চিকণ-চাকণ হইতে হয়, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই কতকটা হইয়াছিলেন। কিন্তু স্থূলতা আরও অধিক বৃদ্ধির জন্য, দুধের বরাদ্দ বাড়াইতে,—একজন বিশ্বস্ত বন্ধু উপদেশ দিল। প্রত্যহ পাকি আড়াইসের খাঁটি দুধ খাইয়া বড়-কর্ত্তার পেটের

অসুখ হইল। তখন হরিতারণ দুধ হজমের জন্য আফিঙ ধরিলেন। ফল কথা; শরীর যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল;—গর-হজমে গো-দুগ্ধের মাত্রা কমাইতে হইল,—কেবল আফিঙ-সেবনটা রহিয়া গেল।

"খাইতে পারি না,"—"এক ছটাক চেলের অন্ন রোচে না,"—"একটী সন্দেস ভাঙ্গিয়া আধখানির একটু কোণ খাইলেই অম্বল হয়"—এই সব কথা বলাই আহার-বিষয়ক বড়মানুষীর প্রধান লক্ষণ। বড়কর্ত্তাও কালক্রমে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "পাঁচ সনের পুরাণ মিহি বাদসাভোগ চাল ভিন্ন অন্য চাল খাইলে আমার অসুখ করে। তাই বা কত-কটি? প্রত্যহ নিক্তিদ্বারা ওজন করিয়া আমার জন্য দুই ভরি চাল রন্ধই হয়। বলিব কি,—যেদিন গিন্নি গোপনে দু-ভরি দু-আনা চাল রাঁধিতে দেন, সেদিন আমার পেট ফাঁপে।" বস্তুত, বড়কর্ত্তার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল। বৃদ্ধকাল উপস্থিত,—ক্ষুধার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। দেহের বাঁধন

ছাড়িতে আরম্ভ হইলে কি আর যৌবনকালের সেই বিষম ক্ষুধা থাকে। বিশেষ, নানা সুচিন্তা-কুচিন্তায় বড়কর্ত্তার মনপ্রাণ সদাই জর্জ্জরিত। কাজেই ক্ষুধা নাই। চিন্তাই মনুষ্যের জ্বর। জ্বরে পূর্ণমাত্রায় আহার করিতে কে পারে? তবে বড়কর্ত্তা লোকের কাছে তাঁহার আহারের পরিমাণ যতটা কম বলিয়া পসার বাড়াইতেন, ততটা কম অবশ্যই নহে। বৃদ্ধ ব্যক্তি সাধারণত যেরূপ আহার করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ আহার করিতেন। তবে তিনি এটা-ওটা-সেটা পাঁচ প্রকার ব্যঞ্জনাদি খাইতেন বলিয়া, অন্নের মাত্রা কিছু কম হইয়াছিল। একটা কথা বলিয়া রাখি,—কালেভদ্রে কচিৎ কোথাও নিমন্ত্রণে, অথবা স্বগৃহে, কোন বিশেষ বন্ধুবান্ধবের সহিত খাইতে বসিলে, তিনি গোড়া হইতেই,—"আর না,—আমাকে আর দিও না; আমি কিছুই খাইতে পারি না,"—ইত্যাদিরূপ ধ্বনি করিতেন,—এবং বসিয়া-বসিয়া-বসিয়া যেন বহুকষ্টে যৎসামান্য যৎকিঞ্চিৎ সামগ্রী উদরস্থ করিতেন।

বড়লোক হইলে কম খাইতে হয়,—ইতরলোকেই অধিক খায়—ইহাই বড়কর্ত্তার ধারণা।

বড়লোক হইলে একটা ব্যারাম থাকা চাই। প্রত্যহ ডাক্তার আসিয়া বক্ষ পরীক্ষা করিয়া, প্রেসক্রপ্‌ষণ লিখিবে, কবিরাজ আসিয়া নাড়ী টিপিয়া বটিকা দিবে, 'হেকিম আসিয়া রোগের অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া যাইবে,—তবেত বড়লোক! সুতরাং বহুদিন হইতে বড়কর্ত্তা একটী রোগের অন্বেষণ করিতেছিলেন,—খুঁজিয়া পান নাই। ক্রমশ, কদাচিৎ কখনো তাঁহার "অম্বল" হইতে লাগিল। তিনি এই সুযোগ পাইয়া রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, "আমার অম্বল-শূল ব্যাধির উপক্রম হইয়াছে।"

এইরূপে কালক্রমে রায় শ্রীহরিতারণ দাস-দত্ত বাহাদুরের বড়-মানুষত্বের কোন উপকরণই অসম্পূর্ণ রহিল না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এককালের পেটভাতায়-তামাক-সাজা হরিতারণ আজ প্রকৃত-প্রস্তাবে খাঁটি বড়লোক হইয়া উঠিয়াছেন। জাঁক-জমকে বাহ্যাড়ম্বরে তাঁহার গৃহ পূর্ণ। ক্ষুধানলে দেহ দগ্ধ হইতে থাকিলেও, কালাচাঁদ সে ঐশ্বর্য্য না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঠাকুরদাদাব সঙ্গে যাইতে যাইতে কালাচাঁদ দেখিলেন,—অন্দর-বাটী চকমিলান,—সাদা চূণকাম সূর্য্যের আভায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। প্রত্যেক খিলানের উপর কোথাও গণেশমূর্ত্তি, কোথাও হরগৌরীমূর্ত্তি, কোথাও রাম রাজা, কোথাও সীতাহরণ। সারি সারি চাবি দিকের পাথরের থামে সবিস্তারে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে,—বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন;—এক্ষণে—চিত্রকব এবং ভাস্কর উভয়ে মিলিয়া সেই রচনাকে চিত্রাকারে সজীব করিয়া রাখিয়াছে।

সর্ব্বদিক্ সুপ্রসন্ন। সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়া মন্দ মন্দ বহিতেছে। সরোবর কমলদলে শোভমান। অলিকুল মধুপানে আকুল হইয়া গুণগুণরবে গান করিতেছে। দেব ও ঋষিগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। এমন সময় কংসের কারাগারে, দেবকীর গর্ভে, ভগবান্ হরি ঐশ্বর্য্য-রূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই বালক অতি অদ্ভুত। তাঁহার লোচন প্রফুল্ল কমল তুল্য; চতুর্ভুজ; শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী; বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন; গলে কৌস্তুভমণি; পরিধান পীত বসন; বর্ণ নিবিড় জলধর তুল্য শ্যাম। ভগবানের এই মূর্ত্তি দেখিবামাত্র বসুদেব এবং দেবকী বিস্ময়-উৎফুল্ল নয়নে, কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম স্তম্ভে এই চিত্র।

দ্বিতীয় স্তম্ভে কালাচাঁদ দেখিলেন, ভগবান্ যোগ-মায়াবলে দুই-হস্ত-দুই-পদ-বিশিষ্ট প্রকৃত বালক হইয়াছেন। বসুদেব তাহাকে কোলে লইয়া কংস-ভয়ে কারাগার হইতে পলাইতেছেন। সূতিকা-গৃহের

ঠাকুরদাদার অন্দরমহল।

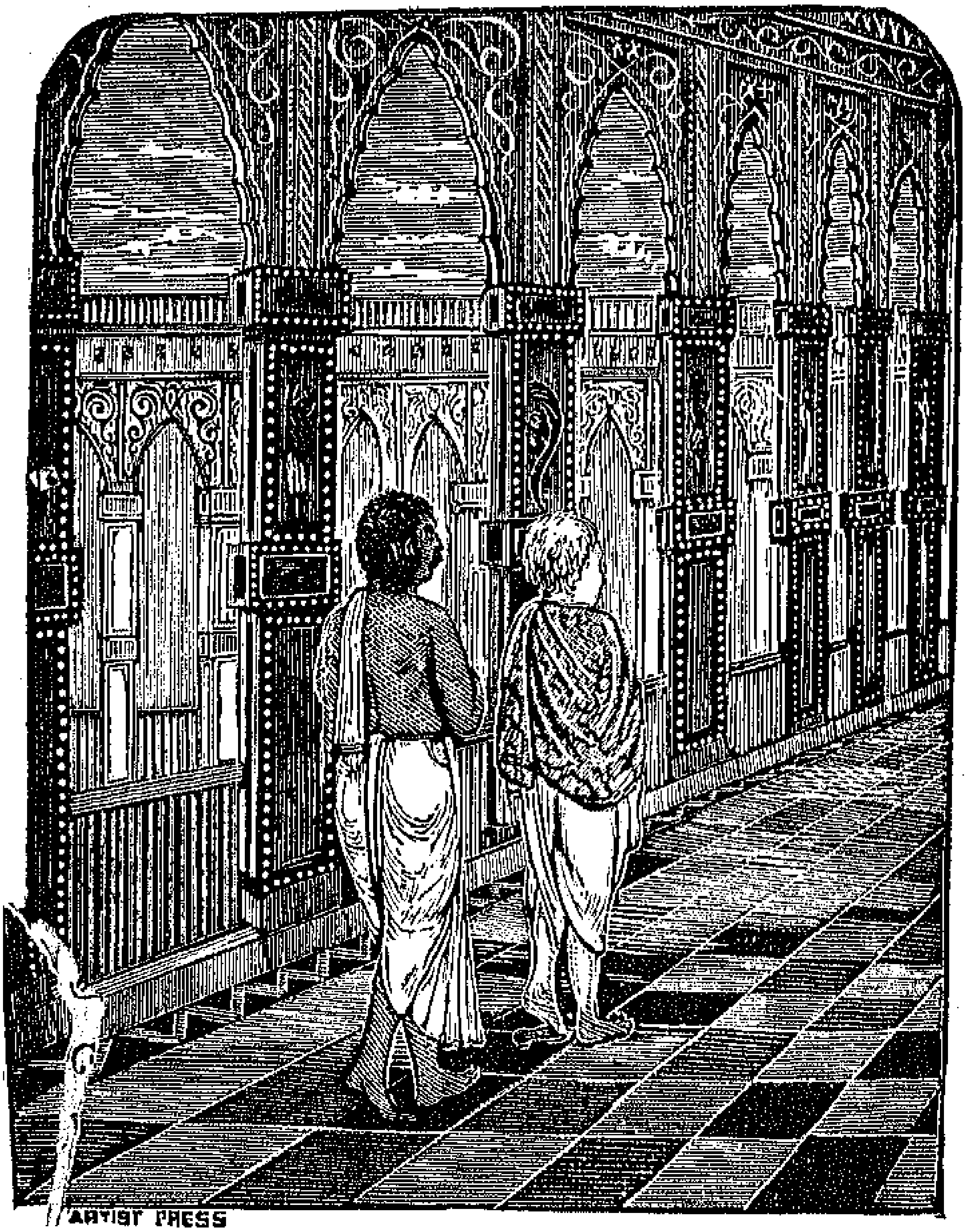

বৃহৎ কপাট, লৌহ-কীলক, যেন আপনাপনি খুলিয়া যাইতেছে। দ্বারপাল এবং পুরবাসীগণ—সকলেই যেন ঘোর-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। সেই স্তম্ভে আরও একটী চিত্র আছে। বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া তরঙ্গ-ভঙ্গ-ময় ফেনিল যমুনা পার হইতেছেন; নব-নীল-নীরদ ঘন-ঘোর বর্ষণ করিতেছে;—স্বয়ং অনন্ত মহা-ফণা বিস্তার করিয়া,—ছত্ররূপে জল নিবারণ করিতে করিতে, বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে-ছেন। এ ছবি দেখিয়া কালাচাঁদ ভাবিলেন,—এ কিরকম গাঁজাখুরি? সাপে চক্র ধরিয়া ছাতার-স্বরূপ হইয়াছে।। বড় মজা'ত!

তৃতীয় স্তম্ভে চতুর্থ চিত্র। মায়াবিনী পূতনা পরমা সুন্দরী রমণী হইয়াছে। তাহার কেশকলাপ প্রফুল্ল-মল্লিকামালায় বিভূষিত; নবীন নধর নিতম্বে মেদিনী লজ্জা পাইতেছে; পীনোন্নত পয়োধর-ভারে সেই কামিনী যেন থর থর কাঁপিতেছে; কটাক্ষে যেন মুনির মন হরণ করিতেছে; সে,

শিশু-শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া দুর্জ্জয় গরল-বিলেপিত স্তন পান করিতে দিয়াছে। ভগবান্ যেন মহাক্রুদ্ধ হইয়া গাঢ়-নিষ্পীড়নপূর্ব্বক নিশাচরীর স্তন তাহার প্রাণের সহিত পান করিতেছেন। এ ভাবটী বড়ই চমৎকার। বলিহারি কারিকরের চিত্রকার্য্য!!

চতুর্থ স্তম্ভে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা চিত্র। নন্দপত্নী যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া আদর করিতেছেন। হঠাৎ শিশুকে গিরিশিখর তুল্য গুরু বো করিয়া তিনি যেন ভারবহনে অসহিষ্ণু হইলেন একস্থানে দানব তৃণাবর্ত্ত চক্রবায়ুর রূপ ধরিয় শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া উড়িয়া পলাইতেছে অন্যস্থানে, সেই আকাশ-পথেই শিশু-শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যে গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন,—মায়াবী দানব পতনোন্মুখ হইয়াছে।

পঞ্চম স্তম্ভে, কৃষ্ণ-বলরাম হামাগুড়ি দিতেছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসের পুচ্ছ ধরিয়া আছেন,— বৎস দৌড়িতেছে। কোথাও তিনি একটী বাছুর কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ

দুগ্ধ চুরি করিয়া খাইতেছেন। কোথাও বানর-গণকে নবনী বিলাইতেছেন। কোথাও শীকাস্থ ভাণ্ড শ্রীকৃষ্ণ নাগাল পান নাই,—একটা নগা লইয়া আসিয়া সেই ভাণ্ড ছেঁদা করিতেছেন। কোথাও তিনি চুপি চুপি অদোহন-কালে বৎস সকলকে খুলিয়া দিয়া গাই পিয়াইয়া দিতেছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ মাটী খাইয়াছেন,—যশোদা তাঁহাকে হাঁ করিতে বলিযাছেন। যশোদা বিস্ময়ে পুত্রের মুখাভ্যন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ নোড়া লইযা দধিভাণ্ড ভাঙ্গিতেছেন। কোথাও যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিতেছেন;—কিন্তু দড়ীতে কুলাইতেছেনা বলিয়া, মাতা বড়ই অপ্রতিভ হইতেছেন।

ষষ্ঠস্তম্ভে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যমলার্জ্জুন পাত।

অষ্টম স্তম্ভে, বালকবৃন্দসহ বনে শ্রীকৃষ্ণের গো-চারণ।

নবমে, অঘাসুর সর্পশরীর ধরিয়া বৎসপাল গিলিতেছে।

দশমে, কালিয়দমন। এখানে চিত্রকর চিত্রকার্য্যের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। মহাসর্প রোষভরে চক্ষুদ্বারা যেন গরল উদ্গীরণ করিতেছে; শিখযুক্ত জিহ্বাদ্বারা অবিরত চোবাল চাটিতেছে: আর, শ্রীকৃষ্ণ তাহার মস্তকোপরি নৃত্য করিতেছেন।

একাদশে, বস্ত্রহরণ। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বস্ত্র লইয়া বৃক্ষোপরি বসিয়া আছেন। গোপাঙ্গনাগণ আপন আপন করতল দ্বারা যোনিদেশে আচ্ছাদ করত ভগবানের নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন।

দ্বাদশে, শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ।

ত্রয়োদশে, শ্রীকৃষ্ণের মহারাস। অবলা গোপীগ মণ্ডলরূপে অবস্থিতা; শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের দুই দুই-জনের মধ্যস্থলে এরূপ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং উভয় পার্শ্বস্থ দুই-দুই-জন গোপীর গলদে এরূপভাবে আলিঙ্গন করিয়াছেন যে, গোপাঙ্গনা প্রত্যেকেই তাঁহাকে স্বস্ব নিকটস্থ দেখিতেছে এব প্রত্যেকেই যেন মনে করিতেছে,—ইনি কেব আমাকেই আলিঙ্গন করিয়াছেন, যেন ইনি কেব

আমাকেই অন্য গোপী অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। ধন্য নির্ম্মাণকৌশল! ধন্য কারিকরের অপূর্ব্বশিক্ষা!

চতুর্দ্দশে, কৃষ্ণ-বলরাম মল্লবেশে মহারোষে কংস-সভায় অবতীর্ণ।

পঞ্চদশে, কংস-বধ।

ষোড়শস্তম্ভে, রুক্মিণী-হরণ।

এইরূপ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানাবিধ চিত্রে সেই ষোলটী স্তম্ভ অলঙ্কৃত হইয়াছে।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুধার্ত্ত কালাচাঁদ সেই বিরাট ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রকৃতই অবাক্!—এমন যে মহাক্ষুধা, তাহাও যেন কিছুক্ষণের জন্য তিনি ভুলিয়া গেলেন। অন্দর-মহলের সেই অভূতপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন,—"ঠাকুরদাদা লক্ষপতি, না ক্রোড়পতি? এরূপ শ্বেতপাথরের মেজে, এরূপ শ্বেতপাথরের থাম, তাহার উপর এরূপ কারিকুরি—ইহা'ত সামান্য অর্থব্যয়ে হইবার নহে,—না জানি, ইহা কতলক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে!—কিন্তু কোথা হ'তে ঠাকুরদাদার হাতে এত টাকা আসিল?"

ধনঞ্জয়-হস্তে খাণ্ডব-বনদাহ হইতে রক্ষা পাইয়া, ময়-দানব ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবের সেই বিশ্ববিমোহন সভা বিরচন করেন। হরিতারণ দ্বারা যাবজ্জীবন-কারাবাস হইতে রক্ষিত হইয়া, একজন উত্তর-

পশ্চিম-দেশবাসী হিন্দুস্থানী, হুগলীতে ঠাকুরদাদার এই অপূর্ব্ব অন্দর-মহল তৈয়ারি করিয়া দেন। ঐ হিন্দুস্থানী, নৌকা করিয়া, কলিকাতা অঞ্চলে আফিম্ চালান দিত। বহুদিন হইতে তাহার এ ব্যবসা চলিতেছিল। এ ব্যাপার গবর্ণমেণ্টের কতক কর্ণগোচর হইলেও, গবর্ণমেণ্ট সহজে শীঘ্র চোর ধরিতে পারেন নাই। উক্ত আফিম্-ওয়ালার পুলিস'ত বশে ছিলই,—এমনও শুনা যায় যে, খুব বড় না হউক, মাঝারি-মাঝারি রাজকর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিতেন। এ দেশে ক্রমশ এত চোরাই-আফিমের প্রাদুর্ভাব হইল যে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আফিমের আয় কতক পরিমাণে প্রকাশ্যত কম পড়িল। গবর্ণমেণ্ট তখন সজীব হইলেন। চারিদিকে ধর্-ধর্-ধর্ ধ্বনি পড়িয়া গেল। পাকা পাকা, বড় বড় গোয়েন্দা নিযুক্ত হইল। পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঘোষিত হইল। এমন সময়, একদিন হুগলীর পার্শ্বস্থ গঙ্গা দিয়া বিষম বোঝাই একখানি গমের

নৌকা যাইতেছিল। হুগলীর পুলিস তাহা আক্রমণ করিল। গমের নৌকার দাঁড়ি-মাঝির সহিত পুলিসের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইল,—চারিজন কনষ্টেবল হত হইল। শেষে গমের নৌকা ডুবিল। নৌকাব আরোহীগণ অন্য একখানি পান্‌সীতে গিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। পুলিস-সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল। আবার তীর হইতে পুলিস-সৈন্য প্রেরিত হইল; পান্‌সিস্থ ব্যক্তিবৃন্দ ধৃত হইল। বিপরীত মোকদ্দমা বাধিল। পুলিস অভিযোগ আনিল,—ঐ গমের নৌকায় হিন্দুস্থানীর বাইশ মন আফিম্ ছিল। ঐ নৌকার দাঁড়ি-মাঝিগণ সমস্তই লেঠেল; ইহা ব্যতীত চারিজন অস্ত্রধারী দ্বারবান্ ছিল; স্বয়ং আপিম্‌ওয়ালাও ঐ নৌকায় ছিল। আমরা গমের বস্তা সরাইবার চেষ্টা করিবা মাত্র, মাঝিরা মাথা ফাটাইয়া চারিজন কনষ্টবলের প্রাণ বধ করিল। অন্যান্য কনষ্টবলগণ কাজেই পলাইয়া আসিল। আপিম্‌ওয়ালা,—মাল নিশ্চয় ধরা পড়িবে বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ নৌকা ডুবাইয়া, আফিম্ ভাসাইয়া

ৎ। শেষে আমরা ডুবারি দ্বারা এই চামড়ার
টী গঙ্গার ভিতর হইতে পাইয়াছি,—ইহাতে
মণ আন্দাজ আফিম্ আছে। এইরূপ ৪৫টা
ড়ার থলে ছিল,—আমরা পূর্ব্বেই এ সংবাদ
ইয়াছিলাম।

আফিম্‌ওয়ালা হিন্দুস্থানী; সে এজেহার দিল,
া এ বিষয়ের ভাল-মন্দ কিছুই জানি না।
ার নিবাস আগরা। কলিকাতায় আমার
পড়ের এবং শ্বেত-পাথরের কারবার আছে।
আমি চলিয়া যাইতে অক্ষম বলিয়া বাঁকিপুর হইতে
এই বোঝাই-নৌকায় চড়িয়াছি। (বলা বাহুল্য
তখন ভারতের কোথাও রেলপথ ছিল না।)
হঠাৎ এই হুগলীর সম্মুখে গঙ্গায় আমাদের
নৌকায় ডাকাত পড়িল। মাঝিরা আত্মরক্ষার্থ
প্রথমত চেষ্টা করে। উভয় পক্ষে খানিক খুব
লড়াই হয়। শেষে ডাকাত-দল বেগতিক দেখিয়া
নৌকা ডুবাইয়া দিল। কতকগুলা মাঝি তীক্ষ্ণ
তরবারির প্রহারে প্রাণে মরিল, কতক ডুবিয়া গেল,

নৌকা তক বোধ হয সাঁতার দিয়া পলাইল। করিল। বির পর, আমি গঙ্গায় পড়িয়া হাবুডুবু পুলিসের ায, একজন পান্‌সীওয়ালা আসিয়া আমাকে তুলিল। তাবপব, পুলিস গিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া আসে। ইহাইত ব্যাপার। ইহা ছাড়া" আমি আর কিছুই জানি না।

এইরূপে উভয়পক্ষে বিষম মোকদ্দমা বাধিল। মাজিষ্টব আফিম্‌ওয়ালাকে দায়রা সোপরদ্দ করিলেন। সকলে বলিল, এইবার নিশ্চয় তাহার যাবজ্জীবন কারাবাস হইবে।

আফিম্‌ওয়ালা হাজতে পচিতে লাগিল। বড়ই কাতর হইল। প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল। আগরা হইতে তাহার ছোট-ভাই মোকদ্দমার তদ্বিব জন্য বহুঅর্থ লইয়া হুগলীতে আসিল।

ঠাকুরদাদা আফিম্‌ওয়ালার তদ্বিরকার হইলেন। তাহাকে অভয় দিলেন। হাজতে তিনি তাহার সহিত দেখা করিলেন। সে, তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "আমি আপনাকে লক্ষ

াকা দিব,—আপনি আমাকে খালাস করিয়াচামড়াব
াকুরদাদা হাসিয়া বলিলেন, "আমি -ইহাতে
অভিলাষী নহি,—আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির ৪৫টা
ই আমার উদ্দেশ্য! কেবল মোকদ্দমার তাদ্বর
,—উকীল-মোক্তারগণকে দিবার জন্য, সাক্ষীগণের
, জুরিগণের জন্য—যে টাকা আবশ্যক হইবে,
াহা দিলেই হইবে।—আমি স্বযং কিছুই চাই না।"

মোকদ্দমার তদ্বির জন্যই প্রায় চল্লিশ হাজার াকা সংগৃহীত হইল। আফিম্‌ওয়ালা খালাস াইল। তখন সে, পুরস্কারের-স্বরূপ ঠাকুরদাদাকে াগদ ৫০ হাজার টাকা গণিয়া দিল, এবং দুই লক্ষ াকা ব্যয়ে মার্বল-পাথরের চিত্রময় অন্দর-মহল তৈয়ারি করাইয়া দিল। প্রায় তিন বৎসরে এই াটী প্রস্তুত হয়। জয়পুর, এবং আগরা অঞ্চল হইতে অনেক ভাল ভাল কারিকর এই নিমিত্ত আসিয়াছিল। আফিম্‌ওয়ালা অনেক সময় স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একার্য্য সমাধা করে।

আফিম্‌ওয়ালার ইচ্ছা ছিল,—বহির্বাটীও খুব

জমকাল ভাবে বিনির্ম্মিত হয়। কিন্তু ঠাকুরদাদা তাহাতে রাজী হইলেন না। সদরের শোভা সদাই লোকে দেখিবে,—লোকে হয়ত ভাবিবে, ঠাকুরদাদা বুঝি ঘুষখোর,—ঘুষে বড়মানুষি করিতেছে,—ইহা হয় এই ভাবিয়াই তিনি বহির্বাটীকে অন্দরের অপূর্ব্বভাবে নির্ম্মাণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তবে সদরও নিতান্ত মন্দ নহে,—দালান, ফটক প্রকোষ্ঠ,—এ সমস্তই ইষ্টক-নির্ম্মিত, এবং যথা-সম্ভব শোভা-সমন্বিত। বিশেষ, ফটকের বাহার অপেক্ষাকৃত উত্তম। বড়-মানুষ হইলে সোজাসুজি যেরূপ গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে হয়, সদরবাটী ঠিক্ সেই ধরণের। কিন্তু অন্দরের কথা স্বতন্ত্র। বড় বড় রাজার ঘরেও সেরূপ অন্দর সচরাচর সহজে দৃষ্ট হয় না।

আবাস-গৃহ এরূপ পাথর এবং ইষ্টকদ্বারা আশ্চর্য্যভাবে নির্ম্মিত হইলেও, সাবেক, পুরাণ সেই ভাঁড়ার-ঘরটী এখনও মাটির দেওয়াল-বিশিষ্ট ছিল। ঐ ভাঁড়ার-ঘর পয়মন্ত, লক্ষ্মীমন্ত বলিয়া ঠাকুরদাদা উহা ভাঙ্গেন নাই।

ক্ষুধার্ত্ত কালাচাঁদ অন্দর দেখিয়াই মুগ্ধ। কোন কথাটী কহিলেন না। পশ্চাতে নিবদ্ধ-নৌকাবৎ কালাচাঁদ, ঠাকুরদাদা-ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন।

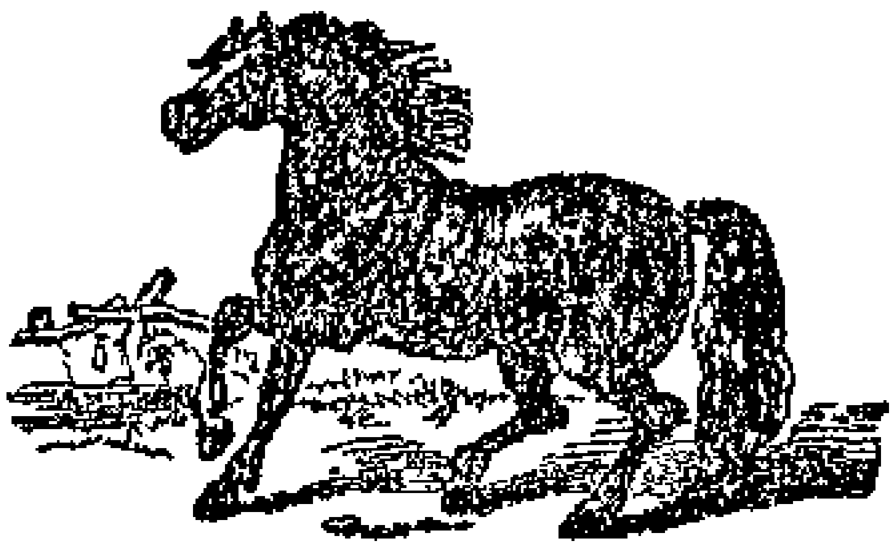

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্দরের উঠান পার হইয়া, কালাচাঁদ দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়িতে পা দিলেন। পায়ে নরম ঠেকিল,—পিছল বোধ হইল,—বেশ আরাম-আরামও লাগিতে লাগিল। নীচে চক্ষু নামাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন,—এ সিঁড়ি বালিচূণের নহে,—মার্ব্বল পাথরে রচিত। ভাবিলেন, "কাণ্ডখানা কি? বৈকুণ্ঠ ঠাকুরদাদা কতটাকা উপার্জ্জনের পর কেবল এক সিঁড়িতেই এত টাকা ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন!—এ রহস্য কেহ কি ভেদ করিতে পারেন?"

দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলেন, এক দরদালান; মেজে পাথরের!—কালাচাঁদের বোধ হইল, এ পাথরগুলা অপেক্ষাকৃত কিছু কম মূল্যের,—কেন না, ইহা তাঁহার পায়ে পূর্ব্ববৎ মোলায়েম ঠেকিল না।

সম্মুখে এক বৃদ্ধা স্ত্রী আসিয়া দাঁড়াইলেন। লক্ষ্মীরূপিণী সতী—যেন প্রকৃতই পবিত্রতার

আধার। পরিধান রাঙ্গাপেড়ে ঘন-বুনান কাপড়। গলায় মালা। নাকে তিলক। সিঁথা, সিন্দূরে সবিশেষ বিলেপিত। হাতে সুবর্ণকঙ্কণ,—লৌহ। ঘোমটা ঈষৎ টানা। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসরের কম হইবে না।

সেই সতীসাধ্বী,—কালাচাঁদকে দেখিয়া ছল-ছল নেত্রে, ধীরে ধীরে বলিলেন,—“বাছা, এত দিন কি আমাদিগে ভুলে থাক্‌তে হয়?—”

এই কথা বলিতে না-বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু দিয়া টস্‌টস্‌ জল পড়িতে লাগিল।

ঠাকুরদাদা, কালাচাঁদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“ইনি তোমার পিতামহী, প্রণাম কর।”

কালাচাঁদ, ঠাকুরদাদার সহধর্ম্মিণীকে,—অর্থাৎ তাঁহার বর্ত্তমান ঠাকুরমাকে, ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ হইলেন।

ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়া সুগম্ভীর-স্বরে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—“বাছা, একশত বৎসরের হইয়া বাঁচিয়া থাক।”

ঠাকুরদাদা, তীব্রকটাক্ষে সহধর্ম্মিণীর পানে চাহিলেন। সরলমতি ঠাকুরমা, সে কটাক্ষ দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কালাচাঁদ তাহা দেখিলে

ঠাকুরমা কালাচাঁদের প্রতি চাহিয়া বলে আরম্ভ করিলেন, "বাছা, তুই আমার কেলেসোণম তোকে আমি খাওয়াতে মাখাতে পেলেম না এ কি আমার কম দুঃখ? ওঁকে সেদিনও বলিলা আমার কেলেসোণার খবরটী আনাও। উঁ কোথাও তোর সন্ধান পেলেন না। বাছা, তো আপন ঠাকুরমা এবং আমি—আমরা দুই জনে দুই "যা" ছিলাম। তিনি সতীলক্ষ্মী ছিলেন,—আগেই গেলেন,—কিন্তু বড় কষ্টপেয়ে গেছেন,—তোর বাপ তখন সাতমাসের-টী,—তোর বাপ দুধের জন্য কাঁদ্‌তো,—বেশী দুধ দিতে তখন আমরা কোথা পাবো? একদিন ছেলেটী কাঁদ্‌চে—সতীলক্ষ্মীও ছেলেটীকে কোলে ক'রে কাঁদ্‌চেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—দিদি তুমি কাঁদ্‌চো কেন? দিদি বল্‌লেন 'ছেলের দুধে কুলায় নাই,—তাই ক্ষুধায় কাঁদ্‌চে।

এই রকম রোজ কাঁদে।' তখনত আমাদের পয়সা-কড়ি ছিল না যে,—বেশী দুধ রোজ-ক'রে খাওয়াব! আমি বলিলাম, 'দিদি! সেজন্য তুমি কেঁদো না। আমার মাইয়ে খুব দুধ আছে,—আমি খাওয়াচ্চি,—ছেলে আর কাঁদ্‌বে না।' আমি ছেলেকে মাই দিলাম, ছেলের পেট ভরিল,—কান্না থামিল। সেই দিন থেকে দিদির জ্বর হলো,—তিন দিনের দিন দিদি গঙ্গা পেলেন। বাছা!—কেলেসোণা! সেই দিন থেকে আমার মাই খাইয়ে তোর বাপ্‌কে মানুষ করে ছিলাম। তোর বাপ্ রাত্রে একদণ্ড মাই ছাড়্‌তো না,—আমার এই বুকের উপর সমস্ত রাত শুয়ে মাই খেতো,—এই রকম পাঁচ বছর ধরে মানুষ করে ছিলাম। সুরেশের বাপকে, তোর বাপ মাই খেতে দেয় নাই,—চারি বছরের ছেলে হয়েও তোর বাপ মাই ছাড়ে নাই। সুরেশের বাপ তখন আড়াই বছরেরটী। যদি লুকিয়ে কখন তাকে মাই দিতাম, তোর বাপ জান্‌তে পেরে, অমনি দৌড়ে এসে আমার চুল ধরে টেনে বল্‌তো—'মা,

পোড়ারমুখী—তুই বুঝি ভাইকে মাই দিচ্ছিলি'—এই বলিয়া আমার পিঠে, সে গুম্ গুম্ কীল মারিত। তোর বাপের সে মিষ্টি কথাগুলি আজও সব মনে আছে। বাছা! কেলেসোণা! তুই তার ছেলে,—তুই আজ যেটের কোলে ২৫ বছরের হয়েচিস্—ঠাকুরমা বলে কি একদিনও তোকে আমার কাছে আস্তে নেই? ওঁকে (হরিতারণকে) যত বলি, কেলেসোণাকে একবার নিয়ে এস; উনি তত রেগে বলেন, "ওর মামারা আস্তে দেয়না ত, আমি কি কর্‌বো?" ধন্যি! বাছা তোর পাষাণ শরীর—একবারও কি এ দিকে উঁকি মার্‌তে নেই?—"

এই বলিয়া বৃদ্ধা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কালাচাঁদ বিনয়নম্রস্বরে উত্তর দিলেন, "ঠাকুরমা, তুমি কেঁদো না। আমি এবার থেকে আস্‌বো।"

ঠাকুরমা। বাছা! তুমি আসা-আসির কথা বল কেন? তুমি এই-খানে বারমাস থাক না

কেন? তোমার ত এই ঘর। আমি আর ক-দিন বাঁচ্‌বো? যে-ক-দিন বাঁচি, তোমায় খাওয়াই, মাখাই, দেখি। তোমার একটী বিয়ে দি—নাতবৌ ঘরে আসুক। সুরেশ তোমার চেয়ে প্রায় পাঁচ-বছরের ছোট। আমার ইচ্ছা ছিল, আগে তোমার বিয়ে দিয়ে, পরে সুরেশের বিয়ে দিব। আজ তিনবছর হলো, সুরেশের বিয়ে হয়েচে! তখন 'উনি' তোমাকে কত খুঁজ্‌লেন। আমি বল্‌লাম,—কেলেসোণা বড়,—বড় থাক্‌তে ছোটর বিয়ে হতে পারে না। তা, 'উনি ত' তোমাকে কোথাও খুঁজে পেলেন না,—কাজেই সুরেশের আগে বিয়ে দিতে হলো। বাছা, এ তোমার ঘর, আমি তোমার ঠাকুরমা,—পর মনে করিও না,—তুমি ঘরের ছেলে, ঘরেই থাক। আমি তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে ঘরবাসী কর্‌বো—এইটীই আমার সাধ।

ঠাকুরদাদার মুখ রক্তিম-বর্ণে রঞ্জিত হইল। এবারও কালাচাঁদ তাহা লক্ষ্য করিলেন।

ঠাকুরদাদার বক্ষকাঁপিল, মাথাঘুরিল, মুখ শুকাইল ;—বিচক্ষণ বুদ্ধি-কালাচাঁদ তাহাও বুঝিতে পারিলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতলে যেটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহ বলিয়া আখ্যাত, সেই গৃহেই আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট অর্থে,—ঘরটী খুব লম্বা-চৌড়া, উত্তর-দক্ষিণ খোলা,—ভাল মার্ব্বল পাথরের মেজে; ঝাড়-লণ্ঠন খাটানো; দেওয়ালে চিত্র-করা। এ ঘরটী যেন অন্দরের বৈঠকখানা।

ঠাকুরমা, সুরেশের মা এবং দুইজন পাচিকা ব্রাহ্মণী—এই ঘরে আহারীয় দ্রব্য সাজাইতেছিলেন। তিন জনের স্থান হইয়াছিল; ঠাকুরদাদা, কালাচাঁদ এবং সুরেশ।

সুরেশ, ঠাকুরদাদার পৌত্র,—বংশধর,—সোহাগের সাগর। সুরেশের বয়ক্রম ঊনবিংশতি। ষোল বৎসরে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহকালে সুরেশ হুগলী-কালেজের ছাত্র ছিলেন।

সুরেশ এখন লেখাপড়া-ত্যাগী, সঙ্গীতে অনু-

রাগী। সেতার-বাজনা শিখিতেছেন। একজন ওস্তাদকে মাহিনা করিয়া রাখিয়াছেন। সেতারের সহিত সঙ্গত করিবার জন্য একজন বাদকও নিযুক্ত আছে।

সুরেশচন্দ্র, পোষাক-পরিচ্ছদেও বিশেষ মনোযোগী। সাড়ে তিনশত টাকা দিয়া একখানি বালাপোষ তৈয়ারি হইতেছে। মুরশিদাবাদ হইতে খলিফা আসিয়াছে।

সুরেশ ক্রমশ যে এত উন্নতি করিতেছেন, ঠাকুরদাদা সে বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন না। তবে একথা তিনি শুনিয়াছিলেন, সুরেশ কালেভদ্রে ক্বচিৎ একটী আধটী গান গাহিয়া থাকেন, কখন বা পূজা-পর্ব্বোপলক্ষে ইংরেজী-ফ্যাশনে টেড়ি কাটেন, মাসান্তে বা কখন একটু আতর-গোলাপ মাখেন। তা, বয়স-দোষে এমন এক-আধটু ঘটিয়াই থাকে। নচেৎ ঠাকুরদাদা যদি জানিতেন যে, সুরেশ পয়সা খরচ করিয়া ওস্তাদ রাখিয়াছে, সাড়ে-তিনশত টাকা মূল্যের বালাপোষ তৈয়ার

করিতেছে, তাহা হইলে'ত এতক্ষণ মাথামুড় খুঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া, বাড়ী ফাটাইয়া দিতেন। সুরেশ যে, ভাল ছেলে, সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ পরীক্ষাও পাইয়াছিলেন।

একবার একজন গোঁয়েন্দা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেয়, "সুরেশ বাবু একটী সেতার ৭৫৲ টাকায় কলিকাতা হইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছেন; গোয়ালিয়র-বাসী একজন ওস্তাদ সেই সেতার বাজাইতেছে। আজ তিন দিন হইল, সে ওস্তাদ আসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া কর্ত্তা ক্রোধে ক্ষোভে কেমন যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইলেন। গোয়েন্দাকে বলিলেন, "বলিস্ কি?—বলিস্ কি?—তবে কি সুরেশ আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে? উঃ! সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো!—সুরেশ এখন কোথা বল্‌তে পারিস্?"

গোয়েন্দা। আর—মোশাই! তিনি নিজের বৈঠকখানায় ব'সেই একাণ্ড করছেন।

কর্ত্তা। এখন গেলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় কি?

াযেন্দা। হাঁ, পাবেন বৈকি?

াযেন্দা—পতিতপাবন পরামাণিক। একদা বিশেষ কাবণবশত, সুবেশ, পতিতকে জুতা মারিয়াছিলেন। পতিত প্রতিশোধ লইবাব চেষ্টায ছিল। অদ্য সুযোগ পাইয়া পতিত বাদ সাধিল।

যাত্রাকালে কর্ত্তা বলিলেন, "পতিত, তুমিও আমাব সঙ্গে এস।"

যোড়হাতে পতিত উত্তর দিল, "হুজুর। মাপ কর্‌বেন,—বাবু আমাকে দেখ্‌লেই, আজ না হয়, এর পর মেরেই ফেল্‌বেন। আমাকে তিনি আপ-নাব সঙ্গে দেখ্‌লেই ঠিক করে ল'বেন,—এই বেটাই ঠাকুদ্দাকে ডেকে এনেচে।"

তখন কর্ত্তা একাই, সুবেশের বৈঠকখানাভিমুখে অর্দ্ধ-দৌড়ন-গোছ-ভাবে যাইতে লাগিলেন।

সুরেশচন্দ্রের বৈঠকখানা গোহাল বাড়ীতে। এখানে গোহালবাড়ী অর্থে গোরু থাকিবার বাড়ী নহে। ঐ স্থানে—কে-জানে,—পূর্ব্বে কবে বুঝি গরু থাকিত, তাই উহার নাম আজও গোহাল-

বাড়ী। গোহালবাড়ীটী—এখন বাগানবাড়ী,—একটী পুকুর আছে; এবং উপর-নীচে দুই-কুঠারী এক দ্বিতল দালানও আছে। এই বাগান—চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। বাগানের ফটকে অবশ্যই দ্বারবান নাই। তবে যেদিন সুরেশচন্দ্র, বৈঠকে বসিয়া গীতবাদ্যাদি ক্রিয়ায় বিশেষ নিমগ্ন হন, সেদিন ফটকে একজন প্রহরীস্বরূপ লোক বসিয়া থাকে।

অন্দরের খিড়কি দিয়া গেলে, বাগানে শীঘ্র সহজেই যাওয়া যায়। কিন্তু সদরের বহিঃরাস্তা দিয়া বাগানে একটু ঘুরিয়া যাইতে হয়। কর্ত্তা সদর-রাস্তা দিয়াই যাত্রা করিলেন।

সুরেশ, চালাক ছেলে। আটঘাট বাঁধিয়া তবে গীতবাদ্য-কেলীকৌতুকে রত হইতেন। বাগানের ফটকেত প্রহরী বসিতই; ইহা ব্যতীত বাটীর অন্যান্য দাসদাসীবৃন্দ সুরেশের গোয়েন্দা স্বরূপ ছিল।

ওদিকে, নাতিকে ধরিতে সদররাস্তা দিয়া ঠাকুরদাদা দ্রুত-পদে চলিলেন,—এদিকে সর্ব্বাগ্রে

সুরেশকে সংবাদ দিতে, অন্দর দিয়া একজন ভৃত্য লম্বালম্ফে দৌড়িল।

ভৃত্য অবশ্যই আগে পৌঁছিল। সুরেশচন্দ্র, প্রকৃতই তখন সেতার-বাদ্যের মহোৎসবে মাতিয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া একাগ্রমনে ওস্তাদজীর নিকট হইতে গৎ শিখিতেছেন। এমন সময় তিনি ঠাকুরদাদা আগমনের বার্ত্তা পাইয়া বড়ই বিব্রত হইলেন। হঠাৎ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সেতার এবং তবলা বাজনা'ত তখনি বন্ধ হইয়া গেল,—কিন্তু সেগুলাকে লুকাইবার কি? ওস্তাদজী, সঙ্গতকার, বয়স্য—ইহাঁদিগকেও বা রাখি কোথা? এদিকে,—ঐ বুড়া-কর্ত্তা আসিল, ঐ বুড়াকর্ত্তা আসিল,—এইরূপ শব্দ পড়িয়া গেল। কর্ত্তা তখন ফটক পার হইয়া সুরেশকে "সুরো," "সুরো" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছেন। সুরেশ ভয়ে সাড়া দিতে পারিতেছেন না।

হয় কি, করি কি?—গেল, গেল,—বুঝি আর

সুরেশের সেতার-শিক্ষা।

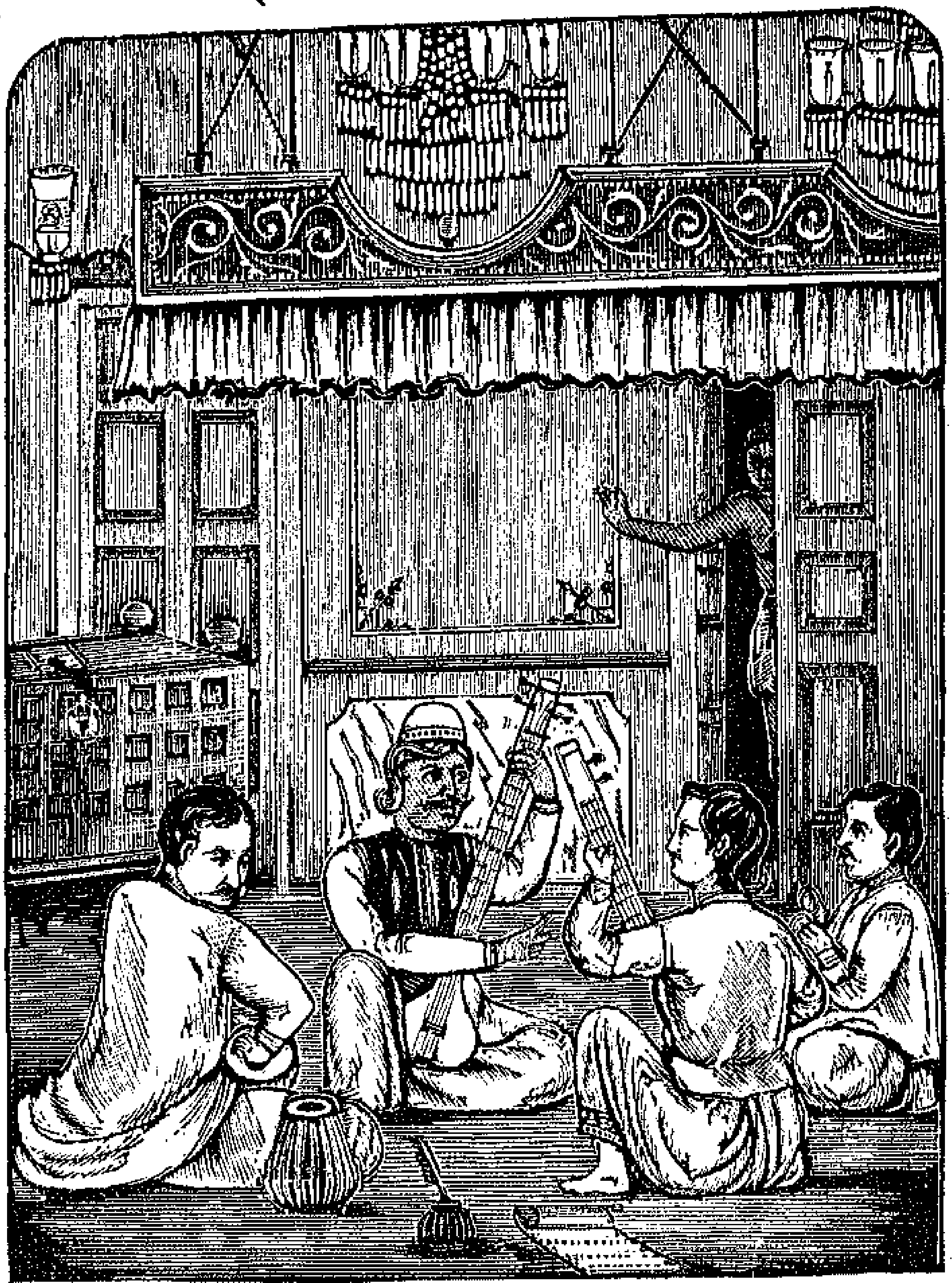

ARTIST PRESS

বাঁচিল না! কর্ত্তা ক্রমশই অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

সেতার-বাদক ওস্তাদজী তৈয়ারি লোক। তিন-সংসারে তাঁহার কেহ নাই,—পুত্রকন্যা নাই, সহ-ধর্ম্মিণী নাই, ভাই-বন্ধু নাই;—তিনি কেবল দেশে দেশে ওস্তাদি করিয়াই বেড়ান। নানা দেশ ভ্রমণ-নিবন্ধন তিনি নানা বিষয়-ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন,—সুতরাং অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ আছে। বিশেষ, অন্যান্য স্থানে এমন্-সব মজলিসে তিনি অনেকবার অনায়াসে সু-সুখে সু-উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এরূপ সঙ্কটে উপস্থিত-বুদ্ধি ওস্তাদজী বলিলেন, "ভয় কি?—ঐ যে আমকাঠের বড় সিন্দুকটা রহিয়াছে, ঐটাতে সেতার এবং ঢোলক-তবলা রাখা হউক, এবং আমিও ঐটাতে লুকাইতেছি,—তুমি সিন্দুকে চাবি দাও—"

সুরেশ। আপনি হাঁপিয়ে যাবেন যে—

ওস্তাদজী। না—না—সিন্দুকের মুখে একটু ফাঁক আছে—আমকাঠের ডালায় তেওড় আছে।

এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ওস্তাদজী সেতার ঢোলক তবলা লইয়া স্বয়ং সিন্দুকে ঢুকিয়া পড়িল। পড়িয়া বলিল,—“শীঘ্র চাবি দাও,—আর, রতন। (বাদক) তুমি ও-ঘরে গিয়া ব'স। কর্ত্তা যাই এ-ঘরে আসিবেন,—তুমি অমনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ঐ কাঁঠালগাছের আড়ালে বসিয়া থাকিবে।—আর গণেশ! (সুরেশের জমা-খরচ শিক্ষক)!—তুমি জমা-খরচের খাতা পাতিয়া বাবুকে সুদ-কশা শিখাও।”

উপদেশমত শীঘ্র সকল কার্য্য সমাধা হইল। গণেশ সম্মুখে দুইখানা জমা-খরচের খাতা রাখিল;—এবং কাগজ কলম দোয়াত লইয়া, সুরেশচন্দ্রকে সুদ-কশা শিখাইতে লাগিল।

গণেশ বলিতেছে,—“তিনবৎসর মেয়াদে একজন ৭১২॥০ টাকা ধার লইল। মাসিক সুদ টাকা প্রতি ৴২॥০ আড়াই পয়সা। তিন মাস অন্তর সুদ আসলে চড়িবে। দুই বৎসর পাঁচ মাস এগার দিন পরে কর্জ্জদার ব্যক্তি, বিষয় হস্তান্তরের

চেষ্টায় আছে। সুতরাং মেয়াদ তিন বৎসর থাকিলেও, এক্ষণে নালিষের কারণ হইল। বল দেখি, তুমি তাহার নামে সুদে-আসলে কত টাকার দাবীতে নালিষ করিবে?

সুরেশচন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে সুদ কসিতে লাগিলেন। গণেশ বলিতেছে, "সুদ, আসলে চড়িবে"—যেন মনে থাকে,—

এমন সময় ঠাকুরদাদা দ্বিতলের গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্বভাবতই তাঁহার রাগ কমিল। জিজ্ঞাসিলেন,—"সুরেশ! তুমি কি করিতেছ"?—

সুরেশ। আজ্ঞে, একটা সুদকসার ভয়ানক শক্ত অঙ্ক কসিতেছি।

ঠাকুরদাদা। কি অঙ্ক?

সুরেশ। এই এই—তিন মাস অন্তর সুদ,—আসলে চড়িবে।

ঠাকুরদাদা। তিন মাস অন্তর কেন?—এইরূপ হিসাব কর।—কর্জ্জিদার, তিন মাস অন্তর সমস্ত

সুদ চুকাইয়া দিবে। যদি না দেয়,—সুদের যদি পাই-পয়সা বাকি রাখে, তবে মাসে মাসে সমস্ত সুদ আসলে চড়িবে,—

সুরেশ। আজ্ঞে, তবে তাই কর্‌চি—

ইংরেজীলেখাপড়া ভাল হইল না দেখিয়া, ঠাকুরদাদা জমীদারীর কাজকর্ম্ম, এবং সুদ কসিবার হিসাবাদি শিখাইবার জন্য গণেশ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। গণেশ প্রথম-প্রথম মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া,—সুরেশকে সুদকসাদি শিখাইবার কিছু চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু শিখাইতে গেলে, চাকুরি থাকে না। কাজেই মাষ্টারও, ছাত্রের দলে মিশিল।

সে যাহা হউক, সুরেশের একান্তভাব দেখিয়া ঠাকুরদাদা সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, "সুরেশচন্দ্র যেরূপ মনোযোগের সহিত সুদের হিসাব শিখিতেছে, তাহাতে উহাদ্বারা ভবিষ্যতে বিষয় রক্ষা হইতে পারে।"

ঠাকুরদাদা, নাতিকে উপদেশ দিলেন, "এঘরের জিনিসপত্র যত্ন ক'রে রাখ্‌বে,—সতরঞ্জ, চাদর,

বালিস—প্রত্যহ রোদে দিবে। আমকাঠের এই বড় সিন্দুকটায় রুই ধরে নাই'ত?"

সিন্দুকের নামে সুরেশের মুখ শুকাইল।

ঠাকুরদাদা কিন্তু সিন্দুকের কথা ছাড়িলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ঐ সিন্দুকটী আমার লছ্মী। ঐ সিন্দুকে এক-শ-টাকা রাখ্‌লে দু-শ-টাকা হতো—"

এই বলিয়া ঠাকুরদাদা সিন্দুকের নিকট গিয়া স্বহস্তে সিন্দুকের ধূলা ঝাড়িতে লাগিলেন।

সুরেশের চক্ষুস্থির। ঠাকুরদাদা যদি বলেন,—"সিন্দুক খুলিব,—সিন্দুকটা কেমন আছে দেখিব,—" তাহা হইলে'ত মরিলাম। লোক রোগে মরে, দংশনে মরে, জলে ডুবিয়া মরে, আগুনে পুড়িয়া মরে, অস্ত্রাঘাতে মরে,—কিন্তু সিন্দুক খুলিলেই যে সুরেশ মরে,—এ কিরকম কথা?—কেমন শাস্ত্র? এদিকে সিন্দুকের ডালাটী তোলা হইবে, ওদিকে সুরেশের প্রাণটী উড়িয়া যাইবে,—এইবা কেমন হিসাব? হিসাবপত্র বুঝি না,—কিন্তু সুরেশ বস্তুত মৃত্যুই ভাবিতেছিলেন।

ওস্তাদজী অনেক-দেশ-দর্শী কিনা,—তাই অনেক দিন হইতেই তাঁহার একটু কাশীর ব্যারাম সঞ্চিত হইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে খুক্ খুক্ ক'ান।

সিন্দুকের ভিতর উপবিষ্ট ওস্তাদজীর অতি সামান্য মাত্রায় গলায় কাশীর আমেজ আসিতে লাগিল। কেহ চিন্তিত হইবেন না,—এ তেমন বেশী কাশী নয়,—বোধ হয় একবার খুব আস্তে আস্তে গলা-খেঁকারি দিলেই, এ কাশী সারিয়া যাইতে পারে।

ওস্তাদজী ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যদি এখন এ কাশীটা চাপিয়া রাখিতে না পারি,—তাহা হইলেত সর্ব্বনাশ! প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তবু কাশিব না।"

ওস্তাদজীর পেট ফুলিতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইল।

সিন্দুকের ভিতর সহস্র মশায় ওস্তাদজীকে দংশন করিল,—তবু তিনি নড়িলেন না। নড়িলে যদি শব্দ হয়!!

একটা কাঁক্‌ড়া-বিছায় ওস্তাদজীর পায়ে বিষম কামড়াইয়া দিল। ভয়ঙ্কর জ্বালা। ওস্তাদজী ভাবিলেন, সাপ নাকি? তিনি অন্তরে "উ-হু-হু, গেলাম,—" করিতে লাগিলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্থির করিলেন, কথা কিছুতেই কওয়া হবে না। যদি সাপ হয়, তবেত নিশ্চয় মরিব,—এখন কথা কহিয়া লাভ কি? যদি বিছার কামড় হয়, তবে জ্বালা দুই-চারি দণ্ডের পর নিশ্চয় নিবৃত্তি পাইবে। সুতরাং এখন কথা কহিয়া সব ফাঁক করি কেন?

কতকগুলা আরসুলা উড়িয়া ওস্তাদজীর গায়ে, মুখে, নাকে বসিতে লাগিল। দুর্গন্ধে নাড়ী উঠিবার উপক্রম হইল। ওস্তাদজী বিষম বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তথাচ তাঁহার বাক্যনিঃসরণ নাই। ধন্য ওস্তাদ!!

ওস্তাদজী লোক-মুখে শুনিয়াছিলেন, যেস্থানে সাপে কামড়ায়, সেস্থান বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের "সান্" থাকে না,—তথায় চিম্‌টী কাটিলে লাগে

না। তিনি সেই দষ্ট-পদটা একটু সরাইয়া চিম্‌টী কাটিয়া পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন। যাই পা সরাইবেন, অমনি একটু হুড়ুৎ করিয়া শব্দ হইয়া উঠিল।

সিন্দুকের দিকেই সুরেশের লক্ষ্য ছিল। এ শব্দ তখনই তাঁহার কাণে গেল। শব্দ শুনিয়াই তিনি অজ্ঞান-প্রায় হইলেন। তাঁহার সর্ব্ব-শরীরের যেন বাঁধন খুলিয়া গেল। যেন অন্তর্জলির সময় উপস্থিত!

সে শব্দ ঠাকুরদাদার কর্ণকুহরে অবশ্যই প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তিনি সুরেশকে জিজ্ঞাসিলেন,—"সিন্দুকে ইন্দুরে বাসা করে নাইত? সিন্দুকের ডালা খু'লে মধ্যে মধ্যে হাওয়া লাগাতে হয়—সিন্দুকের কাগজপত্র মধ্যে মধ্যে রোদে দিতে হয়!—সিন্দুক পরিষ্কার রাখিলে, তাহাতে কখন ইন্দুরও ঢোকে না, উইও ধরে না। নিয়ে এস'ত একবার চাবি-কাটীটে,—সিন্দুকটা খুলে দেখি।"

প্রকৃতই সুরেশের তখন কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত।

ওস্তাদজী ভাবিতেছেন, "এইবার প্রকৃতই বুঝি মুস্কিল বাধিল। কিন্তু সুরেশের যদি বুদ্ধি থাকে, তবে এখনও খানিক রক্ষা হয়। সুরেশ খানিক খুঁজিয়া বলুক্‌না কেন,—চাবিকাটী পাওয়া গেল না—হারাইয়া গিয়াছে। তা'হলে, ঠাকুরদাদা'ত সুরেশের আর মাথা নিতে পারবে না,—নাহয় একটু ধমকাবে। তারপর, কামার ডাকো, চাবি ভাঙ্গো, সিন্দুক খোলো,—সে এখন ঢের কালের কথা!! কিন্তু সুরেশের এ বুদ্ধিটুকু হবে কি?—অথবা আমারই চুক্ হইয়াছিল। সিন্দুকে ঢুকিবার সময় আমিই যদি সুরেশকে বলিয়া রাখিতাম যে, ঠাকুরদাদা চাবিকাটী চাহিলে,—ব'লো,—'হারাইয়া গিয়াছে,'—তাহা হইলেত এখন সব গোলই মিটিত। আমারই আহাম্মকি হইয়াছে।"

আর চাহিয়া দেখিতেছ কি? সুরেশের কপালে গঙ্গামাটী দাও, মুখে গঙ্গাজল দাও, কাণের কাছে হরি-সংকীর্ত্তন কর,—সুরেশের মৃত্যু সন্নিকট!

সুরেশের বাক্‌রোধ। "চাবিকাটী দিতেছি, কি

দিব, কি খুঁজিয়া পাইতেছি না,"—ঠাকুরদাদার কথায় তিনি এরূপ কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। যিনি মৃতপ্রায়, তিনি কথা কহিবেন কেমন করিয়া ?

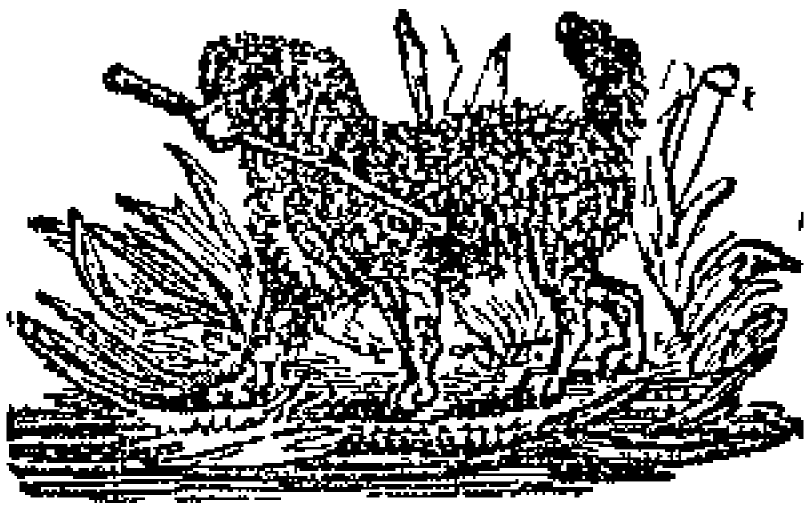

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরমায়ু থাকিতে মানুষ মরে না। সুরেশের আজও দিন ফুরায় নাই, তাই সুরেশ দৈবানুগ্রহে বাঁচিয়া উঠিলেন।

যে চাকর লম্বা-লম্ফে দৌড়িয়া আসিয়া, ঠাকুর-দাদার আগমনবার্ত্তা-বিষয়ে সুরেশকে প্রথম সংবাদ দেয়, সেই চাকরটাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা মোশাই, শীঘ্র আসুন,—ভাঁড়ার ঘরে সাপ বেরিয়েচে—"

চাকরের কম্পন।

কর্ত্তা। বলিস্ কিরে?—কি সাপ?—কি সাপ?

চাকর। মস্ত সাপ!—সে আর আপনাকে কি বল্‌বো!!

কর্ত্তা। কাকেও কামড়ায় নাইত?

চাকর। তাই বা কেমন করে বল্‌বো!—আপনি শীঘ্র আসুন। গিন্নি ডাক্‌চেন!

কর্ত্তা আগে আগে, চাকর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

বহির্বাটী এবং অন্দরের মধ্যস্থলে এক মাটীর ভাঁড়ার ঘর। এটী ঠাকুরদাদার তুঃখের দশার ঘর। সেকালে এই ঘরের একপাশে তিনি রাঁধিতেন, একপাশে শুইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘরটী লক্ষণ-যুক্ত বলিয়া ঠাকুরদাদা ভাঙ্গেন নাই।

ঠাকুরদাদা ত সাপ দেখিতে ছুটুন, এদিকে সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া সিন্দুকের চাবি খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, ওস্তাদজী সংজ্ঞাহীন। তাঁহার মুখটা হাঁ-করা; জিব্‌টা খানিক বাহির হইয়া পড়িয়াছে; নিশ্বাস বহিতেছে কি না সন্দেহ! চক্ষু তুটা মুদ্রিত। সুরেশ প্রথম দৃশ্যেই ভাবিলেন,—ওস্তাদজী বুঝি হাঁপাইয়া মরিয়াছেন। তারপর তাহার নাকের নিকট হাত লইয়া গিয়া দেখিলেন, এখনও মরেন নাই,—এখনও একটু একটু নিশ্বাস বহিতেছে। শেষে সুরেশ এবং তাঁহার শিক্ষক—উভয়ে ধরাধরি করিয়া,

সিন্দুক হইতে ওস্তাদজীকে বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। ওস্তাদজীর অবস্থা—তদ্বৎ,—নড়ন-চড়ন নাই,—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে যেন শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতই কি ওস্তাদজীর মরণ নিকট? তাহা নহে। ঠাকুরদাদা যখন সাপ ধরিতে গেলেন, ওস্তাদজী তখন ভাবিলেন,—সিন্দুক হইতে সহজ অবস্থায় আমার বাহির হওয়া হইবে না,—একটা পেঁচ দেখাইতে হইবে। আমি মড়ার মত হইয়া থাকি,—আমাকে তুলুক, বাতাস করুক, মুখে জল দিউক,—তবে আমার চেতন হইবে। সুরেশ যখন আমাকে পাখার বাতাস দিতে-দিতে বলিবে, 'ওস্তাদজী! আপনি আজ আমার জন্য বড়ই কষ্ট পেলেন।' আমি তখন বলিব, 'আপনার কার্য্যে প্রাণটাগেলেও আমি কোন কষ্ট বোধ করিতাম না। এ কষ্ট ত ছার!—আপনার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।' সুরেশ বালক। কিছুই বুঝিবে না। সে আমার কেনা-গোলাম হইয়া থাকিবে। শেষে, এই

সিন্দুকে ঢোকার দরুন অন্তত একশত টাকা পারিতোষিক আদায় করিয়া লইব।”

ওস্তাদজী যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। সুরেশ খুষি হইয়া, গুণে মোহিত হইয়া, উপসংহারে ওস্তাদকে নগদ দেড়শত টাকা এবং একখানা পুরাণ কাশ্মীরি-শাল বক্‌শীশ দিল।

ওস্তাদজীর নাম তারিণী। কি জাতি, তাহা কে জানে?—কিন্তু তাঁহার পৈতা আছে। বাঙ্গালী। পোষাকটা কিন্তু হিন্দুস্থানীর মত। কথা অধিকাংশ সময়, অপরিচিত লোকের সাক্ষাতে তিনি হিন্দীতে কহিয়া থাকেন। তিনি অনেককেই বলেন, আমার নিবাস গোয়ালিয়র। কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে বলেন, গোয়ালিয়রে বহুকাল বাস ছিল,—এখনও বাসা-বাটী তথায় আছে। আমিই গোয়ালিয়র-রাজাকে সেতার শিখাইতাম, কিন্তু রাজা একদিন একটু সামান্য কড়া কথা বলায়, আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

সেতার-বাজনা ব্যতীত, ওস্তাদজী অনেকানেক

উৎকট রোগের অনেকানেক উৎকট ঔষধ জানিতেন।

সে যাহাই হউক, ধনবান ব্যক্তির লেখাপড়া-বিহীন উঠন্ত-বয়স্ক বালক দেখিলেই, তিনি যেন চীলের ন্যায় ছোঁ মারিয়া থাকেন।

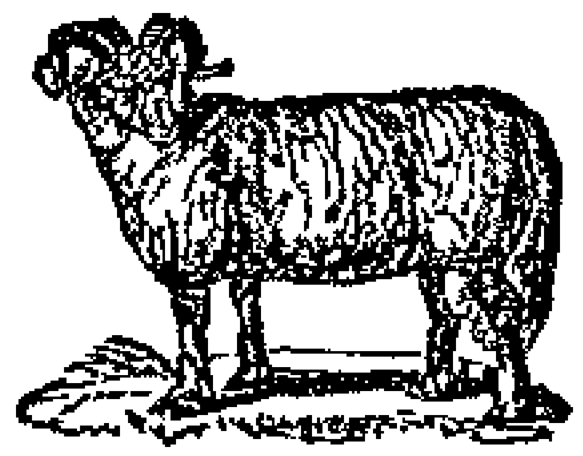

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যাউক। চাকর, ভাঁড়ার-ঘরের কতক মাটী খুঁড়িয়া ঐ সাপ, ঐ সাপ!—ঐ চক্কর, ঐ চক্কর!—এইরকম বুলি প্রথমত আরম্ভ করে। কাজেই তথায় লোক জমিয়া গেল। সকলেই বলিল, সাপ বটে,—তবে বাস্তু-সাপে কোন দোষ নাই। কেহ বলিল, আমি অমুক দিন ঠিক ঐখানে সাপ দেখিয়াছিলাম। কেহ বলিল,—একদিন আমি ঐ সাপের লেজে পা দিয়াছিলাম। কেহ বলিল, একদিন রাত্রে সাপটা আমাকে দেখিয়া সড়াৎ ক'রে চলিয়া গিয়া, ঐ গর্ত্তে সান্ধাইয়াছিল। গিন্নি সাপের কথা শুনিয়া কপাটের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, শীঘ্র কর্ত্তাকে ডেকে নিয়ে এস। তাই প্রভু-ভক্ত চাকর লাফাইতে-লাফাইতে দৌড়িয়া গিয়া, সুরেশের শ্রীমন্দির হইতে কর্ত্তাকে দৌড়-কাটাইয়া আনিল।

কর্ত্তা আসিয়া পৌছিলে, আরও অধিক লোক-সমাগম হইল। চাকর খুব উৎসাহে আবার মাটী-খোঁড়া-কার্য্য আরম্ভ করিল। কর্ত্তা চাকর্কে বলি-লেন, "দেখিস্, মান্কে! সাবধানে মাটি কাটিস্—সাপ্টা যেন উল্টে তোকে চোটায় না।" চাকর্ উত্তর দিল, "আমার গুরুর সেরকম আজ্ঞে নেই! দেখুন, আমি শীগ্গির সাপ ধরে নিয়ে যাচ্চি,—"

এইরূপ আধঘণ্টা অতিবাহিত হইল, সাপ ধরা পড়িল না। মাণিক কোথা হইতে খানিকটা সাপের খোলস্ আনিয়া কর্ত্তাকে দেখাইল। বলিল, "দেখুন, হুজুর!—এই খোলস্ দেখুন,—সাপ আজ ধরা পড়িবে না—কাল ধরিয়া দিব।"

সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে গেল। এমন সময় পতিত পরামাণিক উঁকি-ঝুঁকি মারিতে-মারিতে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল,—"কেমন কর্ত্তামোশাই! আমি যা বলেছিলাম, সব মিল্ল'ত?—"

কর্ত্তা। পতে! তোর মত মিথ্যাবাদী লোকত

আমি কোথাও দেখি নাই! তুই সোণার ছেলে সুরেশের মিছা কুৎসা ক'রে বেড়াস্! তোর কথা শুনে আমি দৌড়ে যেয়ে দেখি,—সোণারচাঁদ আমার, মন দিয়ে সুদকসা শিখ্‌চে,—তুই নচ্ছার-বেটা বলিস্ কিনা, সুরেশ সেতার বাজিয়ে ব'খে গেল! বেরো বেটা নাপ্‌তে আমার ঘর থেকে!—মিথ্যাবাদী!—

পতিত সম্ভ্রান্ত নাপিত। এরূপ গালাগালি হঠাৎ কোথাও বড় খায় না। বিশেষ, পতিত একটু ঠোঁট-কাটা এবং বিলক্ষণ মুখ-টান।

পতিতও যথাসাধ্য, যথাসম্ভব ক্রোধ করিয়া বলিল, "আর যা বলুন,—পতিতকে মিথ্যাবাদী বল্‌বেন না। পতিত গরীব ব'লে পতিতকে তুঘা মার্‌তে পারেন,—কিন্তু পতিতকে মিথ্যাবাদী বল্‌বেন না। আপনার মত ভদ্দর লোকের মুখে ও-কথা সাজে কি?—"

কর্ত্তা। পতে! তুই জানিস্, তোকে এখনি জুতিয়ে লম্বা করে দিব—

পতিত। তা মারুন না কেন?—পতিত-ত

তাতে পেছ-পাঁও নেই;—পতিত এই দাঁড়িয়ে রইলো,—জুতিয়ে লম্বা করুন, চেপ্টা করুন,—পতিত কোন কথা কবেন না। কিন্তু পতিতকে মিথ্যাবাদী বল্‌বেন না,—ও-কথাটী মুখ দিয়ে বার্ করবেন না!—পতিত, জেতে নাপিত বটে, কিন্তু সন্ধে-আহ্নিক না করে পতিত জল-গ্রহণ করেন না। অনেক কায়েত-বামুনের চেয়ে পতিতের নিষ্ঠে আছে। পতিতকে আর যা বলুন, সবই সহ্য হবে, কিন্তু পতিত যে, মিছে কথা কয়, একথাটী ব'ল্‌তে পাবেন না; একথা ব'ল্‌লে আপনার ধর্ম্ম থাক্‌বে না!

কর্ত্তা। বেটা, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এসে দাঁড়ালো গো!—বেরো বেটা বাড়ী থেকে—নহিলে এখনি জুতো খাবি—বেরো বেটা—

পতিত। (ঈষৎ শ্লেষের সহিত) বেটা কাকে বলে?

কর্ত্তা। লাগাও পঁচিশ জুতি!

কর্ত্তার ইঙ্গিতমতে পতিতের পৃষ্ঠে একজন

ভৃত্য মৃদুমন্দ-মনোহররূপে পাঁচ-সাত-দশ ঘা জুতা বসাইয়া দিল। পতিত ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে ক্রোধভরে বাহিরে আসিল। পতিত, চৌকাট ডিঙ্গাইয়াই অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বিড়্-বিড়্ করিয়া বকিতে আরম্ভ করিল,—“আঃ—মার্ অমনি পড়ে রয়েছে কি না?—ঘরে পূরে কে-না কাকে মার্‌তে পারে? ঘরে ঢুকিয়ে আমি অমন, রাজার বেটাকেও ঘাস কাটা'তে পারি! মহীরাবণ, পাতালে ঢুকিয়ে রামচন্দরকেও মেরেফেল্‌তে গেছলো!—ওঃ, কি আমার মার্ গো?—পথে এসে একবার মারুন না দেখি?” এইরূপ সমস্ত রাস্তা বক্‌বক্ বকিতে বকিতে শ্রীলশ্রীযুক্ত পতিতপাবন পরামাণিক মহাশয় বাসা অভিমুখে চলিলেন।

পতিতকে একজন জিজ্ঞাসিল, “পতিত! কি হয়েছে? আপনা-আপনি অমন বক্‌চো কেন?”

পতিত উত্তর দিল, “বকি কি আর সাধে? এই,—দাওয়ানজী মোশায়ের সঙ্গে জুতোজুতি হযে গেল,—তা কি বল্‌বো, আমি একা ছিলাম।

সঙ্গে একজনও লোক থাক্‌লে, পতিত কি সহজে ফিরে আসিত?"

এরূপ কিংবদন্তী, পতিত সেদিন ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইয়াছিল।

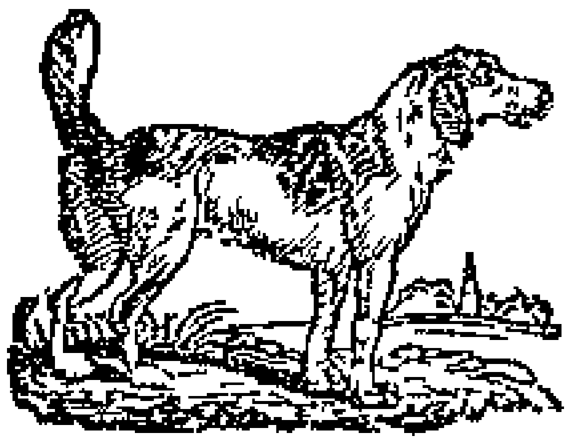

## নবম পরিচ্ছেদ।

পতিতকে জুতা-মারার দিন হইতে ঠাকুরদাদার ধ্রুব-ধারণা হইয়াছিল,—সুরেশ অতি সৎ ছেলে—উহার যোড়া নাই,—হিংসায় কেবল কোন কোন লোকে উহার বদনাম রটায়।

ইহার উপর, ঠাকুরদাদা সুরেশকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। কাজেই সুরেশ যা করেন, তাই তাঁহার ভাল লাগে; সুরেশ যা চাহেন, তাই তখনি পান; সুরেশের দোষ, তাঁহার চক্ষে গুণ বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া, সুরেশ নগদ টাকা চাহিলে, ঠাকুরদাদার নিকট যে প্রাপ্ত হইতেন, তাহা নহে। সুরেশও বুদ্ধিমান, কখন নগদ টাকা চাহেন নাই। নগদ টাকার রোজগার অন্য উপায়ে হইত। এই দেখুন,—সুরেশ বলিলেন, আমি স্কুলে আর পড়িব না। ঠাকুরদাদা একটীবার মাত্র বলি-

লেন, "স্কুলে পড়্‌বে বৈকি? স্কুলে না পড়্‌লে হয় কি?" সুরেশ অমনি কাঁদ-কাঁদ হইলেন। ঠাকুরদাদা আর থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, থাক্—তুমি ঘরে বসেই পড়। আর, বেশী ইংরেজী পড়িবারই তোমার আবশ্যক কি? ঘরে ব'সে জমীদারীর কাজ শিখ। আমি তোমার জন্যে যা রেখে গেলাম, কাজ-কর্ম্ম-শিখে বজায় রাখ্‌তে পার্‌লে, তোমার ছেলের ছেলে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খেতে পার্‌বে।"

স্কুল-পরিত্যাগের কিছুদিন পরে, সুরেশ ধরিলেন, গোহালবাড়ীতে আমি বসিব,—ঐখানে বসেই আমি জমা-খরচ লিখিব, সুদকসা শিখিব।

ঠাকুরদাদা, ঈষৎ দূরস্থিত বাগান-বাটীটী আরব্ধ-যৌবন পৌত্রকে প্রথমে দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। সুরেশচন্দ্র না-ছোড়বন্দ হইলেন,—কেননা ঠাকুরদাদার চক্ষু-কর্ণের অগোচরীভূত, অশ্রুত, নির্জন বৈঠকখানা না পাইলে, সুরেশের সুবিধা হয় না। একদিন রাষ্ট্র হইল, সুরেশ রাগ

করিয়াছেন, ভাত খান নাই। গৃহে হুলস্থুল পড়িল। গৃহিণী কর্ত্তাকে উপরোধ ধরিলেন, "তাতে দোষ কি? ছেলে গোয়াল-বাড়ীতে থাক্‌তে চাচ্চে, থাকুক না কেন?—তুমিত সব বোঝনা! বল্‌তে নেই, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে,—ছেলে এখন ডাগর হয়েচে, তোমার সাক্ষাতে দিনরাত কি বসে থাক্‌তে পাবে?"

কর্ত্তা। কি জান, চোখে চোখে রাখ্‌তে হয় নানা কারণে—

গৃহিণী। (জিহ্বা কাটিয়া) না,—না,—সে কথা বলোনা,—সুরেশেব আমার, কোন দোষ নেই,—বাছা আমার চোখ্‌ চেয়ে দেখ্‌তে জানে না। অমন ছেলে কি জন্মায়?

কর্ত্তা। তা, আমি জানি, সুবেশের কোন দোষ নাই। ছেলে খুবই ভাল। তবে কি জান,—সুরেশ বংশের একমাত্র তিলক; ও বই আর কেউ নাই; ও-ই আমার একমাত্র ভরসা—তাই আমার ভয় হয়, যদি,—

গৃহিণী। অমন ছেলের উপর সন্দেহ করতে নেই! মিছে সন্দেহ কল্লে ছেলের অকল্যাণ হয়!—

আর বিশেষ কিছুই বলিতে হইল না। সুরেশচন্দ্র সেইদিন হইতে গোয়ালবাড়ীব অধিকারী হইলেন। সেইদিন হইতে সুরেশচন্দ্রের হৃদয়েব স্ফূর্ত্তি যোলকলায় প্রস্ফুটিত হইল। সেইদিন হইতে আকাশে সুধাংশু হাসিল, বাঁশীর মধুর-রবে যমুনা উজান বহিল। সেইদিন হইতে সুরেশ-চন্দ্রেব শুষ্ক-পৃথিবী, সরস স্বর্গ হইল।

বালককাল হইতেই সুরেশ, ঠাকুরদাদার সহিত একত্র অন্নাহার করিতেন। কিন্তু সুরেশ ক্রমশ এই একত্র আহাররূপ কার্য্য হইতে অবসর লইবার চেষ্টায় রহিলেন। ঠাকুরদাদা যোদ্দা খাবার পূর্ব্বে “সুরো সুরো” করিয়া ডাকেন। কারণ সুরো কাছে বসিয়া না খাইলে, তাঁহার ভাত ভাল লাগিত না। সুরেশকে অনেক সময়ই ডাকাডাকিতে বাধ্য হইয়া আসিতে হয়, কর্ত্তার কাছে বসিয়া খাইতে হয়। ক্রমে শিকল কাটিবার বন্দোবস্ত

হইল। প্রথম ৭ দিন অন্তর ১ দিন কামাই। শেষ ১ দিন অন্তর সাত দিন কামাই।—এই ভাবে ঠাকুরদাদার সহিত আহার চলিতে লাগিল। শেষে সব ফুরাইল। এক্ষণে নাতী এবং ঠাকুরদাদা স্বতন্ত্র সময়ে স্বতন্ত্র স্থানে আহার করেন। তবে যেদিন আহারের কোনরূপ বিশেষ উদ্যোগ হইত, অথবা কিছু নূতনত্ব থাকিত, সেদিন ঠাকুরদাদার আজ্ঞানুসারে উভয়েরই একত্র একস্থানে আহারের স্থান হইত। সুরেশও ইহাতে কিছু বিশেষ আপত্তি করিতেন না।

অদ্য কালাচাঁদ আহাব করিবেন। ঠাকুরমা কালাচাঁদকে দেখিবার জন্য চিরদিনই বড়ই ব্যাকুলা ছিলেন। যে কালাচাঁদের বাপকে তিনি স্তন্যদুগ্ধ দিয়া মানুষ করেন, সে কালাচাঁদকে যে, তিনি একটী দিনও খাওয়াইতে-মাখাইতে পান নাই—ইহাই তাঁহার অন্তরের দুঃখ। প্রাতে কালাচাঁদের আগমন-মাত্র কর্ত্তা বাটীতে চাকর দ্বারা গিন্নিকে বলিয়া পাঠান "গিন্নিকে ব'লো,—তোমার ছেলে-

সোণা এসেচে,—এই-খানে খাবে।” ঠাকুরমা, কালাচাঁদের নাম শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলেন,—এবং যোড়শোপচারে আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে কর্ত্তাও গৃহে গিয়া গৃহিণীকে বলেন, “কালাচাঁদের জন্য উত্তমরূপ আহারের যোগাড় করিও।” গৃহিণী উত্তর দেন,—“সে কথা কি তোমাকে শিখাইতে হইবে? আমি সাধ্যমত কিছুরই ত্রুটী করিব না।” তথাচ তখন কর্ত্তা গৃহিণীসমভিব্যাহারে স্বয়ং রন্ধনশালায় গিয়া আহারের সুবন্দোবস্তের বিষয় আরও একবার স্বমুখে বলিয়া আসিলেন।

অদ্য আহারের বিশেষ উদ্যোগ; কাজেই সুরেশও একসঙ্গে আহার করিবেন।

কালাচাঁদকে প্রথম দেখিয়া ঠাকুরমার যখন পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়াছিল, হর্ষ-বিষাদে যখন তাঁহার দু-নয়নে দশ-ধারা বহিতেছিল, তখন ঠাকুরদাদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সুরেশ এসেচে কি?”

ঠাকুরমা। স্থরোকে ডেকে এসেচে—এ বলে! ঐ যে আস্‌চে—খড়মের শব্দ পেয়েচি!

## দশম পরিচ্ছেদ।

সুরেশ হেলিয়া-তুলিয়া, ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া, কোমর ঘুরাইয়া, আসিতেছেন! পরিধান উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র। গায়ে আঙরাখা,—কি কাপড়ের তৈয়ারি তা জানি না,—কিন্তু তা দিয়া সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বস্ব দেখা যাইতেছে! গলায় সোণার হার। অঙ্গুলে হীরক অঙ্গুরী। বাউরি চুল। কচি-কচি দিব্য গোঁফের রেখা। অধরোষ্ঠ টুক্‌টুকে লাল। গণ্ডস্থল বেশ গোলগাল হইলেও, কেমন যেন ঈষৎ চড়িয়ে-ভাঙ্গা। নয়ন আয়ত বটে, কিন্তু কোল কেমন বসা। বক্ষ প্রশস্ত। কটীতট ক্ষীণ। নাসিকা ী‍ ষ্ণের বাঁশরী। বর্ণ গৌর।

সুরেশচন্দ্র নব-কার্ত্তিকটীর ন্যায় আসিতেছেন । কিন্তু ভাব কেমন বিমর্ষ-বিমর্ষ বা বেজার-রি! সুরেশ বোধ হয় ভাবিতেছেন, "কে ন, আজ কোথা থেকে কে একটা লোক

এসেছে,—তার সঙ্গে ব'সে একত্র খেতে হবে!! লোকটা কি জাত, তার ঠিক নাই,—তবু তার সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করিতে হবে। ঠাকুরদাদাব যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নাই, যাকে-তাকে অমনি বাড়ী ঢুকিয়ে ফেলেন! যেরকম শুন্‌লেম, তাতে'ত লোকটা নিশ্চয়ই হাড়ী বা বাগদী হবে! লোকটা যক্ষা কালো, গায়ে গন্ধ, চুলগুলো ঝাঁকড়-মাকড়,—আঙ্গুলগুলো শক্ত যেন বাকারি! আমি ওব সঙ্গে একত্র ব'সে কথনই খাবো না—আজ না হয় উপ'স ক'রে থাক্‌বো,—ঠাকুরদাদাকে বল্‌বো, আমার জ্বর হয়েচে।" না,—জ্বরের কথা বলা হ'বে না।—ঠাকুরদাদা—যদি নাড়ী দেখে ফেলেন—তবেই গোল হবে। বলবো,—পেটকাম্‌ড়াচ্চে। আচ্ছা, দেখা যাউক,—শেষে যা হয়, একটা এক-রকম স্থির করা যাবে।

বোধ হয় এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়াই সুরেশচন্দ্র আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দর-দালানে উঠিয়া দুর হইতে কালাচাঁদমূর্ত্তি দেখিয়াই

তিনি অবাক্। সুরেশের চক্ষে কালাচাঁদ এইরূপ প্রতীয়মান হইলেন,—"রংটা কালো মিস্‌মিস্ করিতেছে, মোটা-সোঁটা কুঁদিকাটা মুষ্কি জোয়ান, গোল-গোল রাঙ্গা-রাঙ্গা চোখ্ দুটা কুমারের চাকের ন্যায় কেবল ঘুরিতেছে, দাঁতগুলা কিড়্‌মিড়্ করিয়া যেন তাঁহার হৃদপিণ্ড কামড়াইতে আসিতেছে।"

সুরেশ মনে মনে কহিলেন, "এটা কি মানুষ, না ভূত? এমন জানিলে এখানে কে আসিত?—ঠাকুদ্দা এবং ঠকুমা দু-জনেই রয়েচেন, পালাইবা কেমন করিয়া?"

অগত্যা সুরেশ নিকট আসিতে বাধ্য হইলেন। আগমনমাত্র ঠাকুরমা স্নেহভরে সুরেশচন্দ্রকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "অ,—সুরো। তোর দাদা এসেচে দেখেচিস্,—পেন্নাম কর্—"

সুরেশের চক্ষুস্থির। মনে মনে কহিলেন,—"ইনি আবার দাদা!!—তবেইত গিয়াছি।—"

ঠাকুরদাদা। ইহাঁর নাম কালাচাঁদ। তুমি

এঁকে বোধ হয় এখন চেনোনা; ছেলেবেলায় তুমি একবার-মাত্র দেখেছিলে। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের পৌত্র। তোমার দাদা। ইহাঁকে প্রণাম কর।

কর্ত্তা এবং গৃহিণী উভয়েই যখন অনুরোধ করিলেন, তখন সুরেশ আর থাকিতে পারিলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, হৃদয়ে "হরি রক্ষা কর, হরি রক্ষা কর" বলিতে বলিতে, তিনি কালাচাঁদের পদপ্রান্তে আপন মস্তক নমিত করিলেন। কালাচাঁদও সুযোগ সুবিধা ছাড়িবার লোক নহেন। প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র, তিনি সুরেশের সহিত অমনি কোলাকুলি যুড়িয়া দিলেন। সে বড় সহজ কোলাকুলি নহে;—সাত দিন সুরেশের গায়ে ব্যথা ছিল। গায়ের ব্যথায় সুরেশের বিশেষ কষ্ট নাই;—কিন্তু কোলাকুলি কালে যে তাঁহার বাউরি-চুল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, ইহাতেই তিনি মর্ম্মাহত হইলেন।

সুরেশ ভাবিলেন, "দর্শনেই এই ব্যাপার,—না-জানি একত্র ভোজনে আরও কত বিভ্রাট-

বিপত্তি আছে! আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, বলিতে পারি না! এ কালসাপকে, এ যমদূতকে কেন ঠাকুদ্দা ঘরে ঢুকিতে দিলেন? উঃ, মূর্ত্তি দেখ, ঠিক যেন কালভৈরব!”

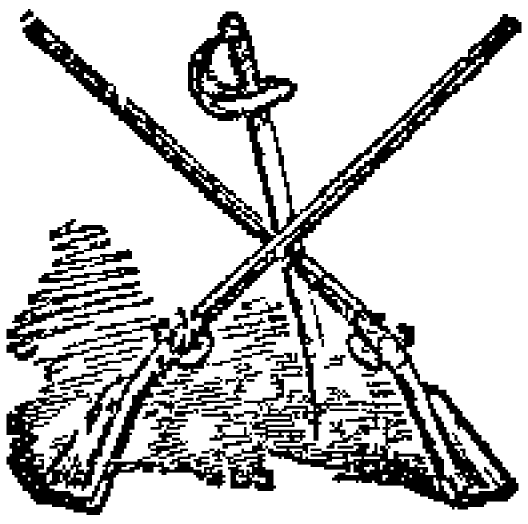

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদের ক্ষুধা ক্রমশই বর্দ্ধনশীল। সমুদ্র শুষ্ক হইয়াছে,—পূর্ণ করিতে হইবে।

কর্ত্তা, গৃহিণী, এবং পৌত্রদ্বয়—চারিজনে ভোজন-গৃহেব সমীপবর্ত্তী হইলেন। সুরেশের মাতা সে ঘর হইতে সরিয়া গিয়া, ঈষৎ অন্তরালে দাঁড়াইলেন। সে ঘরে রহিল কেবল দুইজন পাচিকা-ব্রাহ্মণী।

কালাচাঁদের দৃষ্টি আহারেব দিকে। দূর হইতে দেখিলেন,—ঘরটী কেবল বাটী, থাল, রেকাবীতে ভবা। সবই সাদা-পাথরের—সাদা ধপ্‌ধপ্ করিতেছে। কালাচাঁদেব হৃদয়ে আর আনন্দ ধবে না। উদর! আর খাইতে পারি না, বলিও না!—যত আশ, যত সাধ,—আজ ষোলকলায় সম্পূর্ণ কবিয়া লও। রসনা! রস-সাগরে ডুবিয়া থাক; হাঁপাইলাম, বলিতে পাইবে না।

সারি সারি তিনখানি আসন; ঈষৎ দূরে-

## নাতি ঠাকুরদাদার ভুরি-ভোজন।

ARTIST PRESS

আজও আচমনে বিলম্ব ঘটিতেছে। কেননা—কালাচাঁদ।

বিলম্ব ঘটায় কালাচাঁদের সুবিধা হইল। তিনি দেখিয়া দেখিয়া, সামগ্রী-পত্র চিনিয়া লইবার অবসর পাইলেন। প্রথম দৃশ্যে তিনি দেখিলেন,—বাটী-রেকাবী'ত একশতেব কম কিছুতেই নহে,—কিন্তু উহাতে এতটুকু-এতটুকু করিয়া জিনিস কেন? মুগের ডাল আধ ছটাক, বুটের ডাল আধ ছটাক, কড়ায়ের ডাল আধ ছটাক, মুসুরিব ডাল আধ ছটাক,—ডাল'ত চারি রকম!—কিন্তু মালে যে ফাঁক! এর চেয়ে আদা ও হিং দিযে কেবল একবাটী কড়ায়েব ডাল দিলে'ত বেশ হইত! কাজ কি ছাই মুগের-ডেলে?—উহা'ত রোগার পত্তি!—আমি কি কাহিল, না রোগ থেকে উঠেচি, না আমার হজমশক্তি কম?—যে, আমাকে অতটুকু মুগের ডাল দিয়েচে!! উটুকু কি?—মাছের ঝোল বুঝি! যাই হউক, উটুকুকে'ত নশ্যি করিলেই হয়! ইনি বুঝি সুক্তানি,—ফুঁদিলে উড়ে যান! ঐটী বুঝি গুড়-অম্বল,—ফোঁটা কাটি-

লেই হয়। ঈস্,—উনি বুঝি খয়রা মাছ ভাজা,—যেন একটী টীকৃটীকির ছানা। আরে খেলে যা,—একখানা ধূমো ফুলকাটা রেকাবি ক'রে সিকিভরি ওজনেব দু-গাছি শাকভাজা কেন?—নিশ্বাসে উড়ে যাবে যে। আর, এসবের ওদিকে সারি-সারি যে সব বাটী সাজান রয়েচে, ওগুলাতেই বা কি আছে? সুমুখে যে সব বাটী রয়েচে, তার দু-চারিটা বুঝিলাম, দশ-বিশটা না হয় না-ই বুঝিলাম,—তরকারী-ফরকারি মাথামুণ্ডু যা-হোক কিছু একটা হবে!—মোদ্দা, ঐ গুলো কি?—সারি-সারি থাকে-থাকে যে সাজান, ওর ভিতর কি আছে?—বু ক্ষীর-ছানা-ননি হবে,—পায়েস ও আছে, বোধ হচ্চে ঐটে যদি পায়েস হয়, তাহলে'ত খড়কে ক'রে জিবে ঠেকাতে হবে। আচ্ছা, আমি কি পাখী? ঠোঁটে ঠেকাতেই যে, পায়েসে কুলাবে না।—ছি! কেবল ধাষ্টেম! না, নাতি ব'লে ঠাকুদ্দা তামাসা কোচ্চেন? যেমন আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, তেমনি তার প্রতিফল পাইলাম। এই, সবগুলা এক করিয়া

খাইলেও যে, গলা ভিজিবে না। এক কলসী জল চাই,—এ, শিশির কুড়াইয়া কলসী কত পূরাইব ?

যাউক। তরকারির জন্য তত এসে-যায় না! ভাত আনিলে, ভাত কিছু বেশী করিয়া চাহিয়া লইয়া খাইব। তরকারির অভাব ভাতে পূর্ণ করিব। ঠাকুরদাদা তরকারিতে যেরূপ সরু কাটিয়াছেন, ভাতেও ত সেইরূপ সরু কাটিতে পারেন। তা কাটেন কাট্‌বেন,—আমি কিন্তু চক্ষুলজ্জা খাইয়া আবার দ্বিগুণ ভাত চাহিয়া লইব। আগে উদরের তৃপ্তি, তারপর চক্ষুলজ্জা।

এদিকে ঠাকুরদাদার আচমন শেষ হইল। আচমনান্তে ঠাকুরদাদা বলিলেন, "কালাচাঁদ! তুমি আমার জন্য খেতে এত দেরী কচ্ছিলে কেন? আমার কি জান,—৺লক্ষ্মী-নারায়ণে সমুদায় বস্তু অর্পণ ক'রে, তবে আমি খেতে পাই! সেই রাধা-বিনোদন, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণকে দিলেই আমার খাওয়া হয়! আহা! রাধিকা-রমণের প্রসাদ,—

অমৃত, অমৃত।।—কেলেসোণা! তবে খেতে ব'স। সুরেশ। তুমিও খাও,—"

কালাচাঁদ সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন,—"ঠাকুবদাদাটা বলে কি?—ভাত কৈ?—যে, খাব! খাই কি?—ভাত নাই, কেবল তরকারি খাইয়া থাকিব নাকি? এ,—যে, মহামুস্কিল বাধালে দেখচি! আচ্ছা দেখিনা,—ঠাকুরদাদাটা আগে কোন্ তরকারিটে খায়।"

কালাচাঁদ দেখিলেন, ঠাকুরদাদা একটা মেটে-রঙের তবকারি হাতে করিয়া ভাঙ্গিতেছেন। ভাঙ্গিয়াই তিনি কালাচাঁদকে বলিলেন, "কেলেসোণা! এই পোলাওয়ে আচ্ছা করিয়া নেবু মাখিয়া খাও! পোলাও বড় গরম জিনিস। দিন-সময় বড় খারাপ পড়েছে।—সুরেশ। তুমি সাবধান!"

এতক্ষণে কালাচাঁদ সব বুঝিলেন। বুঝিলেন, অদ্য ভাত নয়,—পোলাও। বুঝিলেন, এ সব তামাসা নয়, সত্য বিষয়। বুঝিলেন, ইহা ইন্দ্রজাল নয়, প্রকৃতই অন্নব্যঞ্জন। বুঝিলেন, দুই দিন ত

অন্নাহার হয়ই নাই, এ, তৃতীয় দিনও বুঝি অনাহারে থাকিতে হইল।

কালাচাঁদ প্রথমে বস্তুতই পোলাও চিনিতে পারেন নাই,—তাই তখন "ভাত ভাত" করিতে-ছিলেন! একখানি বৃহৎ থালের উপর প্রকৃতই একমুঠা আন্দাজ পোলাও ছিল। তাহাও অমনি-একটু চূড়-করিয়া নৈবেদ্যের মত বাড়া। কালা-চাঁদ মনে করিয়াছিলেন, ইহাও বুঝি কোন এক-রকম তরকারি হইবে! ভাতই হউক, আর পোলাওই হউক,—শুদ্ধ ঐ-কটী যে, কেহ বাড়িয়া একজন যুবা পুরুষের সম্মুখে ধরিবে,—ইহা তিনি কখনও ভাবিতেও পারেন নাই।

যাই হউক,—ঠাকুরদাদার ইঙ্গিত পাইয়া, কালাচাঁদ সেই পোলাও ভাঙ্গিলেন; ভাঙ্গিয়া, ঠাকুরদাদার দেখা-দেখি, গণা দুটী ভাত প্রথম মুখে দিলেন। তারপর, চারিটী। তৎপর, ছয়টী। অবশেষে আটটীর হিসাবে মুখে উঠিতে লাগিল।

পাঁচ সাতবার ঐরূপ অন্ন মুখে দিয়া, কালাচাঁদ

চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এরূপভাবে শুষ্ক হইয়া থাকিবার আবশ্যক কি? আরও পোলাও চাহিয়া লই না কেন? এ বিষয়ের যুক্তি কি?"

কালাচাঁদ পুনরায় চিন্তা করিলেন,—"আবার যদি পোলাও চাই, তাহা হইলে, যতগুলি পোলাও প্রথমবারে দিয়াছে, এবার তাহার অর্দ্ধেকগুলি দিবে। তারপর যদি চাই, না-হয় আবার ততগুলিই দিল। ফের যদি চাই, না-হয় আরও ততগুলি পোলাও দিল। কিন্তু, তা হলেই বা কি হচ্চে? তা'তেই বা কোন্ আমার পেট ভর্‌বে? অতকটা করিয়া ষোল-দুগুণে বত্রিশবার দিলেও যে, আমার কিছু হবে না। তবে আর দ্বিতীয়বার পোলাও চাহিয়া ফল কি? চাহিলে জাত যাইবে, পেট ভরিবে না,—অতএব না চাওয়াই স্থির-সিদ্ধান্ত! বরঞ্চ এমত হাত দেখাই যে,—যতটুকু পোলাও দিয়াছে, উহার দশ-আনা ভাগ পাতে রাখি, ছয়-আনা ভাগ মাত্র খাই। ঠাকুরদাদা যদি বলেন, 'কালা-চাঁদ! পাতে পোলও পড়ে রইল যে, আর একটু

খাওনা' আমি উত্তর দিব, 'ক্ষুধা নাই,—যাহা খাইয়াছি, তাহাতেই উদর পূর্ণ হইয়াছে।'

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ তখন হৃষ্টচিত্তে খাইতে আরম্ভ করিলেন।

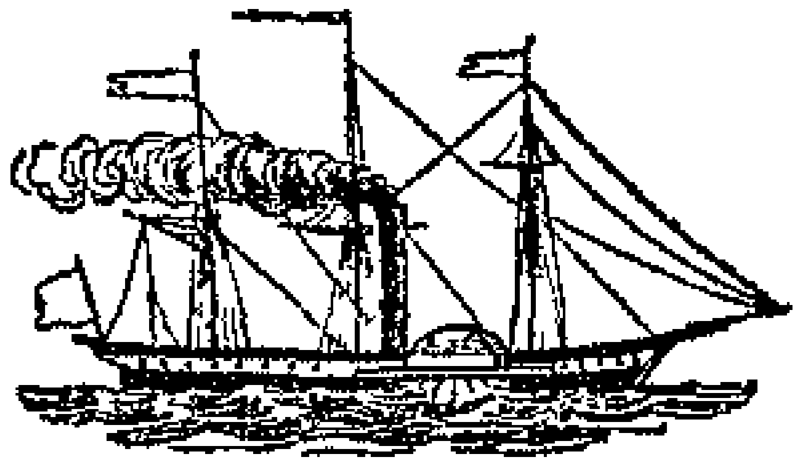

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এমন সময় ঠাকুরমা একজন পাচিকা-ব্রাহ্মণীর সহিত একটা বড় রুইমাছের মুড়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরদাদা যখন আচমনে বসেন, ঠাকুরমা তখন রন্ধনশালার দিকে গমন করেন। মাছ বনাইবার সময় ঠাকুরমা আপনা-আপনি একবার বলিয়াছিলেন, এই বড় মুড়াটা কালাচাঁদ খাবে। কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বিশেষ-রূপে এ-কথা তিনি বলেন নাই। যখন পোলাও প্রভৃতি পাত্রে সজ্জিত হয়, সুরেশের মা বলেন, 'এ বড় মুড়া কাহাকেও দিয়া কাজ নাই,—এখন রাখো,—কর্ত্তা যদি বলেন, তবে যাহাকে হউক দেওয়া হইবে।' সুরেশের মা জানিতেন,—'কর্ত্তা নিজে মুড়া খান না, সুরেশের পাতে মুড়া দিলেও তিনি রাগ করেন;—বলেন, রুইমাছের মুড়া বড় তৈলাক্ত; উহা খাইলে হজম হয় না, পেট

ফাঁপে, আমাশয় হয়। বিশেষ, রুয়ের মুড়ো খাইয়া অমুক ব্যক্তির ওলাউঠা হইয়াছিল।' এতৎকারণ নিবন্ধন বড় মুড়া কাহাকেও প্রথমে প্রদত্ত হয় নাই।

ঠাকুরমা ঘরের ভিতর আসিয়া, কালাচাঁদের পাতে মুড়া না দেখিয়াই, পাক-শালায় দৌড়িয়া ছিলেন। তথা হইতে মুড়া, আরও কয়েক খানা মাছ, এবং ঝোল, ব্রাহ্মণীকে দিয়া লইয়া আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন, "বড় মুড়া,—এই কেলেসোণাকে দাও।"

কালাচাঁদ তখন পোলাও ভোজনের মজায় বিভোর!—অন্তরে হাসিয়া ঠাকুরমাকে বলিলেন,—"উঃ, আমার খুব পেট ভরেচে,—আমি আর কিছু খাইতে পারিব না—"

ঠাকুরদাদা এই মুড়া-ঘটিত ব্যাপার অবলোকন করিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"কি—ও," "কি—ও"

ঠাকুরমা। বড়মুড়া কেলেসোণা খাবে—

ঠাকুরদাদা। তা, দাও—কিন্তু মুড়া বড়ই গরম-জিনিস! কিহে কালাচাঁদ! খেতে পার্‌বে'ত?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, না। যা খেয়েচি, তাহাতেই ছাতি-সমান হয়ে উঠেচে—

ঠাকুরমা। হেঁরে,—কেলেসোণা! তোর খাওয়া অমন উড়েগেল কেন?—এই ছেলে বয়স,—এখন খাবিনা'ত, খাবি কবে? আমি বল্‌চি,—তুই খা, কোন অসুখ্ ক'র্‌বেনা!

পাচিকা, গৃহিণীর ইঙ্গিত-মত, কালাচাঁদের সম্মুখে সমুড়া-সমাছ-সঝোল বাটী রাখিল।

ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন, "কেলেসোণা! আমার দিব্য, তোকে খেতে হবে! তোব নাম ক'রে, বাছা! মুড়া বনান হয়েচে,—ও মুড়া কি আর কাকেও খেতে আছে?"

কালাচাঁদ তখন যেন বিশেষ অনুরোধে পড়িয়াই, বাধ্য হইয়া, না-পারি—না-পারি করিয়া, দু-আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা মুড়ার একটু কোন্ ঈষৎ খুলিয়া, তাহারই অর্দ্ধেক-টুকু একবার মুখে দিলেন।

ঠাকুরমা। কেলেসোণা! পোলাওয়ে একটু ঝোল মেখে খা,—এখনও যে অনেক পোলাও রয়েচে,—খেলি কৈ?

কালাচাঁদ। কি বল্‌বো,—ঠাকুমা।—আমি এখন আর খেতে পারি না,—বিশেষ, আজ আবার খিদে নাই।

ঠাকুরদাদা। যা পারো, তাই খেও,—ওঁর (ঠাকুরমার) কথা শুনে যেন বেশী খেওনা—

কালাচাঁদ। আজ্ঞে,—না। তা কি কখন হয়?

ঠাকুরমা। হাঁ—হাঁ—ওঁর (ঠাকুরদাদার) কথা তোর শুন্‌তে হবে না। উনি সব্ জানেন কি না? উনি নিজে কিছু খেতে পারেন না, তাই মনে করেন, বুঝি আর কেহই খেতে পারে না। এই উঠন্ত-বয়সে, বাছা! তুই কি আর একটা গোটা মুড়ো খেতে পারিস্ না?

কালাচাঁদ। ঠাকুমা! আগে আগে আমি খুব খেতে পাত্তাম,—এখন কেমন হয়েচে, অন্ন আর মুখে রোচে না। তবে তুমি বল্‌চো,—আর একটু খাই—

এই বলিয়া কালাচাঁদ মুড়াটী লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—"হায়! ক্ষুধায় প্রাণ বাহির হইয়া যায়, অথচ এ মুড়া—এমন বৃহৎ, ঘৃতাক্ত, সরস, সুমিষ্ট মুড়া, আমার খাইবার যো নাই! এমন বিড়ম্বনায়, এমন খয়ে-বন্ধনে কখন'ত পড়ি নাই! মহারত্ন করতলগত, অথচ আমি দীন-দরিদ্র! সবই আছে, কিন্তু কিছুই নাই! এ, কি—এ?"

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ, মুড়ার গা হইতে আঙ্গুলে করিয়া একটু ঝোল লইয়া, পোলাওয়ে মাখিয়া গুটী-আষ্টেক অন্ন মুখে দিলেন।

ঠাকুরদাদা। সাবধান! কেলেসোণা! সাবধান! একটু হাত-রেখে! জান'ত, এর উপর আবার পায়েস-পিষ্টক আছে।

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, হাত খুবই রেখেচি,—। আর, পায়েস-পিষ্টক'ত আমি খাই-ই না। পিটে খেলেই অম্বল হয়,—বুক জ্বালা করে!—

ঠাকুরদাদা। বটে, বটে—ঠিক কথা,—বল কি?

তবে পায়েস-পিষ্টক তোমার ছোঁয়া হবে না—আমারও ওতে অম্বল হয়।

ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদার উপর কৃত্রিম কোপ করিয়া বলিলেন,—"তুমি চুপ করে থাক্'ত। বাছা খাচ্চে, খাগ্ না?—তুমি অমন টীক্‌টীক্ কর্‌লে, বাছা খেতে পার্‌বে কেন? কেলেসোণা! তুমি ওঁর কথা শুন না,—তুমি যত পার, তত খাও।"

কালাচাঁদ ঠাকুরমাকে "খাইতেছি" বলিয়া, একবার মুড়ায় অঙ্গুলি-চতুষ্টয় বুলাইয়া তাহাই মুখে দিলেন।

লোল রসনা লোলুপ। কিন্তু উপায় নাই। জঠর দাবানল জ্বলিতেছে,—নির্ব্বাণ হইবে কিসে? ক্ষুধায় শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে,—মহৌষধ মিলিবে কোথা? হাই উঠিতেছে, চোখে জল পড়িতেছে, কাণ ভোঁ ভোঁ করিতেছে,—করিব কি?—যাইব বা কোথায়?

কালাচাঁদের কষ্ট হইল। কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, "ঠাকুরমা আজ যেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা

অবতীর্ণা হইয়া অন্ন বিলাইতেছেন, তথাচ আমি অনাহারে মরিলাম! এই ধনবান ব্যক্তির গৃহে, চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সমস্ত সামগ্রীই সমুপস্থিত,—অথচ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমার প্রাণ যায়-যায় হইতেছে। এমন উদ্যোগে, এমন সংযোগে, এমন অভ্যর্থনায়, এমন আদরে,—অদ্য আমি যদি না অন্ন পাইলাম, তবে কল্য আর কোথায় পাইব?"

কালাচাঁদ আরও গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন, "তবে কি অন্ন আমার অদৃষ্টে নাই? বিধাতা কি অদ্য একান্তই অন্ন মাপান নাই?—তবে কি অদৃষ্টই মূল,—ভগবানই সত্য? দূর! দূর!! অদৃষ্ট আবার কি? কেবল ঘটনাচক্রে পড়িয়াই অদ্য আমি খাইতে পাইলাম না,—এইমাত্র। ছুট্ অদৃষ্টকে? আমি মনে করিলে'ত এখনি সব খাইতে পারি। আচ্ছা, আমি আঁচাইয়া উঠিয়া, বাজারে গিয়া একদমে 'আড়াইসের রসগোল্লা খাইয়া আসিব,—কে আমার গতিরোধ করে, একবার দেখিব?"

এই বলিয়া কালাচাঁদ প্রকৃতিস্থ হইলেন। নখের কোণে একটী সিদ্ধ-পিঠের সুচিকা-বৎ ডগটী কাটিয়া লইলেন। সেইটী দু-আঙ্গুলে টিপিয়া সম্মুখে ধরিয়া, হাসিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"এটী মুখে দিব?—না, নাকে দিব? না মাথায় ঠেকাইব?—না, ফুঁয়ে উড়াইব?" শেষে সেইটীকে মুখের কাছে, ঠোঁটের খুব নিকটে একবার লইয়া গিয়া, তৎক্ষণাৎ হাত ফিরিয়া আনিয়া, আবার অন্য একটা বাটীতে হাত দিলেন। আবার সেই হাত, সেই-অন্য-বাটী হইতে উঠাইয়া লইয়া মুখের কাছে ঠোঁটের নিকট লইয়া গেলেন, আবার সেই হাত তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া আনিয়া অন্য একটা বাটীতে দিলেন। সর্ব্ব রকমে চৌষট্টীটা রেকাবি-বাটী ছিল,—ক্রমশ প্রায় সবগুলিতেই এই রকম করিলেন। শেষে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ঠাকুরমা, খুব খাইয়াছি, আর খাইতে পারি না—"

ঠাকুরমা। খেলে কৈ বাছা?—অনেক জিনিসত তোমার্ পাতে পড়ে রৈল—

কালাচাঁদ। আজ, যে-খাওয়া খেয়েচি, ঠাকুমা! —কস্মিন্‌কালে এমন খাওয়া খাই নাই—ঠাকুমা, আজকের খাওয়া অনেকদিন মনে থাক্‌বে!—

ঠাকুমা। বাছা, ও একটু-একটু খাওয়া আমার পছন্দ হয় না! 'বেশ হাম্‌-হাম্‌ ক'রে থাবা-থাবা খাবে, দেখে আমার চক্ষু যুড়াবে। কে জানে, বাছা! এখনকার ও-একবকম কি নূতন খাওয়া উঠেচে, কিছু বল্‌তে পারি না—

কালাচাঁদ। ঠাকুমা! এই তিল তিল করে খেয়েই আমার পেটে তাল হয়েছে;—আমার আর নড়ন-চড়ন নাই, উত্থান-শক্তি নাই। আজ যা হয়েচে, সে আর কি বল্‌বো তোমাকে—"

এই বলিয়া হাস্তবদন কালাচাঁদ পেট ফুলাইয়া ঠাকুরমাকে দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখ, ঠাকুমা! পেটে আমার আর একটুও যায়গা নাই।"

ঠাকুমা। পেট ভরিলেই হলো, বাছা!

আহারান্তে উত্থান-কালে ঠাকুরদাদা গম্ভীর মূর্ত্তিতে এক প্রস্তাব করিলেন, "কালাচাঁদ! তুমি

এক কর্ম্ম কর। এখনি একটু নুনলেবু এবং হজমীগুলি খাও। আমার ভয়, পাছে গরহজমে অসুখ করে।”

কালাচাঁদ। আমিও তাই বল্‌বো-বল্‌বো মনে ক'রছিলাম। আহার যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে অসুখ করাই খুব সম্ভব।

ঠাকুরমা। বালাই!—ষেঠের বাছা, ষষ্ঠীর দাস! অসুখ কেন করিতে গেল?

ঠাকরদাদা, ঠাকুরমার কথায় কোন কাণ না দিয়া, কালাচাঁদের উদ্দেশ্যেই বলিলেন, “যদি অসুখ করাই খুব সম্ভব হইয়া থাকে, তবে চাকর'রা পেটে খানিক তেলে-জলে মালিস্‌ ক'রবে কি?”

মালিসের কথায় কালাচাঁদের ভয় হইল। একবার তেলমাখানো-ব্যাপারে কালাচাঁদ অস্থির হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, “মালিস যদি মাখানো অপেক্ষা আরও কিছু গুরুতর কাণ্ড হয়, তাহা হইলেত এবার প্রাণটী নিশ্চয়ই বাহির হইয়া যাইবে।” প্রকাশ্যে কালাচাঁদ বলিলেন, “না,—সে-

সব কিছু করিতে হইবে না, নুন-নেবু খাইলেই অসুখ সারিয়া যাইতে পারে।”

ঠাকুরদাদা। আচ্ছা, মালিস এখন থাক্, রোগের অবস্থা বুঝে শেষে যা-হয় করা যাবে।

কালাচাঁদ। ভাবিতেছেন, এখন যে, এ ঘর থেকে বা’র হতে পাল্লে বাঁচি।

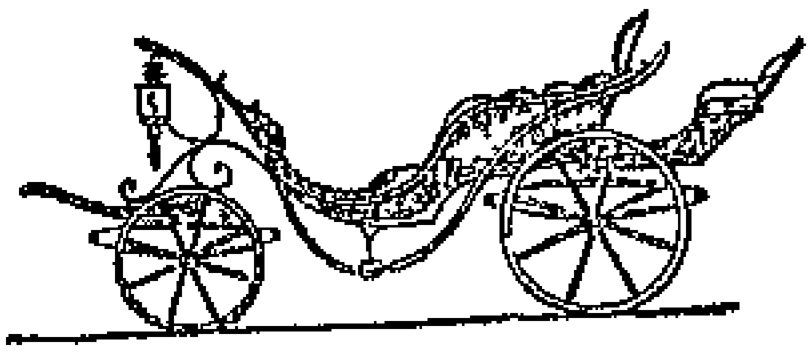

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আহারাদি সমাপন হইল। উঠিবার সময় কালাচাঁদ আর একটু খাবার জল চাহিলেন।

ঠাকুরদাদা অমনি হাঁ—হাঁ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন "অ, কেলেসোণা। খবরদার! তুমি এখন জল কিছুতেই খেতে পাবেনা। ভোরপূর আহারের পর ঠাণ্ডাজল খাইলে পোলাও হজম হইবে না,—পেট ফুলিযা দম্‌সম্‌ হইবে।"

ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদার উদ্দেশে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হেঁ গা! তোমার কেমন কথা? আহা! তেষ্টার জল বাছা একটু খেতে পাবে না!! জল না খেতে পেলে বাছার গলাটী শুকিয়ে যাবে,—কত কষ্ট হবে। কেলেসোণা! তুমি জল খাও, আমি বল্‌চি। তোমার ব্যাবাম আছে, আমি আছি।"

এই বলিয়া ঠাকুরমা খানিক জল আনিয়া কালাচাঁদের ঘটিতে ঢালিয়া দিলেন।

ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমার উদ্দেশে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তুমিত বুঝনা,—অসুখ হলে ভুগ্‌বে কে?"

ঠাকুরমা। (ঈষৎ ক্রোধভরে) সে ভাবনা তোমার করিতে হইবে না। ভুগিতে হয়, আমি ভুগিব। খাওত, বাছা কেলেসোণা! জল।

কালাচাঁদ মহাবিপদে পড়িলেন। এক দিকে ঠাকুরদাদা, অন্য দিকে ঠাকুরমা। একদিকে শিব, অন্য দিকে শক্তি। উভয়ে সংগ্রাম। মধ্যে কালাচাঁদ। তিনি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, ভাবিয়া প্রথমত কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে স্থির হইল, উভয়েরই মন রাখিতে হইবে। বলিলেন, "না, আমি জল বেশী খাবো না,—জল খাবার তত দরকার নাই! তৃষ্ণা পায় নাই!—এই একটা কুলকুচা করিলেই হইতে পারে!"

এই বলিয়া কালাচাঁদ এক চুমুক মাত্র জল পান করিলেন। ভাবিলেন,—জল চাহিয়া আমি কি ঝক্‌মারিই করিয়াছিলাম। এস্থলে আর যে কথা

কহিবে, সে শ্যালা। এ ন্যাক্ড়ার আগুন যে নিব্‌লে বাঁচি,—ফুবালে বাঁচি!

সর্ব্বকার্য্য সমাধা হইলে, তিনজনে আঁচাইতে গেলেন। ঠাকুরদাদা চাকরদিগকে ধমক্ দিতেছেন, "ওরে তোরা কি রকম আহম্মক বল্ দেখি?—বেসম্ এনে এখনও রাখ্‌তে পারিস্ নেই? শীগ্‌গীর বেসম্ নিয়ে আয়, শীগ্‌গীর বেসম্ নিয়ে আয়।"

এইরূপে "লে-আও, লে-আও" ধ্বনি পড়িয়া গেল। একজন চাকর একেবারে একসরা বেসম্ লইয়া উপস্থিত হইল। সে, কালাচাঁদের হাতে প্রায় একপোয়া বেসম্ ঢালিয়া দিল। এইবার কালাচাঁদ ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন। সে হাসির অর্থ বোধ হয় এইরূপ;—"আহার অপেক্ষা হাত পরিষ্কারের ধূমটা কিছু বেশী দেখিতেছি। হাতে আছে কি—যে, বেসম্ দিয়া মাজিব? ঐ একসরা বেসমের যদি বড়া তৈয়ারি করিত, তাহা হইলে বরং খাইয়া বাঁচিতাম। বুড়ো-টা ভুয়া হেঙ্গাম করিতে খুব মজপুত।"

কালাচাঁদ কি করেন,—সেই একপোয়া বেসমেই শুধু শুধু হাত মাজিলেন। আঁচান-পর্ব্ব শেষ হইলে, সুরেশ নীরবে অন্য দিক দিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। সুরেশচন্দ্র গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একবারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই।

কালাচাঁদেরও ইচ্ছা ছিল,—দৌড়িয়া পালাই। কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না,—ঠাকুরদাদার অনুমতি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন,—ঠাকুরদাদার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে যাইবেন,—আর'ত বেশী বিলম্ব নাই, ঠাকুরদাদার খড়্‌কে খাওয়া হইলেই সব ফুরায়।

বুড়ার কিন্তু তখনও বুলি ফুরায় নাই। খড়্‌কে খাইতে-খাইতেই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"জুয়ান দিয়ে খুব ছোট একটী পান কালাচাঁদের জন্য তৈয়ারি কর;—সুপারি তাতে দিবে না। জুয়ান খুব বেশী দিবে। সুপারিতে পেট কামড়ায়।"

কালাচাঁদ মনে মনে অপরিমেয় হাসি হাসিলেন—"জুয়ানের বরাদ্দ'ত প্রচুর দেখিতেছি। কিন্তু

হজম হইবে কি? অবশিষ্ট আছে কেবল নাড়ী। বাপ্! আমি জুয়ান খাইব না,—শেযে কি নাড়ী হজম হইয়া যাইবে?”

কালাচাঁদ বাহিরে যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছেন। এক পল সময়, তাঁহার যেন একদণ্ড বোধ হইতেছে। কিন্তু বুড়ার খড়্‌কে খাওয়া'ত সহজ নয়।—চলেচে'ত চলেইচে! এই হয়-হয়, আর হয় না।—আবার জাঁকাইয়া বসিয়া, ঠাকুরদাদা নূতন খড়্‌কে দিয়া দাঁত খুঁটিতে আরম্ভ করেন। বুড়ার জ্বালায় কালাচাঁদ পাগলপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

ঠাকুরমা সোণার ডিবে করিয়া কালাচাঁদের জন্য মণ্ডলঘাটের কর্পূর-কাত পান লইয়া আসিলেন। একটী কালাচাঁদের হাতে দিলেন। চারিটী ডিবাতে রহিল।

ঠাকুরদাদা উঠিয়া পান-ছেঁচা মুখে দিলেন। কালাচাঁদকে বলিলেন, “এস কালাচাঁদ! সদরে গিয়া একটু বিশ্রাম করসে। বিষম রোদ,—খানিক ঘুমাতে পারিলে ভাল হয়।”

ঠাকুরদাদার কথায় কালাচাঁদ হাতে-হাতে স্বর্গ পাইলেন। আহ্লাদে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। কেননা, কালাচাঁদ এইবার অন্দররূপ কারাগার পার হইয়া সুখের সদরে গমন করিবেন।

ঠাকুরমা ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিলেন "সে কি কথা? কেলেসোণা বাহিরে শোবে কি? আমি নিজে উহার জন্য যে, তেতলার ঘরে খাটের উপর বিছানা করে রেখেচি,—"

ঠাকুরদাদা। কালাচাঁদ তবে তুমি ঘরেই শুয়ে বিশ্রাম কর।

কালাচাঁদের মাথায় অমনি বজ্রাঘাত হইল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। ঘুরিয়া ভূতলে পড়িবার উপক্রম হইলেন। তবে শরীর নিতান্ত শক্ত বলিয়াই, সে বিষম ঝোঁক সামলাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

একটু সামলাইয়া কালাচাঁদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "না,—না,—তা বল্‌চিনা।—আমি আজ বাহিরেই শুই না কেন?"

ঠাকুরমা। (ক্রন্দনের সুরে) বাছা! তবে তুই বুঝি আমাদিগে পর মনে করিস্। দেখ্ বাছা! এ তোর ঘর! তুই আমার ছেলের ছেলে! চিরদিনের পর আজ তোর মুখটী দেখেচি! তুই শুবি ব'লে, আমি নিজে খাটের উপর বিছানা করে রেখেচি!—আয়্ বাছা! আয়্—তোর ঠাকুমাকে আর কষ্ট দিস্ না!"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরমা, কালাচাঁদের পিঠে হাত দিয়া একটু ধাক্কা দিলেন।

কালাচাঁদ—নাই! মৃত্যুকালে কি এমনি যন্ত্রণা হয়? অন্তরে যেন এককালে সহস্র শূল বিদ্ধ হইতেছে। জিহ্বা যেন টানিয়া কেহ বাহির করিতেছে। গলা শুকাইয়া, ফাটিয়া যেন রক্ত পড়িতেছে। নয়ন-তারায় ছানি পতিত হইয়াছে,—মানুষ আর নজর হয় না। কর্ণ বধির হইয়াছে। মুখ দিয়া যেন সরক্ত ফেন নির্গত হইবার উপক্রম হইতেছে। দৃষ্টিহীন চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। প্রকৃতই কালাচাঁদের—মনে হইতেছে, আজ বুঝি

মরিলাম! বুঝি অনন্ত সাগরের অতল জলে ডুবিলাম!

তীক্ষ্ণধার তরবারির দ্বারা কেহ যদি কালাচাঁদের দক্ষিণ হস্তটা কাটিয়া লইয়া যাইত, তথাচ কালাচাঁদ এত মর্ম্মযন্ত্রণা পাইতেন না। কিন্তু দিবসে, অন্দরে, ত্রিতলে, খাটে তাঁহাকে শুইতে হইবে, মহিলাকুল-মধ্যে তাঁহাকে একাকী দিন কাটাইতে হইবে,—ক্ষুধা-পিপাসা উপেক্ষা করিয়া মুখটী বুজিয়া পড়িয়া-পড়িয়া কড়িকাট গণিতে হইবে,—এ যন্ত্রণা কালাচাঁদের পক্ষে একান্তই অসহ্য।

যিনি বনবিহঙ্গের ন্যায় সদা স্বেচ্ছা-ভ্রমণশীল, অন্দর তাঁহার পক্ষে যম-কারাগার।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বাল্যে, কৈশোরে যাহাই থাকুন, কালাচাঁদের পক্ষে একালে, স্ত্রীলোক উপেক্ষার জিনিস বা সম্মানের সামগ্রী হইয়াছিল। যুবতী রমণীর প্রতি তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতেন না। দৃষ্টি দূরে যাউক, কোন সোহাগিনী সুন্দরী তাঁহার কাছ-ঘেঁসিয়া গেলে, তিনি আস্তে-ব্যস্তে বিব্রত হইয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতেন। যেন একটু বিরক্ত হইতেন। ভদ্র কুল-মহিলাগণের উপর তিনি অধিকতর সম্মান-ভক্তি দেখাইতেন। পতিতপাবনের গৃহে অবস্থানকালে তিনি হুগলীর রাসমণির ঘাটে প্রত্যহ গঙ্গা-স্নান করিতেন। পাড়ার দুরন্ত বালকগণ স্নানার্থ-গমনশীলা কুলকামিনীর প্রতি কখন কখন তামাসা-ইঙ্গিত করিত। এসব দেখিয়া-শুনিয়া কালাচাঁদ বড় চটিয়া উঠিলেন। একদিন তাঁহার সাক্ষাতেই একটা বখা-বালক, একটী পঞ্চ-

দশ-বর্ষীয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূর পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার চন্দ্রহারে চাবির জিঞ্জির কৈগো প্রিয়ে!" বধূ লজ্জায় জড়সড় হইয়া একবারে যেন গুটাইয়া গেল। কালাচাঁদ ক্রোধে কম্পিত হইয়া সেই বুড়া-বালককে বলিলেন, "তোমার'ত বড় বদ্-স্বভাব দেখ্‌চি,—পথে ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়েকে ঠাট্টা করা উচিত কি? তোমারই স্ত্রীকে কেউ যদি এই রকম ঠাট্টা করে, তোমার মন তখন কেমন হয় বল দেখি?"

বালকটীও কমপাত্র নন। তিনি রোখ্ করিয়া উত্তর দিলেন, "তুই কে? তুই আমাকে বল্‌বার কে?"

বালককে আর অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইল না। কালাচাঁদ তৎক্ষণাৎ অমনি তাহার গালে এক দারুণ চপটাঘাত করিলেন। বালক ঘুরিয়া পড়িবার যো হইল। কালাচাঁদ তাহার কাণ ধরিয়া বলিলেন, "ফের যদি তুমি স্ত্রীলোককে এরূপ ঠাট্টা তামাসা কর, তাহা হইলে, এই দেওয়ালে নাক্ ঘসাড়ে

মুখ দিয়ে রক্ত বা'র ক'রে দিব।" বালক বা অর্দ্ধ-যুবক এইরূপে উত্তম-মধ্যম পুরস্কার পাইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কালাচাঁদ তখন বধূর শাশুড়ীকে বলিলেন, "মা, তুমি বউ লইয়া ঘরে যাও,—কোন ভয় নাই।"

তাঁহারা উভয়ে হদ্দ দু-রশিপথ গিয়াছেন, এমন সময় চারি পাঁচটা খেড়ে-বালক লাঠী লইয়া কালাচাঁদকে মারিতে আসিল। যে বালকটী মার খাইয়াছিল, সে পশ্চাৎ হইতে আঙ্গুল বাড়াইয়া কালাচাঁদকে দেখাইয়া দিল, 'ঐ লোকটা আমায় মেরেচে।' কালাচাঁদ কোনও বাক্য ব্যয় না করিয়া, শীঘ্রহস্তে একজনের হাত হইতে লাঠী কাড়িয়া লইয়া, প্রত্যেক বালকের পশ্চাতে, এক-এক লাঠী বসাইয়া দিলেন। বালকগণ বেগতিক বুঝিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

রাসমণির ঘাটে তাঁহাকে আরও একবার এইরূপ লাঠী ধরিতে হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, কুল-

র কিছু ভক্তি অধিক দেখা

যাইত। তিনি বাববিলাসিনীগণকে নিতান্ত উপেক্ষা করিতেন। ছোট ছোট মেয়েকে আদর করিতে বড় ভাল বাসিতেন।

কালাচাঁদের আর এক রোগ ছিল,—ইদানীং স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতে, বা স্ত্রী-মণ্ডলীতে বসিতে সাধারণত বড় বিরক্ত বোধ করিতেন। এইজন্য বন্ধু পতিতপাবন কালাচাঁদের এক নাম দিয়াছিল,—“হুড়কো।”

সেই কালাচাঁদ আজ অন্দরে মেয়ে-দল-মাঝে কেমন করিয়া তিষ্ঠিবেন! কাহারও মল ঝম্‌-ঝম্‌ করিবে, কেহ হয়'ত ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিবে, কেহ হয়'ত দুটা রসের কথা কহিবে,—এ সব কালাচাঁদের সহ্য হইবে না। এসব কাণ্ডে কালাচাঁদের গাত্রে যেন বিষম সুড়সুড়ি লাগে। বিশেষ, খাটে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে, তাঁহার নাক ডাকিবে। সে ডাক শুনিয়া মেয়েরা কতই না তামাসা-ইঙ্গিত করিবে!! আরও এক বিশেষ কথা,—কালাচাঁদ খাটে শুইয়া আছেন,—এমন সময় জানেলার

ফাঁক দিয়া কোন কামিনী যদি তাঁহাকে লুকাইয়া উঁকি-মারিয়া দেখিয়া ফেলেন, তাহা হইলেইত মৃত্যু। একেবারে আধ্যাত্মিক মৃত্যু। বৈদ্যুতিক মৃত্যুতে ববং সময় লাগে, কিন্তু এ মৃত্যু ঘটিতে মোটেই সময় লাগে না।

মার, ধর, কাট,—কালাচাঁদ কিছুতেই অন্দরে শুইতে সক্ষম হইবেন না। লক্ষ টাকা নগদ গণিয়া দাও,—কালাচাঁদ বলিবেন, "মা লক্ষ্মী মাথায় থাকুন,—টাকায আমাব কাজ নাই,—আমি অন্দরে শুইতে পারিব না।"

আজ লইয়া প্রায় তিন দিন কালাচাঁদ একরূপ অনাহারেই আছেন। অন্ন বিনা দেহ দুর্ব্বল। কালাচাঁদ ইতিপূর্ব্বে আশা করিয়াছিলেন, সদর বাটীতে পৌঁছিয়া, কোন এক ছল করিয়া, ঠাকুর-দাদাব অনুমতি লইয়া, বাজারে গিয়া আড়াইসের রসগোল্লা খাইয়া আসিবেন। কিন্তু সে আশাও বুঝি নির্ম্মূল হয়! আশা নির্ম্মূল হউক, তত ক্ষতি নাই, কিন্তু না খাইয়া ক দিন বাঁচিব?

কালাচাঁদ ভাবিতেছেন, এখনি কেহ আসিয়া আমাকে যদি খুন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে, আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই। খুন করিবার লোক যদি কেহ না থাকে, তবে কেহ অনুগ্রহ করিয়া অন্তত একটু বিষ দান করুন, কালাচাঁদ তাহাই আজ পূর্ণ আহ্লাদে পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করেন।

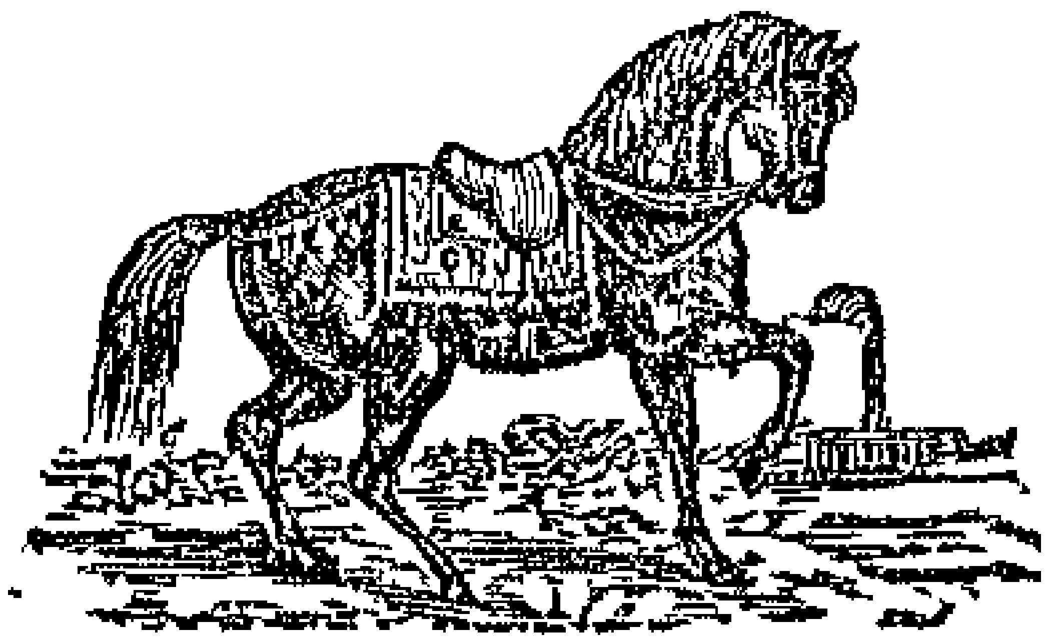

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতই কালাচাঁদ আজ অতি ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়াছেন। ঠাকুরমার ভালবাসাময় বাক্যে তিনি আজ মুগ্ধ। এমন মিষ্ট কথা তাঁহাকে কেহ ইহ জন্মে বলেন নাই। এমন প্রাণভরা আদর, এমন বুকভরা স্নেহ,—এমন মনোহর কথা তাঁহার অদৃষ্টে আর কখন ঘটে নাই! ঠাকুরমার মধুমাখা কথায় তাঁহার হৃদয়ে আজ সুধা-বর্ষণ হইয়াছে। হৃদয়ের প্রত্যেক তারে স্নেহের আঘাত লাগিয়াছে। কালাচাঁদ পুলকিত, কণ্টকিত, মোহিত। এই স্নেহময়ী ঠাকুরমার আদেশ কেমন করিয়া কালাচাঁদ লঙ্ঘন করিবেন?—তাই তিনি অতিঘোর বিপদে পতিত।

করুণাময়ীও কালাচাঁদকে স্নেহ করিত। কিন্তু সে স্নেহ, আর এ স্নেহ কালাচাঁদের কাছে স্বর্গ-মর্ত্ত প্রভেদ। সে স্নেহ কেবল গায়ে লাগিত, কিন্তু

কালাচাঁদের অন্তরে বাজিত না; কিন্তু ঠাকুরমার স্নেহ দেহ চিনে না, বুঝে না, মানে না,—তাহার সম্পর্ক কেবল অন্তরের সহিত। ঠাকুরমা দেবী, করুণাময়ী মানবী। ঠাকুর মা দেবপূজ্য অমৃত, করুণাময়ী মানবপূজ্য মিষ্টান্ন। ঠাকুরমা চৌতাল, করুণাময়ী আড়্খেমটা।

করুণাময়ীই কালাচাঁদকে বিষম ভাল বাসিয়াছিল। কিন্তু কালাচাঁদত সে ভালবাসার সম্যক্ প্রতিদান দিতে শিখেন নাই,—ভালবাসার বিনিময়ে তাদৃশ ভক্তি প্রত্যর্পণ করেন নাই। কিন্তু ঠাকুরমা কালা-চাঁদের নিকট হইতে স্নেহের বিনিময়ে পূর্ণমাত্রায় অথবা অধিকমাত্রায় ভক্তি ফিরাইয়া পাইয়াছেন। করুণাময়ীর ভালবাসা একহাতে তালি,—তাই ভাল বাজে নাই। ঠাকুরমার ভালবাসা,—কালাচাঁদের কাছে দুই-হাতে তালি,—সমানে সমান।

তবে কি কালাচাঁদ করুণাময়ীকে আদৌ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন না? কবিতেন। কিন্তু তাহা যেন কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুরোধে কবিতেন। করুণাময়ীকে

শ্রদ্ধা করা উচিত, সেইজন্য তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। করুণাময়ীর দারিদ্র্য-দশায়, করুণাময়ীর উত্তেজনায়, করুণাময়ীর দুঃখ দূরীকরণার্থই তিনি কেবল চাকুরি করিতে বাহির হইয়াছিলেন। করুণাময়ীকে ভরণ-পোষণ করা উচিত, তাই কালাচাঁদ পর-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া, অর্থোপার্জ্জনের জন্য মাষ্টার হইয়াছিলেন। নচেৎ কালাচাঁদ কিছুতেই চাকুরী করিতে স্বীকৃত হইতেন না। তিনমাস পরে, কালাচাঁদ বার টাকা মাহিনাস্বরূপ প্রাপ্ত হন। সেই বার টাকা লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে আসেন। বাসায় আসিয়া দেখিলেন, করুণাময়ী নাই,—বাসাদ্বারে চাবি বন্দ। লোকমুখে তিনি শুনিলেন, করুণার মৃত্যু হইয়াছে। কালাচাঁদ কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। রাত্রে পাঁচীর ডিঙ্গাইয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, করুণা যে ঘরে শুইত, সেই ঘরের মেজের নীচে ঐ বার টাকা পুঁতিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। কালাচাঁদ ভাবিয়াছিলেন, "অর্থের অভাবে অনাহারে করুণা মরিয়াছে;—এই অর্থ করুণার;

আমার গ্রহণ করা উচিত নয়; এ অর্থ করুণারই থাক্!" এই কারণেই ঐ দ্বাদশ মুদ্রা মাটীতে প্রোথিত হইয়াছিল। ইহাকে বালকত্ব বল, পাগ-লামী বল, বা কর্ত্তব্যজ্ঞান বল,—যাহাই বল,—কালাচাঁদের তাহাতে আসিয়া যায় না। মোদ্দা, ঘটনা এইরূপই ঘটিয়াছিল। রাত্রে এই কার্য্য সমাধা করিয়া, কালাচাঁদ কালবশে, যে গ্রামে তাঁহার মাষ্টারি, সেই গ্রামে রাত্রি-শেষে গিয়া উপস্থিত হন। তারপর তাঁহার বিরুদ্ধে অপবাদ, মোকদ্দমা, কারাবাস—সকলেই জানেন।

কিন্তু ঠাকুরমার প্রতি কালাচাঁদের ভক্তি-ভালবাসা অকৃত্রিম,—এখানে কর্ত্তব্যকর্ম্মের কারবার নাই! স্বতঃ-ই কেমন স্নেহ-সাগর উথলিয়া উঠে! ইহা এক ঐশ্বরিক কাণ্ড!

কালাচাঁদের দেহ মন, মরুভূমিবৎ শুষ্ক। তাঁহার মা নাই, তাঁহার বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—এ সংসারে কেহই নাই। অন্তত আজ আট বৎসর কাল তাঁহার দেহ একদিনের তরেও স্নেহ-

ঠাকুরমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় যাইতেছেন, কিছুই বুঝিলেন না,—চারিদিকের কোন বস্তুই চাহিয়া দেখিলেন না;—দেখিতেছেন, কেবল ঠাকুরমার চরণ,—এবং যাইতেছেন, কেবল সেই পদানুসরণ করিয়া। কালাচাঁদ কলের পুত্তলী।

ত্রিতলের গৃহে, স্বর্ণরজত-খচিত-মহামূল্য খাটে, শ্বেতপদ্মাভা-যুক্ত সুকোমল-শয্যায় কালাচাঁদ শয়ন করিলেন। তাঁহার অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র পূর্ণ-মুদ্রিত হইল। তিনি আছেন, কি নাই, স্বর্গে কি নরকে, বোধ হয় তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কালাচাঁদ সংজ্ঞাহীন সান্নিপাতিক বিকার-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

তৃতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

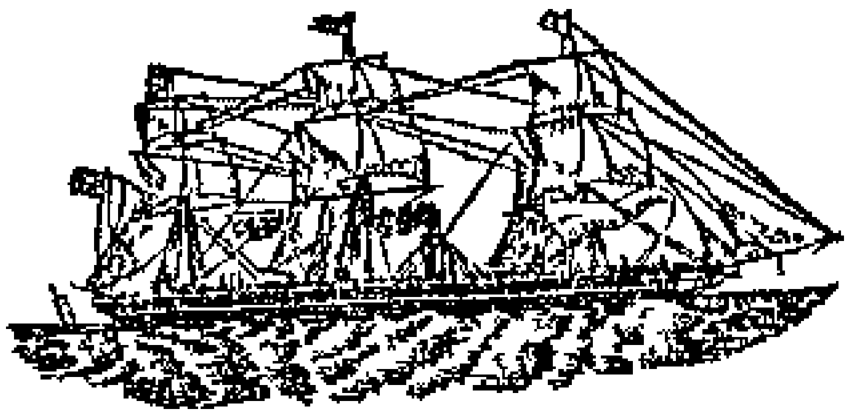

# কালাচাঁদ।

প্রথম অংশ।

চতুর্থ পর্ব্ব

সম্পূর্ণ।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৬ সাল।

# ছবির তালিকা।


১। ঠাকুরদাদার অম্বলের অসুখ ... ৩২০

২। রামঠাকুরের, ঠাকুরদাদা দর্শন ... ৩২৫

৩। রামঠাকুরের চরণে ভোলানাথের পতন ৩২৬

৪। দুই দাসীর দ্বন্দ্ব ... ... ৪১৬

৫। বার-নারী বেষ্টিত কালাচাঁদ ... ৪২৭

৬। কালাচাঁদের রসগোল্লা-ভক্ষণ ... ৫২৪

# কালাচাঁদ।

## চতুর্থ পর্ব্ব—মন্ত্রণা।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

আহারাদির পর, যথা-নিয়মে একটু বিশ্রাম করিয়া, ঠাকুরদাদা কাছারী গেলেন। তথায় কাজ-কর্ম্ম কিছুই করিতে পারিলেন না। অসুখ হই-য়াছে বলিয়া, তাকিয়া ঠেস্ দিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, তিনি বসিয়া রহিলেন। কাহারও সহিত বিশেষ বাক্যালাপ করিলেন না। বাহ্য-দৃষ্টে বোধ হইল, তাঁহার বুকে যেন কিরূপ একটা বিষম ব্যথা লাগিয়াছে।

বৈশাখের বেলা। তথাচ পাঁচটা না বাজিতে-বাজিতেই, জজ সাহেব উঠিবার পূর্ব্বেই, ঠাকুর-দাদা পাল্কী চড়িয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ঘরে আসিয়াই শুনিলেন, কালাচাঁদ এই মাত্র বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শুষ্ক মুখ আরও শুষ্ক হইল;—শরীরে স্বাস্থ্য নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই,—সদাই কেমন অন্যমনস্ক-ভাব। লোকের সহিত দুই একটা কথা কহিলেন বটে, কিন্তু সে-কথা কেমন ছোড়ভঙ্গ,—আদি-অন্তে মিল নাই! বাটীর ভিতর সন্ধ্যাহ্নিক করিতে গেলেন বটে,—কিন্তু নিয়মিত জলখাবার খাইলেন না;—বলিলেন, ক্ষুধা নাই, অম্বলে কেমন বুকটা জ্বালা করিতেছে!

বাহিরে আসিয়া, তিনি এক তাকিয়া ঠেস্ দিয়া পড়িলেন।

প্রাতঃকালের কথা-মত রামঠাকুর বহুপূর্ব্বেই, বেলা চারিটা না-বাজিতেই, দেওয়ানজীর বাসায় আসিয়া ঘুঘু-পক্ষীটীর মত বসিয়াছিলেন। কাছারী হইতে প্রত্যাগমন-কালে দেওয়ানজীর পাল্কীর শব্দ

পাইয়া, রামঠাকুর তাঁহাকে আগবাড়াইয়া আনিতে পথে দৌড়িয়া যান। পাল্কী হইতে নামিয়া কর্ত্তা কিন্তু তাঁহার সহিত কোন কথা কহিলেন না। রামঠাকুর কর্ত্তার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ বৈঠকখানার উপর আসিলেন। কাছারীর কাপড় ছাড়িয়া কর্ত্তা অন্দরে জল খাইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া, তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিলে, ব্রাহ্মণ-রামঠাকুর, কায়স্থ-কর্ত্তার ঠিক পদপ্রান্তে গিয়া উপবেশন করিলেন। কর্ত্তা তথাচ কোন কথা কহিলেন না। তখন রাম-ঠাকুরের পেট ফুলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কর্ত্তা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা-স্বরে বলি-লেন, "ঠাকুর-মোঁশাই! আমার কপালে হাত দিয়া দেখ'ত, গরম হয়েচে কি না?"

রামঠাকুর কপালে হাত না দিতে-দিতেই বলিয়া উঠিলেন, "উঃ, খুব গরম দেখ্‌চি যে! ভয়ঙ্কর গরম!"

বাস্তবিক তখন কর্ত্তার মাথা বা কপাল তাদৃশ গরম ছিল না। বৃদ্ধবয়সে, সন্ধ্যাকালে, দুর্ভাবনার

সময় যেরূপ স্বাভাবিক একটু ঈষৎ গরম হয়, সেইরূপই হইয়াছিল। তবে রামঠাকুর এরূপ অত্যধিক গরমের কথা বলিলেন কেন?

রামঠাকুর কর্ত্তার হৃদয় বুঝিতেন। কর্ত্তার অভিপ্রায় ছিল, তাঁহার কপালটাকে এ-সময় সকলে গরম বলুক। কাজেই রামঠাকুর, কপাল গরম না হইলেও, উহাকে গরম বলা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। বিশেষ, কর্ত্তা যদি বলেন, আমার অমুক অসুখ করিয়াছে;—তদুত্তরে কেহ যদি প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "না, ও কিছু নয়,—আপনি বেশ আছেন";—তাহা হইলে কর্ত্তা প্রকৃতই দুঃখিত হন, কখন বা রাগও করিয়া থাকেন।

কপালটী ভয়ঙ্কর গরম সাব্যস্থ হইলে. কর্ত্তা আবার বলিলেন, "আমার বুকটা খুব জ্বালা করিতেছে, বোধ হয় আজ ভারি অম্বল হয়েছে।"

রামঠাকুর অমনি কর্ত্তার বুকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ, বটে, বুকটা খুবই জ্বালা করিতেছে;—এত অম্বল হ'লো কিসে?"

ঠাকুরদাদার অম্বলের অসুখ।

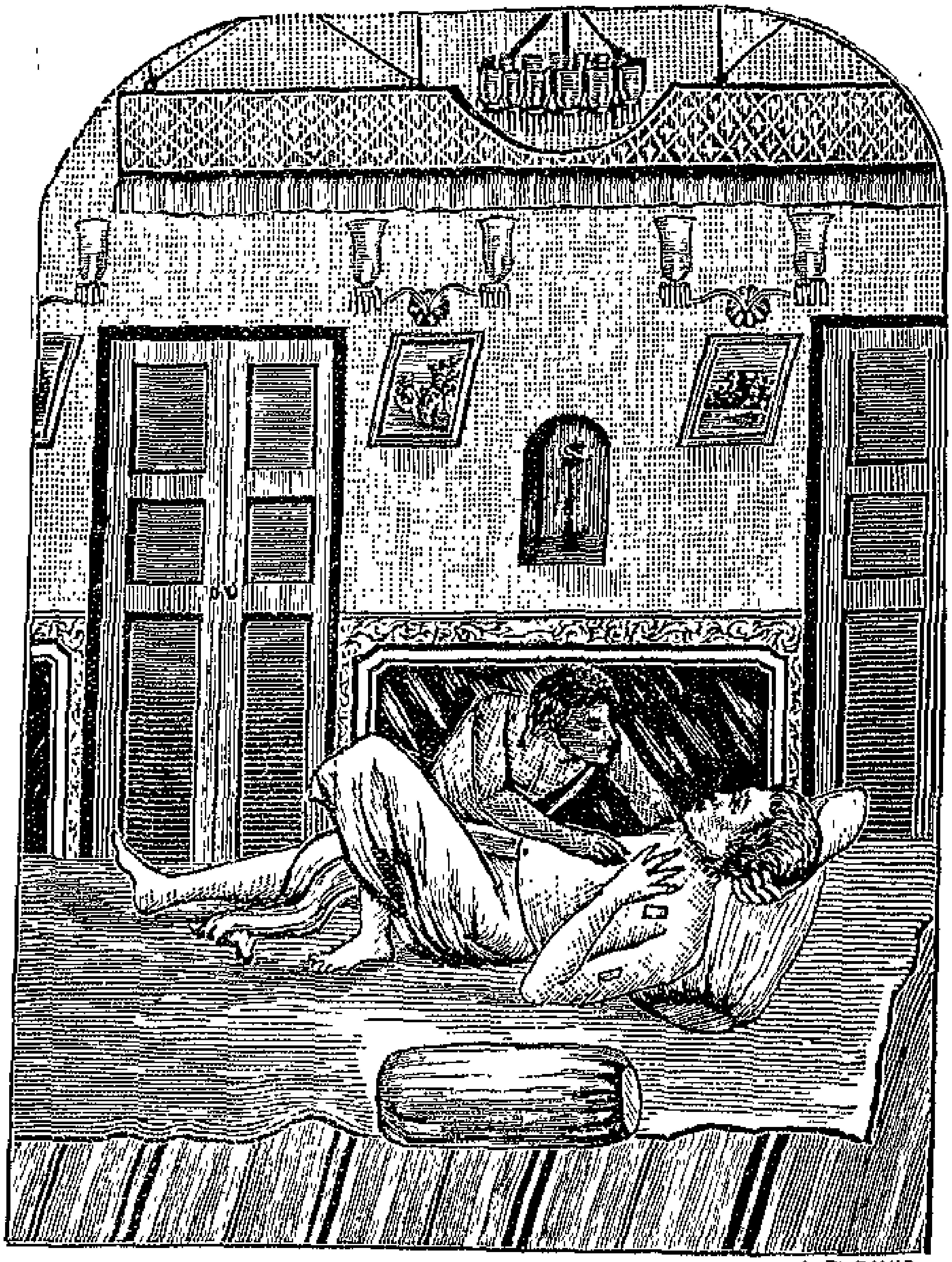

কর্ত্তা। আজ দ্বিপ্রহরে গুরুপাক জিনিষ ভোজন হয়েছে,—

রামঠাকুর। আপনি খেলেন কেন? আপনি গিন্নীর কথা শুনেন কেন? আহা! গৃহিণী নন্‌ ত— যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! গৃহিণীর গুণেই সংসার! আমি বাড়ীর ভিতর খেতে ব'স্‌লে, গিন্নী বামুনকে ব'লে দেন, "ঠাকুরের পাতে আরও সন্দেস দে, আরও সন্দেস দে!" আমি খেতে পার্‌বো না, তবু গিন্নী ছাড়্‌বেন না। আহা! এমনি তাঁর লোকের প্রতি স্নেহ-যত্ন।

কর্ত্তা এ-সব কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর-মোশাই! আজ বড় অসুখ হয়েছে—"

রামঠাকুর। (বিস্ময়ে) বলেন কি? বলেন কি? ছিরাম কবিরাজকে ডেকে আন্‌ব নাকি? চাদর লইব নাকি? অসুখইত বটে,—তাই'ত!—ঘোরতর অসুখ!

কর্ত্তা। না, এখন আর কবিরাজ ডাকিতে

হইবে না। একটু ঘুমাইলেই সারিতে পারে। একবার ঘুমাইবার চেষ্টা দেখি,—

এ কথা শুনিয়া রামঠাকুর বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বড়কর্ত্তার অসুখ হইয়াছে,—দেওয়ানজীর অম্বলে প্রাণ যায়-যায় হইয়াছে;—এই ব্যাপার লইয়া অন্তত রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি একটা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিবেন। কবিরাজ আসিলে, তাঁহার নিকট হইতে বল-বৃদ্ধির একটী বটিকা লইয়া তিনি নিজে খাইবেন। অন্দরের দ্বারে একবার দৌড়িয়া গিয়া গিন্নীকে উদ্দেশ করিয়া সংবাদ দিবেন, "কর্ত্তার অসুখ একটু কমিয়াছে, কবিরাজ আসিয়া ঔষধ দিয়াছেন, কোন চিন্তা নাই।"—কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কামনাই পূর্ণ হইল না।

দুঃখের উপর দুঃখ। কর্ত্তা যদি ঘুমাইয়া পড়েন, তাহা হইলে ত ভোলা-ময়রার কথা, মনোমোহিনী ময়রাণীর কাহিনী, দোকানে চাবি ভাঙ্গা, সন্দেস খাওয়া—এ-সব কথা ত কিছুই

উত্থাপন করা হইল না! না জানি, কি অশুভ-ক্ষণেই অদ্য যাত্রা করিয়াছিলাম। বারবেলায় কি বাহির হইয়াছিলাম?—

রবৌ বর্জ্জ্যং চতুঃপঞ্চ
সোমে সপ্তদ্বয়ং তথা।

তাহাও নহে। বোধ হয় যাত্রাকালে কেহ হাঁচিয়া থাকিবে। অথবা পথে ধোবা দেখিয়া থাকিব।

রামঠাকুর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,—এমন সময় কর্ত্তা আবার বলিলেন, "ঠাকুর-মোশাই! তুমি যাবার সময় চাকরদিগে ব'লে যাওত, আমার কাছে যেন কোন লোকজন আজ না আসে। কেহ জিজ্ঞাসিলে চাকররা যেন বলে 'কর্ত্তার অম্বলে বুকজ্বালা ক'রে অসুখ হয়েছে, তাই তিনি ঘুমিয়েছেন।'"

রামঠাকুর। হঠাৎ এমন অসুখটা কিসে হলো?

কর্ত্তা, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "যদি কালাচাঁদ আসে, তবে তাকে না হয় আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে ব'লো।"

রামঠাকুর ভাবিতে লাগিলেন, "তাই'ত!—গতিক কি?—আমাকেও উঠিয়ে দিতেছেন।—আসবে কি না সেই কালাচাঁদটা?—সেটার সঙ্গে এত ভাব কিসে হ'লো?—"

কর্ত্তাকে কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার তাদৃশ ক্ষমতা রামঠাকুরের নাই। কাজেই তিনি কালাচাঁদ-সম্বন্ধিনী কোন কথা কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে সক্ষম হইলেন না।

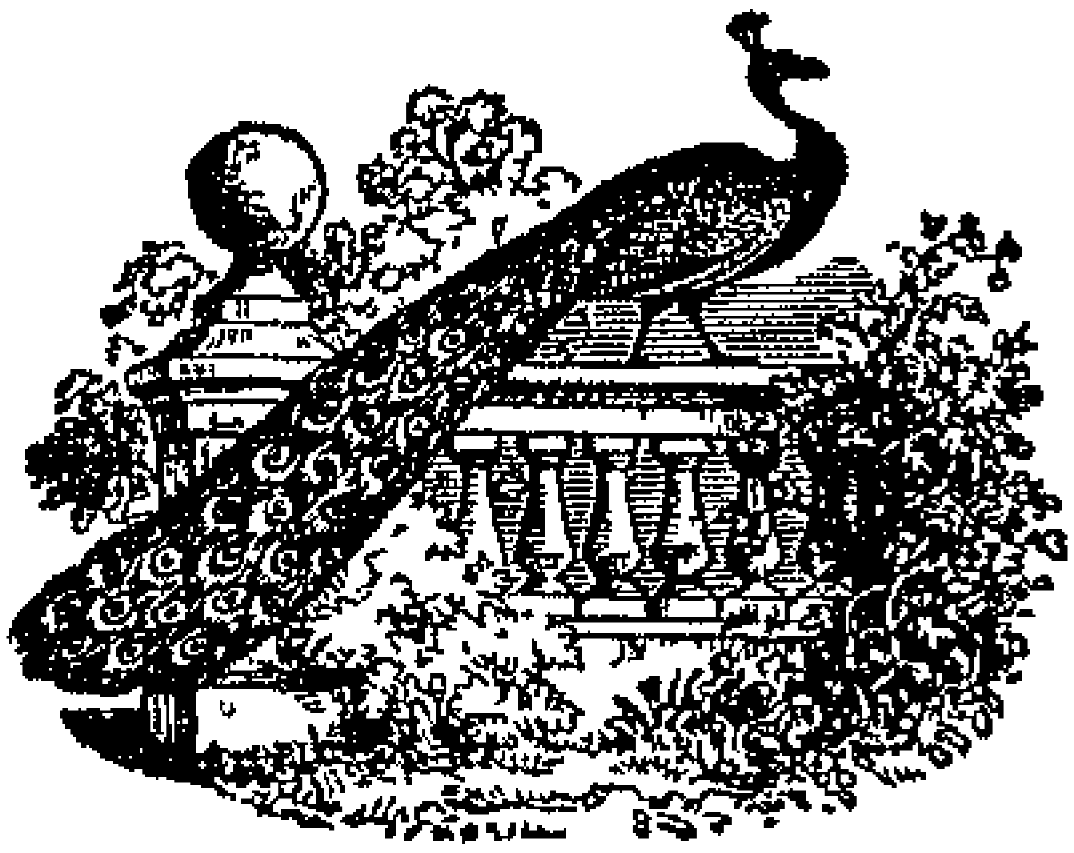

রামঠাকুরের ঠাকুরদাদা—দর্শন।

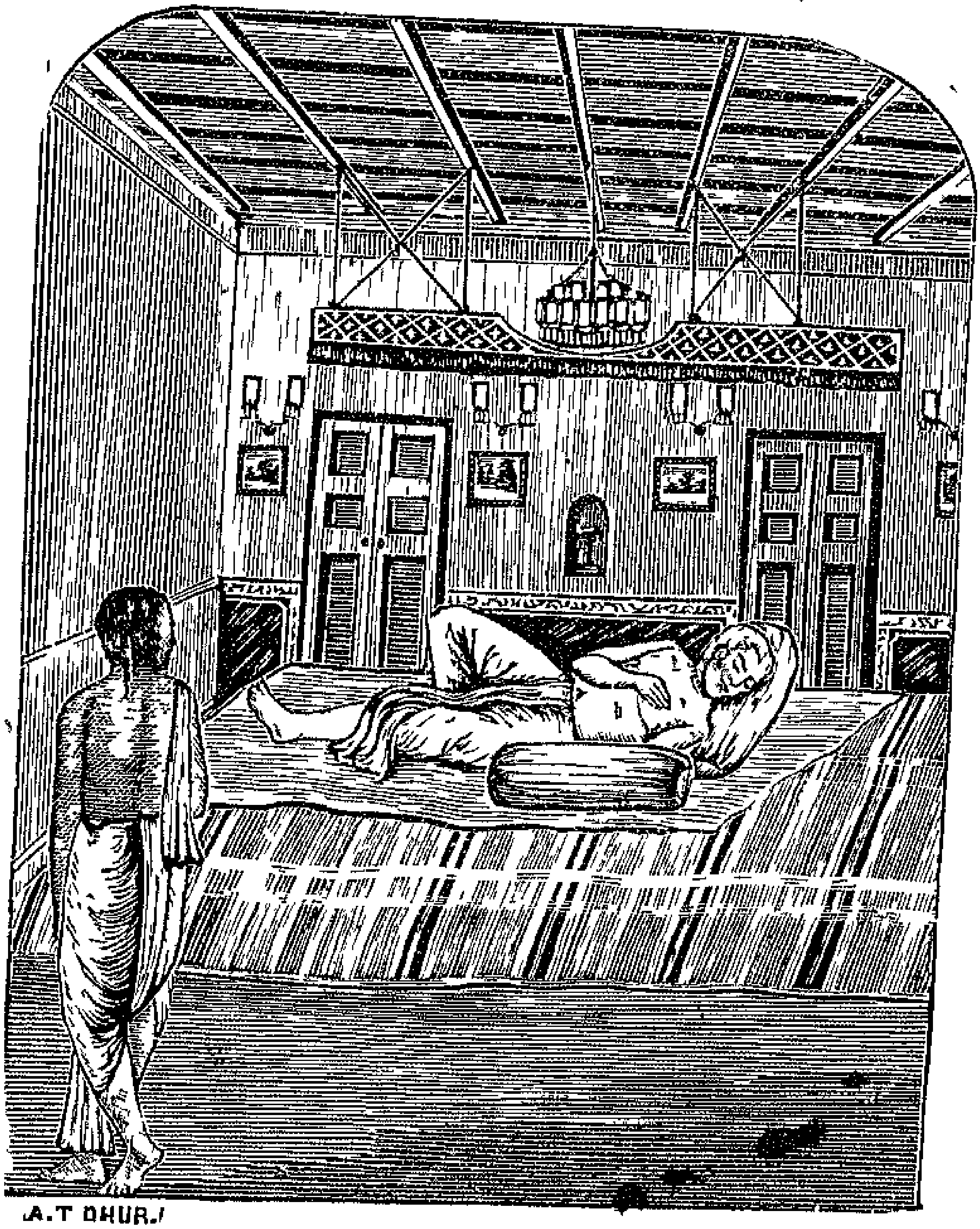

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামঠাকুর কি করেন,—উঠিয়া যাইতেই বাধ্য হইলেন। তথাচ তিনি উঠিতে একটু বিলম্ব করিতে লাগিলেন।—ইচ্ছা,—যদি এইটুকু সময়ের মধ্যে কর্ত্তা তাঁহার সহিত আরও দুই একটী কথা কহেন। কর্ত্তা কিন্তু নীরবই হইয়া রহিলেন,—আর একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তখন অগত্যা রামঠাকুর উঠিলেন,—দাঁড়াইলেন। এমনি ধীরে ধীরে আলস্যের সহিত দাঁড়াইলেন, যেন, দাঁড়াইতেও দুই মিনিট সময় লাগিল। তার পর, পদবিক্ষেপ। এই প্রথম পদক্ষেপেও বুঝি এক মিনিট সময় অতিবাহিত হইল। অনন্তর, মুখ ফিরাইয়া পশ্চাৎদিক্ সন্দর্শন। "শুন, ঠাকুর-মোশাই, শুন, বলি"—কর্ত্তা তাঁহাকে এই বলিয়া ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন কি না, বুঝি ইহা দেখাই তাঁহার পশ্চাতে মুখ ফিরাইবার উদ্দেশ্য।

তদনন্তর এককালে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পদ-বিক্ষেপ। অতঃপর উঁকিঝুঁকি মারিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত। দেখিতে দেখিতে রামঠাকুর উঠানে গিয়া পড়িলেন।

রামঠাকুর অবশেষে দেখিতে পাইলেন, কাঁধে চাদর ফেলিয়া দ্রুতপদে একটা লোক আসিতেছে।

রামঠাকুরকে কোন কথা কহিতে হইল না; সে লোকটা ঈষৎ দৌড়িয়া আসিয়া দড়াম্ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া, এই ভাবে কাতর কণ্ঠে, বলিল, "আপনারা আমায় রক্ষা করুন, আমি ধনে প্রাণে মরিলাম।"

রামঠাকুর। কেহে। ভোলানাথ নাকি? হাঁ—হাঁ, সব শুনেচি। একটু আস্তে কথা কও। কর্ত্তার বড় অম্বলের অসুখ করিয়াছে। বোধ হয়, তাঁর একটু নিদ্রা এসে থাক্‌বে।

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি কত্তা-মোশায়েরই শরণ নিতে এসেচি। তিনিই দেশের রাজা,—

রামঠাকুরের চরণে ভোলানাথের পতন।

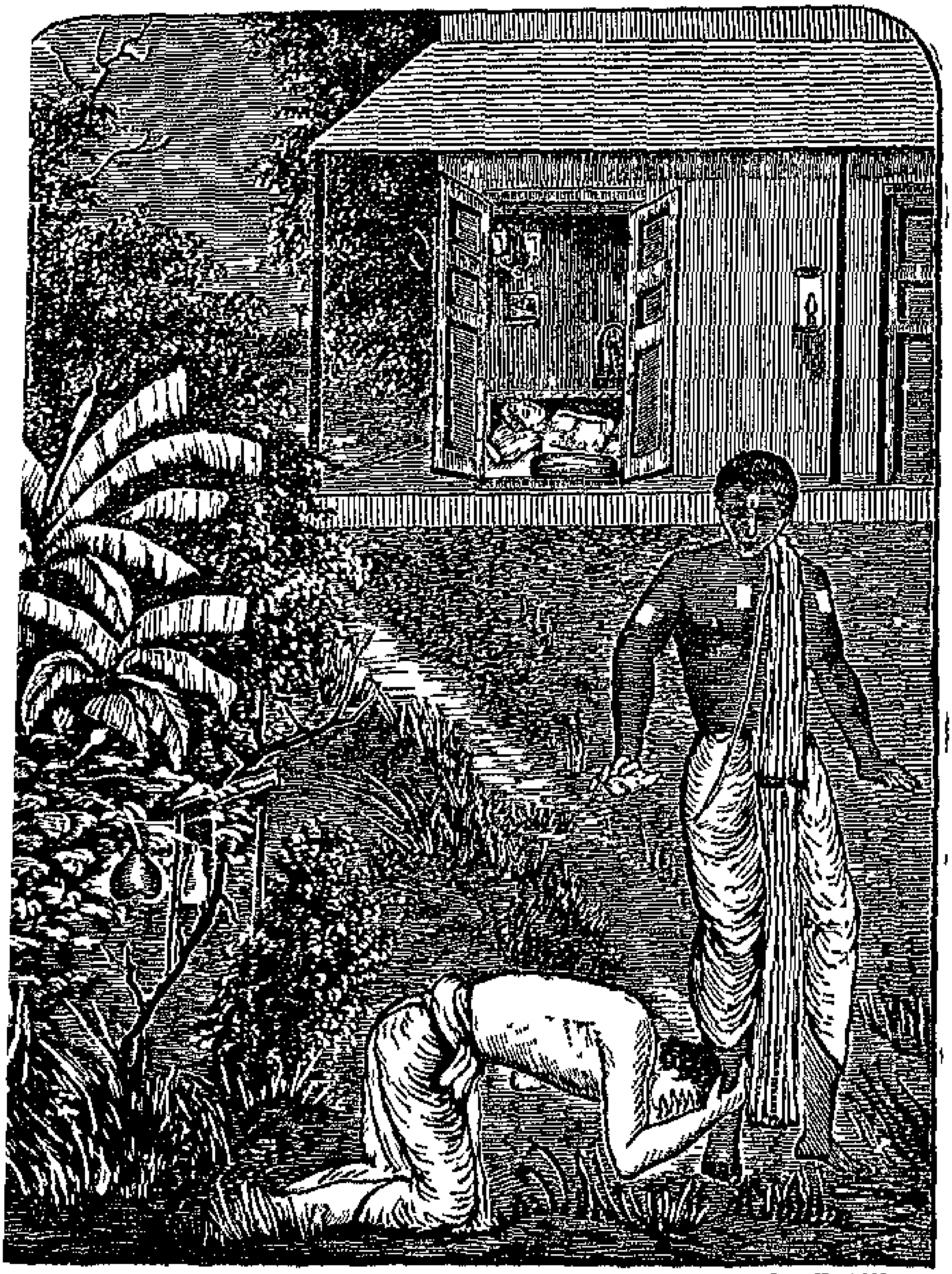

আমরা তাঁর সন্তান তুল্যি। তিনি না রাখলে, আমাদিগকে আর কে রাখ্‌বে?

রামঠাকুর। ঠিক,—ঠিক।

ভোলানাথ। আমি গরীব মানুষ; কোথা কি পাবো? কত্তা মোশায়ের জন্যে এই আটটী টাকা নজর এনেচি। এই ক্ষুদ-কুঁড়ো কটী পান খেতে নিয়ে আমাকে রক্ষা কত্তে হবে।

এই বলিয়া ভোলানাথ ট্যাক্ হইতে টাকা খুলিয়া লইয়া হাতে রাখিল।

কর্ত্তা এতক্ষণ নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া নীরবে নিদ্রিত ছিলেন। টাকার শব্দ শুনিয়া জাগিলেন। চক্ষু চাহিয়া বলিলেন, "ভোলা নাকিরে!"

ভোলানাথ। আজ্ঞে, কত্তা-মোশাই, আমাকে এ-যাত্রা রক্ষা কত্তে হবে।

এই বলিয়া ভোলানাথ কর্ত্তার নিকট পৌঁছিল।

কর্ত্তা। তোর কি হয়েচে?

ভোলানাথ। সে কথা আর কি বল্‌বো?

এই বলিয়া ভোলানাথের ক্রন্দন।

কর্ত্তা। বল্‌না কি হয়েচে? কেবল কাঁদ্‌লে কি হবে?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, কাল রাত্রে কখন্‌ আমার দোকানে চুরি হয়েচে, তার আমি বাপ্প কিছুই জানি না। একখুলি রসগোল্লা চোরে খেয়েছে, একহাঁড়ী ক্ষীর খেয়েচে, আর বাক্সভেঙ্গে নগদ ৯৲ টাকা নিয়েচে।

কর্ত্তা। তোর বাক্সে কত টাকা ছিল?

ভোলানাথ। একষট্টি টাকা সাড়ে বার আনা ছিল।

কর্ত্তা। এ কি রকম কথা হ'লো? ৬১৸১০ টাকার মধ্যে চোর লইল ৯৲,—বাকী টাকা রাখিয়া গেল কেন?

ভোলানাথ। এই জন্যই ত আজ মারের চোটে আমার পিঠের চাম্‌ড়া উঠে গেছে! চোরে ৯৲ টাকা নিলে,—১০৲ টাকা নিলে না, কি ১৫৲ টাকা নিলে না, কি সব টাকাই নিলে না,—তার আমি কি কর্‌বো? চোরের মনের মৎলব আমি

কি ক'রে ব'ল্‌বো? কত্তা-মোশাই! আপনি তো দেশের রাজা,—আপনিই এর্ বিচার করুন।

কর্ত্তা। আচ্ছা, তোর্ মার্ খেয়ে পিঠের চাম্‌ড়া গেল কেন?—তোকে মেলে কে?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, এই, দারোগা-মোশাই মেলেন। তিনি ব'ল্লেন,—বল্ এখনি,—কে চুরি করেচে? না ব'ল্লে, এখনি তোকে কড়ীকাঠে টাঙ্গিযে তোর্ এক হাত জিব বা'র্ ক'রে ফেল্‌বো।

কর্ত্তা। তার পর কি হ'লো?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি তাঁকে বুঝিয়ে ব'ল্লাম,—'চোর কে,—তাই যদি আমি জান্‌বো, তবে আমি থানায় খবর দিতে আস্‌বো কেন? জান্‌লে,—একবারে চোরেব টুঁটী ধরে এনে, তাকে জেলখানায় সাঁদ ক'রে দিতাম।' এই কথা শুনে, দারোগা-মোশাই আরও রাগ ক'রে বল্লেন, "ভোলা, তুই বেটা পাকা বদমাইস্,—সোজা কথায় বল্‌বি ত বল্, নইলে তোর্ পিঠে ২৫ জুতা লাগাবো।" এই কথা শুনে আমি ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লাম,—

যোড়হাতে দারোগা-মোশাইকে ব'ল্লাম, 'দোহাই খোদাবন্দ! আমায় রক্ষা করুন,—আমি এর ভাল মন্দ কিছুই জানি না।'

কর্ত্তা। তার পর—

ভোলানাথ। দারোগা-মোশাই আরও রাগ ক'রে খুব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "ভোলা! তুই ব্যাটা, ছেলে-ভুলুস্ কা'কে? নৌকা-ভাড়া ক'রে চোর এসে বাক্স-ভেঙ্গে ৯৲ টাকা নিয়ে গেল, আর ৫২৸১০ টাকা তো-ব্যাটার জন্যে রেখে গেল—নয়?—ভোলা! তুই ন্যাকা বুঝুস্ কা'কে? নিশ্চয় তুই নিজে চুরি করেচিস্—নয়,—চোর তোর ঘরেই আছে?—চোরে চুরি কত্তে এলে, পাহারাওয়ালাদের কাছ থেকে সে কি আর ফিরে যেতে পাত্তো? এটা চুরি নয়,—যেন একটা রঙ-তামাসা পড়ে গেছে,—মার্ শালাকে!"

ভোলানাথ এইবার আওয়াজ একটু গম্ভীর করিল। ধীর-স্বরে সাধুভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—"দেওয়ানজী-মোশাই! আপনি

ধর্ম্মাবতার। ঐ উপরে ভগবান্, নীচে আপনি আপনার কাছে আমি মিথ্যে কথা বল্‌বো না। দারোগা-মোশাই, একজন চৌকীদার দিয়ে, জুতো মেরে আমার পিঠ ছিড়ে দিয়েচেন। পিঠ ফেটে রক্ত পড়তে লাগ্‌লো। তখন আমাকে রোদে বসিয়ে রাখ্‌লেন। আমি কি করি,—বেলা যখন তিতীয় পহর, তখন পাঁচটী টাকা দারোগা-মোশাইকে পান-খেতে দিয়ে তবে বাড়ী আস্‌তে পাই। দারোগা-মোশাই ব'লে দিয়েচেন, 'চোরের সন্ধান তোকে ক'রে দিতেই হবে!—যদি আজ একান্ত চোর না পা'স্, তবে কাল তোকে চোরকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তেই হবে।' এ বিপদে আর কার কাছে যাবো?—তাই আপনার কাছে এসেচি,—আপনি ছিমধোসুদন,—আমাকে রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া ভোলানাথ কর্ত্তার পদপ্রান্তে তাহার মস্তক ন্যস্ত করিল। কর্ত্তা বলিলেন, "ভোলা! ওঠ্, ওঠ—ভয় কি?"

ভোলানাথ আটটী টাকা কর্ত্তার বিছানায় রাখিয়া দিল।

কর্ত্তা বলিলেন, "ও—কি—ও ?—"

ভোলানাথ। আজ্ঞে, এই পান-খেতে যৎকিঞ্চিৎ নিয়ে এসেচি—

কর্ত্তা। টাকা তুই ফিরে নিয়ে যা,—টাকায় আমার কাজ কি? হেঁরে ভোলা! তোকে কি আর আমায় টাকা দিতে হয়?—

ভোলানাথ। (যোড়-হাতে) আজ্ঞে, আপোনার ছিচরণ মনে করে এই ক্ষুদ-কুঁড়ো-কটী এনেচি,—এ আপনাকে নিতেই হবে—

কর্ত্তা। ওরে ভোলা! তুই আগে খালাস হ',—তারপর আমাকে না হয়,—তুসের সন্দেস দিস্,—টাকা এখন ফিরে নিয়ে যা—

ভোলানাথ। আজ্ঞে, হুজুর! ছোট ধামি ক'রে আজ আঁড়াইসের সন্দেস আপনার জন্যে আন্‌ছিলেম,—বাঁ-কাঁধে ধামিটী বসানো ছিল, সন্ধ্যে তখন হয়ে গেচে,—ঠিক বারোদোয়ারির কাছে,

একটা লোক পেছুপেছু এসে ধামিটী তুলে নিয়েই দৌড় মার্‌লে! আমার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না,—আমি অম্‌নি 'থ' হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেম্।

কর্ত্তা। বলিস্ কিরে? সত্য না কি?—

ভোলানাথ। দেওয়ানজী-মোশাই! এ চূণের ঘরে আমি মিথ্যে কথা বল্‌বো না,—আমি লজ্জায় ও ভয়ে এতক্ষণ এ কথা বলি নাই। দারোগা-মোশাই যদি শোনেন, তা'হলে বোল্‌বেন,—তুই এ চোরটাকেও ধ'রে নিয়ে আয়্।

কর্ত্তা। সন্দেসের ধামি তুলে নেবার পর, তুই কি কোন কথা কইলি না?—

ভোলানাথ। আজ্ঞে, একটু পরে, আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম,—'চোর! চোর! ঐ সন্দেস নিয়ে যায়, —সন্দেস নিয়ে যায়।' সে চোরটা, ঠিক যেন যমদূতের মত। হি-হি ক'রে একটা বিতিকিচ্ছি হেসে, বাঘের মত লাফ দিতে দিতে, পাশের গলির ভিতর ঢুকে গেল।

কর্ত্তা। আশ্চর্য্য কাণ্ড বটে। সন্ধ্যাবেলা সদর-রাস্তায় ডাকাতি!! লোকের রাস্তা-চলা ভার হলো দেখ্‌চি।

ভোলানাথ। লোকের আর কি হচ্চে? আমারই উপর শনির দিষ্টি পড়েচে,—কাল রাত্রে আমারই ঘরে চুরি হলো, আজ রাত্রে আমার হাতথেকে সন্দেসের ধামি তুলে নিয়ে গেল। এই দেখুন্‌না, দেওয়ানজী-মোশাই!—হুগলী সহরের মধ্যে আর কার কি হয়েচে?

রামঠাকুর এতক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি পুলকে পূর্ণ হইয়া, একান্তমনে, এই গুরুগল্প শুনিতেছিলেন। কিন্তু তিনি আর থাকিতে পারিলেন না,—বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, কর্ত্তা-মোশাই! একটা মজা দেখেচেন,—সন্দেসই কেবল চুরি হচ্চে!! টাকাকড়ি গেল,—সোণা-দানা গেল,—চুরি হচ্চে কেবল ক্ষীর, সন্দেস, আর রসগোল্লা! যেন রঙ্গরসের তরঙ্গ-বয়ে চলেচে। এটা চুরি নয়,—ঠিক যেন শালা-ভগিনীপতির তামাসা আরম্ভ

হয়েচে!—ভোলানাথ! তুমি ঠিক্ ব'লো, এর ভিতর গুপ্ত রহস্য আছে কি না? কর্ত্তার কাছে সে সব কথা বল্‌তে দোষ নাই!—আর এখানেই বা অন্য কে আছে?

এইরূপ কথা কহিতে পাইয়া, রামঠাকুরের অন্তরে আর আনন্দ-রস ধরে না,—যেন উপ্‌চিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। যিনি পলকার্দ্ধ-কালের জন্য বসিবার তিলার্দ্ধ মাত্রও স্থান প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে তিনিই এককাঠা-প্রমাণ স্থান-জুড়িয়া বসিয়া অনন্ত সময় প্রাপ্ত হইলেন;—তাঁহার আনন্দ হইবে না ত কি? যিনি হৃত-সর্ব্বস্ব, অবমানিত হইয়া বিতাড়িত হইতেছিলেন, তিনিই এখন রাজ-রাজেশ্বর হইয়া সর্ব্বসুখভোগ করিতে লাগিলেন;—তাঁহার আনন্দ হইবে না ত কি?

ভোলানাথ, রামঠাকুরের কথায় যোড়-হাতে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, আমি গরীব-মানুষ;—আমার শালাও নাই, ভগ্‌গিন-পো'তও নাই। ঠাকুর-মোশাই! আমি কিছুই জানি না!—

আমি আপ্‌নাদের শরণ নিয়েচি, আমাকে রক্ষা করুন!”

রামঠাকুর। তুমি আমার কাছে মিথ্যা ব'লো না।—আমি সব জানি। তার আর লজ্জা কি?—খুলে বল,—কোন ভয় নেই!

ভোলানাথ। (ম্লানমুখে) ঠাকুর-মোশাই! আমি সত্যিই বল্‌চি—আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি না।—আমি বড় গরীব!

ভোলানাথের চক্ষু দিয়া টস্‌-টস্‌ জল পড়িতে লাগিল। ভোলানাথের ভাবনা হইল, এ-যাত্রা বুঝি আর উদ্ধার নাই! আমি বুঝি ধনে প্রাণে মজিলাম! ও-বেলা দারোগা আমায় আধ-মারা করেচেন! এ-বেলা, রামঠাকুরও ঠিক সেই সুরে কথা আরম্ভ করেচেন। এখানেও কি আমাকে শেষে মারখেতে হবে?

ব্যাপার কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া, কর্ত্তা বলিলেন, “ভোলা! তুই আজ ঘর যা! তোর কোন ভয় নাই। আমার বড় অসুখ করেচে—”

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি তবে চল্‌লাম! কিন্তু এ গরীবকে ভুল্‌বেন না! আমি বড় গরীব! আমার কেউ নাই!

ভোলানাথ উঠিবার উপক্রম করিল। কর্ত্তা কহিলেন, "টাকা রেখে যাচ্চ যে!"

ভোলানাথ দন্ত বাহির করিয়া কাতরস্বরে কহিল,—"আজ্ঞে—আজ্ঞে!—উটী গরীবকে মাপ কর্‌তে হবে! টাকা আমি এ রাজ-কাছারি থেকে নিয়ে যেতে পার্‌বো না—"

কর্ত্তা। ওরে পাগল! তুই আগে খালাস হ'; তা, দেখে আমার আহ্লাদ হোক্। তার পর বিশ পঁচিশ টাকা খরচ ক'রে ৺ মদনমোহনের এক-দিন মোচ্ছব দেওয়া যাবে।

ভোলানাথ। আজ্ঞে! তবে ঠাকুরের মোচ্ছবের জন্য এখন ৮৲ টাকা রৈল। কাল সকালে আর ১২৲ টাকা আন্‌বো। তা,—এসবই আপনার কাছে গচ্ছিত থাক্‌বে।

কর্ত্তা আর কোন কথা কহিলেন না।

ভোলানাথ স্বগৃহে প্রস্থান করিল। রামঠাকুর ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "তাই'ত—ভোলাবেটাও পালালো! এখন করি কি? উপায় কি?"

বাস্তবিকই রামঠাকুরের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। দীনদরিদ্রের হস্তে হঠাৎ একটী সাত-রাজার ধন মাণিক আসিল; কিন্তু অর্দ্ধদণ্ডপরে সে মাণিকটী উড়িয়া পলাইল। রামঠাকুরের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ। ইহাতে তাঁহার কষ্ট না হইবে কেন?

কর্ত্তা কহিলেন, "ঠাকুর-মোশাই! তবে তুমি যাও।—চাকরদিগে সে কথাটা বলে যেয়ো—"

রামঠাকুরের একটু যেন অভিমান হইল। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-ঠাকুরদাদার উপর শ্রীরাধা-রামঠাকুরের যেন দুর্জ্জয় মান উপস্থিত হইল। বৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীমতী-ঠাকুর-মোশাই এতক্ষণ বাঁকা বংশীধর শ্রীযুক্ত হরিতারণ দত্তকে একমুহূর্ত্ত না দেখিলে বাঁচিতেছিলেন না,—কিন্তু যাই অভিমান উপ-

জিল, অমনি কৃষ্ণপ্রেম ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন।

একটা চাকর কর্ত্তাকে দেখিতে আসিল। কর্ত্তা বলিলেন, "প্রদীপটা নিবাইয়া দিয়া কপাট বন্ধ করিয়া যাও।"

কার্য্য, কথানুযায়ী সম্পন্ন হইল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেহ যেন মনে না করেন, কর্ত্তার প্রকৃতই আজ অম্বলে বুকজ্বালা করিতেছে। কর্ত্তা বিকারী-রোগীর ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন বটে, কিন্তু ইহা জ্বর-বিকার নহে। পণ্ডিতগণ ইহাকে মানস-বিকার কহিয়া থাকেন। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে এ রোগের প্রকৃতি বড়ই ভয়ঙ্করী। জ্বর-বিকারের ঔষধ আছে, কিন্তু এ-বিকারের ঔষধ নাই।

মানস-বিকারে রোগী শীঘ্র প্রাণে মরে না বটে, কিন্তু অষ্টপ্রহর যন্ত্রণায় অস্থির হয়। কিছুতেই সুখ নাই, স্বস্তি নাই, সব শূন্যাকার। কাহারও সহিত কথা কহিতে বা কাহারও কথা শুনিতে, ভাল লাগে না। প্রিয়জন বিরক্তিভাজন হয়। অঙ্গে চন্দন লেপিলে, গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। ক্ষুধা-মান্দ্য হয়। পিপাসা বৃদ্ধি হয়। কণ্ঠ শুষ্ক হয়। বুক ধড়্ধড়্ করে। রাত্রে অনিদ্রা ঘটে। মাথা ঘুরিতে থাকে। মন ত্রাস-যুক্ত হয়। ইচ্ছা

হয়, মাটীতে মুখ গুঁজিয়া, চোখ বুজিয়া, চুপ করিয়া কেবল পড়িয়া থাকি, আর ভাবি। কিন্তু তাহাতেও সুখ নাই। প্রাণ কেমন আইঢাই-ছট্‌ফট্‌ করে। তখন মনে হয়, বুঝি গড়াগড়ি দিলেই ভাল থাকিব।

এইরূপ যন্ত্রণায় কাল কাটিতে থাকে। সহজে মৃত্যু হয় না। যেন তুষানলে অঙ্গ অল্পে অল্পে ধীকি-ধীকি পুড়িতে থাকে।

শ্রীযুক্ত রায় হরিতারণ দত্ত বাহাদুর—দেওয়ান-মহাশয়ের মানস-বিকার অদ্য কতমাত্রায় উঠিয়াছে, তাহা সু-সূক্ষ্মরূপে সু-পরীক্ষা করিয়া দেখা নাই-ই হউক, মোদ্দা তিনি এ-পাশ ও-পাশ ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন।

এতই যদি তাঁর কষ্ট, তবে তিনি ভোলা-ময়রার সহিত কথা কহিলেন কেন? সুহৃদপ্রবর রাম-ঠাকুরকেও যিনি কাছে বসিতে দিলেন না, তিনি ভোলা-ময়রার সঙ্গে অর্দ্ধদণ্ডের অধিক কাল বাক্যালাপ করিলেন কেন?

রামচন্দ্রের সীতা, 'প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী'। দেওয়ানজীর টাকা—প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী। বালক-বয়স হইতেই তিনি পয়সা ভাল বাসিতেন। আম-রুল শাকের রস দিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া, ময়লা-পয়সাকে তিনি চক্‌চকে করিতেন। ঝক্‌ঝকে রগ্‌রগে টাকা ভিন্ন, অপরিষ্কার টাকা তিনি কাহারও নিকট হইতে লইতেন না। কোথাও টাকার ঝুন্‌ঝুন্‌ শব্দ হইলে সেই দিকে কাণ পাতিয়া থাকিতেন;—প্রেমিকের নিকট অপ্সরা-কন্যার নূপুর-নিক্কণের ন্যায়, সে ধ্বনি তাঁহার নিকট সুমধুর, সুন্দর, সুখদ বোধ হইত।

ভোলাময়রা প্রথম যখন রামঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তা কয়, কাতর হইয়া 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' —ইত্যাকার শব্দ করে, কর্ত্তা তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বোধ হয় নিদ্রিতই ছিলেন,—বোধ হয় নিদ্রাবস্থাতে বড়ই বিরক্ত হইতেছিলেন। কিন্তু টাকার শব্দে এবং টাকার কথায় তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল। তখন ভোলা-

নাথের সকল কথাই তাহার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। ভোলানাথের মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে রতিপতি কামের ন্যায় কমনীয় বোধ হইতে লাগিল। এত যে যন্ত্রণা, এরূপ যে সহস্র বিছার দংশন,—কিছু ক্ষণের জন্য কর্ত্তা বোধ হয় সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। একটী হউক, আধটী হউক, লক্ষ হউক, কোটী হউক,—তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,—টাকা-জিনিসটাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব-ব্যাধি-হর, সর্ব্ব-সুখাকর, এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সামগ্রী।

ভোলাময়রা চলিয়া গেলে কাজেই কর্ত্তা আবার এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

ব্যাধির কারণ কি?—কিসে হঠাৎ এরূপ নিদারুণ মানস-বিকার উপস্থিত হইল।

ব্যাধির কারণ,—কালাচাঁদ।

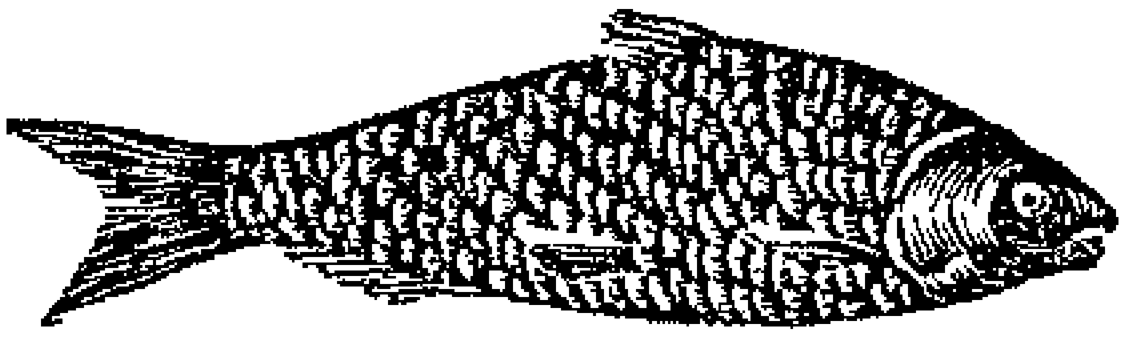

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তা ভাবিতেছেন, "করি কি? উপায় কি? মনে মনে যাহা যাহা ঠিক করিয়া রাখিলাম, সবই কি তাহার বিপরীত হইল? ভাবি এক, হয় অন্য। কেন এমন হয়? এই স্থবর্ণ কলসপূর্ণ বিশুদ্ধ দুগ্ধে কেন এক বিন্দু গোমূত্র পতিত হইতে দিব? পূর্ণিমার শশধরে কলঙ্ক-কালী কেন থাকিতে দিব? এই সোণার সংসারে এই দুরন্ত কালসাপকে কেন বাস করিতে দিব? আজ পঁচিশবৎসর কাল'ত এই চেষ্টাই স্বতঃপরতঃ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু মনোরথ পূর্ণ হইতেছে কৈ? তবে কি সত্যসত্যই বাসনা ফলবতী হইবে না? তবে কি এই বিভীষণ বিষধরই আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে?

"তাও কি কখন হয়? আমি জীবিত থাকিতে,—এই হরিতারণ দত্তের দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিতে,—তাহা কখনই ঘটিতে দিব না। এই

হরিতারণের প্রতাপে হুগলী সহরটা কাঁপিয়া উঠে,—ও-ছিনে-জোঁকটা'ত কোন্ ছার? আমি হুগলীতে একশত খুন করিয়া হজম করিতে পারি!—আমার কে কি করিবে? আমার ভয় কা'কে? আমি মনে করিলে আজই কালেক্‌টরি লুটাইতে পারি,—অথচ আমার বিরুদ্ধে একটীও সাক্ষী মিলে না! আমি মনে করিলে, এই দণ্ডে কালাচাঁদকে কাটিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া, তিল-তিল করিয়া, গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে পারি—অথচ, আমার কেহই কিছুই করিতে পারে না। কেলে-ছোঁড়াটাকে আমার ভয় কি? ওটা'ত শিশু,—বালক,—গলা টিপিলে দুধ বার হয়,—তেঁতুল-তলা দিয়ে গেলে ওর গলায় দই বসে,—ওকে আমার ভয়ই বা কি?—ভাবনাই বা কি? ওর আছে কি যে, ওর জন্য আমাকে চিন্তিত হ'তে হবে? কেলে-ভূতোটার বিষয় নাই, জমী নাই, টাকা নাই, বাড়ী নাই, ভীটা নাই, উনুন নাই,—আজ-খায়, এমন সংস্থান নাই;—কিছুই নাই,—তবে ও-ছোঁড়াটা আমার সঙ্গে সমান

টক্কর দিবে কিসে? জেল-খাটা, ঘানি-টানা, কয়েদ্-খালাসি, বদমাইস ফাঁসুড়ে, চোর—ওব আবার হুগলী-সহরে সহায়-সম্পত্তি কে হবে? কার্ হিম্মতে, কার্ হেমাকতে, ও-গাঁটকাটা-টা আমার সঙ্গে মোকদ্দমা লড়্বে? এমন কে আছে,—কার্ ঘাড়ে এমন দুটা মাথা আছে যে, সে ব্যক্তি কালা-চাঁদকে পশ্চাতে করিয়া বিবাদার্থ আমার সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইবে? অথবা এমনই বা কে আছে যে, সে ব্যক্তি কালাচাঁদকে সম্মুখে রাখিয়া, পশ্চাৎ হইতে আমার সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইবে? সে কি জানে না, আমি নবাব-বাবুকে জেল খাটাইয়াছি,—প্রাণকৃষ্ণ হালদারকে দ্বীপান্তর পাঠাইয়াছি,—নির্দ্দোষ হরচন্দ্রকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলাই-য়াছি?—সে কি জানে না, আমি রাণী বিন্দু-বাসিনীকে পথের ভিখারিণী করিয়াছি,—জমীদার জয়কালী মুখুয্যের ভিটায় ঘু-ঘু চরাইয়াছি,—মুচ্ছুদ্দি যাদবদত্তের মাথা প্রকাশ্য রাজপথে দ্বিখণ্ডিত করাই-য়াছি? এত জানিয়া-শুনিয়া, কে আমার সঙ্গে

সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে? তবে কালাচাঁদকে আমার ভয় কি? ও-ছোঁড়া আমার কি করিতে পারে? ও দুগ্ধপোষ্য বালকটা আমার কাছে কোথায় লাগে? আজই ত আমি ওকে মিছামিছি চোর বলিয়া হাতে হাতকড়ি দেওয়াইতে পারি!—ছয়মাস কারাগারে রাখাইতে পারি! দারোগা করিম সেখত আমার গোলাম,—গোলামের গোলাম!—তাকে যা বলিব, তাই সে করিবে! দারোগা, দু-বেলা বাসায় এসে যোড়হাত ক'রে দূরে দাঁড়াইয়া থাকে—সে, আমার কথায় কি না করিতে পারে? খবর দিলে, দারোগা আজই রাত্রে কেলেটাকে ধ'রে, বেঁধে নিয়ে যেতে পারে! ওদিকে ডেপুটী বকাউল্লা,—সে'ত পরম-বন্ধু। একবার তাঁকে চোখের ইঙ্গিত করলে, কেলেটার এক মুহূর্ত্তেই ছয়মাস জেল হয়ে যাবে! আমি পারি না কি? তবে কালাচাঁদকে ভয় কি?

ভয় কিছুই নাই। তবু মন কেমন ধুক্-ধুক্ করে! কেন এমন হয়? কেন এক একবার

বুকের ভিতর গুর্-গুর্ করিয়া উঠে! যাহা ভাবি, যাহা স্থির করি,—কেন তার উল্টা উৎপত্তি হয়? যাহাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিব,—এরূপ সঙ্কল্প ছিল, সে, কেমন করিয়া এরূপ বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় বাড়িয়া উঠিল? যাহার বিলোপ-সাধন জন্য, আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিয়াছি, সে-ই এখন বড় হইয়া, প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ধরিয়া, আমাকে মাছ-দই-সন্দেস ভেট দেয়, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, ভক্তিভরে দাদা বলিয়া ডাকে! তবে কি এই হরিতারণ দত্তের ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে? —শক্তির লাঘব হইয়াছে? তেজস্বিতার খর্ব্ব হইয়াছে? হরিতারণ দত্তের ঈষৎ দৃষ্টি নিক্ষেপে, সামান্য অঙ্গুলি-হেলনে দিক্ সমভূম হয়, কিন্তু আমার এই পঁচিশ বৎসরের তীব্র-কুটিল-কটাক্ষে, বিষম বাহ্বাস্ফোটেও—এই পিতৃমাতৃহীন নেংটী-ইন্দুর কালাচাঁদ, বিশাল শাল-দ্রুমবৎ বিপরীতরূপে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিল! ওঃ!—কেন এমন হয়?

ওঃ—ওঃ! কি নিদারুণ বিভীষিকা! প্রথম হইতে

আজ পর্য্যন্ত সকল কথা ভাবিতে গেলে, দেহে আর প্রাণ থাকে না। কালাচাঁদের আপন ঠাকুরদাদা কাটা পড়িল, কালাচাঁদের বাপও জ্বররোগে মরিল,—আমি ভাবিলাম, আপদ গেল, কণ্টক দূর হইল,—নহিলে জ্ঞাতিশত্রুদ্বারা চিরদিন হাড়ে-নাড়ে জ্বলিতাম! বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন শুনিলাম, কালাচাঁদের মা পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। শুনিয়াই মাথাটা কেমন ঘুরিয়া উঠিল। প্রথম ভাবিলাম, এ-কথা কখন সম্ভব হইতে পারে না। কালাচাঁদের পিতার তিন মাস হইল মৃত্যু হইয়াছে;—সুতরাং তাহার স্ত্রীর গর্ভ হইবে কিরূপে? ক্রমশ শুনিলাম, গর্ভ প্রকৃতই বটে! মনটা বড়ই খারাপ হইল! ভাবিলাম, স্ত্রীলোকটাকে ভ্রষ্টা বলিয়া তাড়াইয়া দিই না কেন? মনে হইল, এ কাজে তত সুবিধা হইবে না;—বরং গোলযোগ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। বিশেষ গিন্নী (আমার স্ত্রী) উহাকে সতী-লক্ষ্মী বলিয়া থাকেন। তার পর ঠিক হইল,—গর্ভস্রাব

করাইয়া দিলে ক্ষতি কি? চেষ্টাও হইল,—হতভাগী ঔষধও খাইল,—কিন্তু কিছুই ফল হইল না। গর্ভ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রকৃতই আমার ভয় হইল। আমি তখন কৌশলে যোগাড়যন্ত্র করিয়া হতভাগীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। ভাবিলাম, বর্ষাকাল, শ্রাবণমাস, নদ-নদী খাল-বিল পূর্ণ,—পথসমূহ কর্দ্দমক্লিষ্ট এবং পিচ্ছল,—এ-সময় ঝড়বৃষ্টি-বজ্রাঘাতেরইবা অভাব কি? ডুলি করিয়া গেলেও, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের এ-সময় নিশ্চয় প্রাণ-সঙ্কট হইবে। একটী খুব খারাপ দিন দেখাইয়া, অশ্লেষা, দিক্‌শূল, পাপযোগ দেখিয়া, বারবেলায় হতভাগীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু ইহাতেও কিছুই হইল না। অবশেষে মনকে দৃঢ় করিলাম,—বেটা হবে, কি মেয়ে হবে,—তার ঠিক নাই!—আমি এখন এত মিছা ভাবিয়া মরি কেন? বিশেষ, জন্মিয়াই অনেক শিশু প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। আরও এক কথা,—গর্ভবতী স্ত্রীলোককে নদীপার হইতে নাই;—হতভাগী নয়মাস গর্ভে

সাতটা নদী খাল পার হইয়াছে। অতএব, পুত্রই হউক, আর কন্যাই হউক,—ছেলেটী কিছুতেই বাঁচিবে না,—কিছুতেই তিনদিন পার হইবে না।

এইরূপ আশ্বাসে বসিয়া আছি, এমন সময় একদিন সংবাদ পাইলাম, হতভাগীর একটী পুত্র-সন্তান হইয়াছে। বুকটা অমনি ধ্বসিয়া গেল। কি করি—উপায়ত নাই!—তিনদিন কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। জন্মক্ষণ জানিয়া পাঁজি খুলিয়া দেখিলাম,—শনিবার অমাবস্যায় ছেলেটা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। মনে অল্প আহ্লাদ হইল। অমাবস্যার ক্ষণে জন্মিয়াছে,—তাহাতে আবার শনি-বার পাইয়াছে,—সুতরাং এ ছেলে কিছুতেই বাঁচিবে না। একজন আচার্য্যকে ডাকাইলাম। কথা-প্রসঙ্গে কৌশলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অমাবস্যার রাত্রি, শনিবারে কোন ছেলে জন্মিলে, সে ছেলেটা বাঁচে কিনা? আচার্য্য পুঁথি খুলিয়া, শ্লোক আওড়াইয়া,—বলিলেন, 'যখন ভাদ্রমাস, শনি-বার, অমাবস্যা এবং রাত্রিকাল,—মঙ্গলের দশা,

রাক্ষসগণ,—তখন সে-ছেলে কিছুতেই বাঁচিবে না। এই দেওয়ালে লিখে রাখুন,—একবৎসর মধ্যে সে-ছেলের মরণ নিশ্চয়।' মনটা তবু কতক আশ্বস্ত হইল!

এক বৎসর উত্তীর্ণ হইল, তবু কালাচাঁদ মরিল না। চর পাঠাইয়া সংবাদ লইলাম,—সে আসিয়া বলিল, ছেলেটা কালো কিট্‌কিটে হইয়াছে,—ঠিক্ যেন ধান্‌সিজে-হাঁড়ির তলা। সেটা মামার বাড়ীতে ভাল খেতে-মাখ্‌তে পায় না। লোকের ছাঁচ-তলায়, আঁস্তাকুড়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। কাহাকেও কিছু খাইতে দেখিলে, সে তাহার মুখটী-পানে চাহিয়া থাকে। তার মামারা গরীব,—কোথা কি পাবে? শুনিলাম, দুধের বদলে কেলেটাকে ফেন খেতে দেয়। কেলেটার চেহারা দেখিলে মনে হয় ঠিক্ যেন, সেওড়া-গাছের ভুত।

এ কথা শুনিয়া তবু মনটা একটু ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম, ছোঁড়াটা মামার বাড়ী না খেতে পেয়েই মরিয়া যাইবে। পাঁচ সাত বৎসর এই ভাবেই

কাটিল,—আমিও তাহার মরণ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

কিন্তু দুঃখ এই, অদৃষ্টের ফের-ঘোর এমনি যে, কালাচাঁদ মরিল না। পরম্পরায় শুনিলাম, কালাচাঁদ বেশ মোটাসোটা হইয়াছে,—বর্দ্ধমানে রাজার স্কুলে পড়িতেছে,—এবং দিব্যসুখে আছে। একথা শুনিয়াইত আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তখন রাগ করিয়া লাভ কি? ভাবিলাম, একবার কালাচাঁদকে বর্দ্ধমান থেকে আনাই না কেন?—দেখি না কেন,—কেমন হইয়াছে। লোকের কথা সত্য কি মিথ্যা, একবার স্বচক্ষে দেখিয়া সে বিষয় পরীক্ষা করিয়া লই না কেন? বর্দ্ধমানে তার মামাকে চিঠি লিখিয়া কালাচাঁদকে আনাইলাম,—তাহার মূর্ত্তি যাহা দেখিলাম, তাহা বড় আশাপ্রদ নহে,—ঠিক্ যেন গুলি-বাঘ! বড় বড় চঞ্চল চোখ দুটা যেন চর্‌কি ঘুরিতেছে! নাকে-মুখে-চোখে যেন কথার ফোয়ারা উঠিতেছে! খায় ঠিক্ রাক্ষসের মত। সেই ছেলে-বয়সেই একদমে

ছয়গণ্ডা লুচি খেয়ে ফেলিল। পাড়ার ছেলে-গুলাকেত মেরে-ধরে, কামড়ে-কুমড়ে পাড়াছাড়া করিল। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে, ঠিক্ যেন ডাকাত-পড়া-গোছ প'ড়ে, মা-দুর্গাব মুকুটখানি ছিঁড়িয়া লইয়া পলাইল। অবশেষে কালাচাঁদ কিনা, বাছা স্থরে-শের গালে এক চড় মারিল। বাছা সুরেশ অমনি ঘুরিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইল। আমার তখন ইচ্ছা হইল, কেলেটাকে দু-আধখানা করে কেটে মাটীর নীচে পুঁতে ফেলি! কিন্তু চারিদিক্ দেখিয়া, পাঁচ সাত ভাবিয়া'ত কাজ করিতে হয়! আমি মনে করিলাম, কালাচাঁদকে যদি এখন আমি কিছু বলি, তবে গ্রামের সকল-লোক আমাকে দোষ দিবে। বলিবে,—ও-ছেলেটীর মা-বাপ নাই বলে কি, ওর বুড়ো ঠাকুরদাদার ওকে অমন করে মারা উচিত হয়েছে? এইরূপ আমি সাত-পাঁচ নানা-খানা ভাবিয়া, কালাচাঁদকে তার পর দিনই মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। এখন মনে হইতেছে—সে কাজটা আমারই চুক হইয়াছিল,—শীকার হাতে

পাইয়াছিলাম,—ছাড়িলাম কেন? দু-দশদিন পরে তখনই একটা এস্পার ওস্পার করিলেই ভাল হইত!—কালাচাঁদের মামাকে না হয় একটা চিঠি লিখিতাম,—"হঠাৎ সর্পদংশনে কালাচাঁদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সকলি ৺মরজি! বাছার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি অন্ধ হইয়াছি।"—কিন্তু তখন সে বুদ্ধি আমার ঘটে আসিল কৈ? আর আমিই বা তখন কেমন করিয়া বুঝিব যে, কালাচাঁদ ক্রমশ এমন দারুণ দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠিবে? সে সময় একদায়ে কিন্তু গুরু রক্ষা করিয়াছিলেন। গিন্নী তখন কাশী গিয়াছিলেন। আজিকার যে রকম ভাবগতিক দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, গিন্নী যদি সে সময় বাটীতে থাকিতেন, তাহা হইলে কালাচাঁদকে লইয়া কাঁধে করিয়া নাচিতেন,—হয়ত বলিতেন, কালাচাঁদ এইখানেই থাক্‌বে, আর তার মামার বাড়ী যাওয়া হবে না। আমার পূর্ব্বজন্মের অনেক পুণ্যবল ছিল, তাই গিন্নী তখন বাটীতে থাকেন নাই। সে যাহা হউক, এখন

গতকর্ম্মের অনুশোচনা করা বৃথা। উপস্থিত কিসে রক্ষা হয়, তাহা ভাবাই ভাল।

আচ্ছা,—তেমনটা কেন হইল?—সবইত ঠিক্ হইয়াছিল, চারে মাছ আসিয়াছিল,—টোপ গিলিয়াছিল,—তবে এমন ফস্‌কাইল কেন? কালাচাঁদেব মামাকে ৭০১৲ টাকা নগদ গণিয়া দিলাম,—হৃষ্টচিত্তে সে টাকা লইল। একরাত্রি বাটীর ভিতর টাকা রাখিল। নগদ কর্‌করে টাকার উপব অবশ্যই তাহার মায়া জন্মিল,—সে বোকা প্রাতে হঠাৎ টাকাগুলা ফেরত দিল কেন? টাকা সিন্দুকজাত হইবাব পর সে টাকা কি কেহ ফেরত দিতে পারে? বিশেষত, কালাচাঁদের ঘর-ভিটা পুকুর-বাগান বিক্রয় হইয়া গেলে, তার মামার কি ক্ষতি ছিল? ক্ষতি ত কিছুই দেখি না।—কিন্তু তথাচ মামা টাকা ফেবত দিল কেন? আমি যে কৌশল-জাল পাতিয়াছিলাম, তাহা কি বুঝিতে পারিয়া, মামা আমাকে ফিরাইয়া দিল? সে তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? তাহাকে আমার সম্পত্তির

কার্য্য-নির্ব্বাহক নিযুক্ত করিব বলিয়াছিলাম,—এক-শত টাকা মাসিক বেতনেরও কথা আভাস দিয়া-ছিলাম,—কৌশলে খস্‌ড়া-উইলনামাও দেখাইয়া-ছিলাম,—দেখিয়া-শুনিয়া, সকল কথাইত সে বিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বাস যদি না করিবে, তবে সে টাকা লইবে কেন? রাত্রে কি তার বুদ্ধি বাড়িল? রাত্রিকালে শুইয়া-শুইয়া, ভাবিয়া-ভাবিয়া, সে, কি বুঝিতে পারিল যে, আমার সবটাই ফাঁকি,—ষোলকড়াই কাণা? বর্দ্ধমানে কোন বন্ধুর বাটীতে আমি সেই দরোয়ানটীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; দ্বারবানকে লুক্কায়িত করিবার কথা রাত্রে কি কোনরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল? প্রকাশ পাইবারত কোন সম্ভাবনা দেখি না। আর প্রকাশ পাইলেই বা আমার মনোগত অভি-সন্ধি কিছুতেইত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কালাচাঁদের ঘরভিটা এবং উইল,—তুইটা এক-সঙ্গে রেজষ্টরি করিব,—ইহাই মামাকে প্রস্তাব করা আমার স্থির ছিল। যদি ঘরভিটা কোন গতিকে

রেজষ্টরি না ঘটে, তাহা হইলে তখনই পলাইবার উপায় বিধান জন্য খানসামা দ্বারা দ্বারবানকে ডাকাইয়া বলাইব,—"আপনি শীঘ্র বাটী চলুন,—সুরেশের ব্যারাম"—ইহাও স্থির ছিল। কিন্তু এই মানসিক গূঢ় সঙ্কল্পের বিষয় প্রকাশ হইবার কোনও উপায় ছিল কি? দ্বারবানত অবিশ্বাসী নহে। খানসামাত প্রভুভক্ত;—তবে কালাচাঁদের মামা কেমন করিয়া টের পাইবে, আমার সকলি ভুয়া-বাজী!—উইল-রেজষ্টরী মিথ্যা—ফাঁকি দিয়া কালা-চাঁদের ঘরভিটা লওয়াই কেবল সত্য!!

তবে কি করুণাময়ী, মামাকে ভাঙ্গাইল? সে নচ্ছার ছুঁচোবেটী ভাঙ্গচালি দিবার কে? কালা-চাঁদের ভিটা আমি টাকা দিয়া কিনিব,—তাতে বাধা দিবার জন্য তো-বেটীর মাথাব্যথা পড়ে কেন? কালাচাঁদ তোর কে হয়? তোর কি? সে-দিন অদৃষ্টে কতই না কর্ম্মভোগ ছিল! সেই পাড়া-মজানি বেশ্যাটাকে জানেলার কাছে আনিয়া দুটা মিষ্ট কথায় বুঝাইবার জন্য কতইনা আমাকে

টাকার ঝন্‌ঝনানি শব্দ করিতে হইয়াছিল? শুনিয়াছিলাম, ও-বেটী কালাচাঁদ-গত প্রাণ হইয়াছিল,—তাই তাহারও তোযামোদ কবিতে বাধ্য হইয়াছিলাম! কিন্তু কি আপ্‌শোষ! মাছ গাঁথিয়া খেলাইবার সময় ডোর ছিঁড়িয়া গেল! ও-বেটী যেমন আমার মনে সে-দিন কষ্ট দিয়াছিল, তেমনি সে, শেষে নিজে কষ্ট পাইল! দিনকতক পরে উপপতিটা মরিল,—কালাচাঁদ পলাইল, শেষে নিজে না খেতে পেয়ে, ঘরে মরে, তিনদিন বাসিমড়া হয়ে, ঘরের ভিতর পচিল। আমাকে কষ্ট দিয়ে কেহই সুখে থাক্‌তে পারে না। যে আমাকে কষ্ট দিবে,—একটা না-একটা তার বিভ্রাট ঘটিবেই।

সত্য সত্যই কি করুণার জন্য সেই মহা-উদ্দেশ্য সফল হইল না?—তাই কি?—কেমন করিয়া নিশ্চয় বলিব?

অথবা বুঝি আমার দুরদৃষ্ট এবং কালাচাঁদের শুভাদৃষ্ট-নিবন্ধনই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে!! তেমন কৌশলময় সূক্ষ্ম পাকা ওস্তাদি জালে মাছ

পড়িয়া ছিঁড়িয়া পলাইল,—তখন অবশ্যই কালাচাঁদের ভাগ্যবল বলিতে হইবে!

আচ্ছা,—সব কথাই ছাড়িয়া দিলাম। কালাচাঁদের অদৃষ্ট না হয় খুব ভাল বলিয়াই মানিয়া লইলাম, তথাচ তাহারত তিনবৎসর জেল হইল,—ঘানিগাছে ঘুরপাক দিতে হইল। কালাচাঁদকে কারাগারে পাঠাইবার প্রধান উদ্যোগকারী কে? আমি গোপনে তদ্বির না করিলে, কালাচাঁদ নিশ্চয়ই খালাস পাইত। সে যেরূপ কৌশল-জাল পাতিয়া জজের মন ভুলাইয়াছিল, তাহাতে জুরিগণও একবাক্যে 'কালাচাঁদ নির্দ্দোষ' এই কথা বলিত। সৌভাগ্যক্রমে জুরি আমার বশে ছিল,—তাই যা'হোক তিনবৎসর মিয়াদ হইল,—নচেৎ জজকে হস্তগত করিতে পারিলে, নিশ্চয় তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইত। অভিযোগ অতীব গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কেলে-ছোঁড়াটা জেলে গেল,—আমি ভাবিলাম, ছোঁড়া এইবার নিশ্চয় মারা পড়িবে। জেলের

ঘানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাছার বত্রিশ-নাড়ী পাক পাইবে। শেষে চিঁ-চিঁ ডাক ছাড়িয়া বাছাধনকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; ইহাই আমার ধ্রুব ধারণা ছিল। এমন কি, আমি একবৎসর পরে নাএব-দারোগাকে পর্য্যন্তে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, "কালাচাঁদের যদি কোন ভালমন্দ ঘটে, তবে তৎ-ক্ষণাৎ যেন আমি সংবাদ পাই।" নাএব-দারোগা বড়ই বোকা। সে সপ্তাহে সপ্তাহে আসিয়া সংবাদ দিত, "আপনার কালাচাঁদ বেশ আছেন,—কোন কষ্ট নাই।" আরে আহাম্মক। আমি কি কালাচাঁদের শুভ-সংবাদ খুঁজিতেছি? আমি যে, কালাচাঁদের মৃত্যুসংবাদ পাইবার কেবল কামনা করিতেছি !! যাহা হোক, সেই দারুণ গাধা দারোগাটাকে দেখিলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত! কিন্তু কি করি? "কালাচাঁদ আছেন ভাল"—তাহার মুখে এ কথা শুনিয়া আমাকে অগত্যা প্রতি সপ্তাহেই একবার কাষ্ঠ হাসি হাসিতে হইত!

উঃ। হিসাবের এত তফাৎ হয় কেন? কারাগারে কালাচাঁদের নিশ্চয়-মৃত্যু ভাবিয়া ঠিক এই সময়েই আমি তাহার ভিটাটুকু দখল করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে এখন প্রকাণ্ড ত্রিতল ইমারত। কালাচাঁদ এখন যদি তাহার ঘরভিটা চায়,—তবে তাহা কেমন করিয়া দিব?—গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া তাড়াইয়া দিব,—বলিব, "কোথা তোর ভিটে, তা কে জানে?" যদি বেশী বাড়াবাড়ী করে,—বলিব, 'তামাদি হইয়াছে,—আর নালিস চলে না।' শেষে ত কালাচাঁদকে অবশ্যই ঐ কথা বলিব,—কিন্তু আমার এরূপ হিসাব ভুল হইল কেন? ভিটাটুকু এতদিন ফেলিয়া রাখিলাম,—আর চারিদিক না দেখিয়া কারাবাসকালে কেনই বা লইলাম?

কালাচাঁদ কারাগার হইতে বাহির হইল,—শুনিলাম, খুব হৃষ্টপুষ্ট যুবাপুরুষ হইয়া আসিয়াছে। জেলখানা,—যমের দক্ষিণদ্বার স্বরূপ। কেলে-ছোঁড়াটা কিনা সেখান থেকে ফিরিয়া আসিল!—

শুধু ফিরিয়া আসিল,—মোটা হইয়া ফিরিল! লোকমুখে এসব কথা শুনিয়াইত আমার চক্ষুস্থির।

ক্রমশ পরম্পরায় আরও শুনিলাম, কালাচাঁদ জেলখানা হইতে অনেক টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছে। সহসা সে কথা বিশ্বাস হইল না। তারপর এমন কথাও কর্ণগোচর হইল,—কালাচাঁদ দানধ্যান আরম্ভ করিয়াছে। গরীব দুঃখীকে দেখিলে সিকি আধুলি দেয়, কাপড় কিনিয়া দেয়। এসব কথা শুনিয়া আমার আর রাত্রে ঘুম হয় না। কেবলই তখন মনে হইতে লাগিল, "কেলেটা কল্লে কি!" পতে নাপ্‌তেটারই বা কি আক্কেল?—কি রকম হেমাকৎ? এ হুগলী সহরে কালাচাঁদকে বাসা দিবার জন্য তোকে কে সেধেছিল? ইচ্ছা হয়, পতেটাকে জুতিয়ে আটাপেটা করি। তা, জুতো খেলেওত পতের লজ্জা নেই। ঐ পতেটাই কালাচাঁদকে সঙ্গে করে আমার বাসায় এসেছিলো। আমি তখন কালাচাঁদের চেহারা

দেখিয়াই চটিয়া গেলাম! তুই কেলে ছোঁড়া।—তোর মা নেই, বাপ নেই,—লোকের পাত কুড়িয়ে খেয়ে, তুই মানুষ,—তুই এমন মোটা-সোটা 'গাড়ুর-গুপ্‌সো' হ'তে গেলি কেন? যেমন মানুষ, তেম্‌নি থাক্! তোকে সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করিতে এখানে কে আসিতে বলিযাছিল? তুই আমার চোখের সাম্‌নে আস্‌বার কে? বেরো হত-ভাগা, বেরো আমাব বাড়ী থেকে!! সে-দিন এমনি রাগই হয়েছিল। দেখিযাই যাকে বিরক্তি বোধ হয়, তার সঙ্গে আর কথা কহিব কি? কেলেটার সঙ্গে সে-দিন বিশেষ কোন বাক্যালাপও করিলাম না,—দুই-এক কথা কহিয়া মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া রহিলাম।

বাক্যালাপ করিলাম না বটে, কিন্তু মনটা সেই দিন হইতেই দমিয়া গেল। প্রথম চিন্তা হইল,—পতে নাপ্‌তেটাকে এ-দেশ থেকে তাড়াইবার উপায় কি? বৃক্ষে পাখী বাসা করিয়াছে,—বৃক্ষটীর মূলচ্ছেদ করিলেই পাখীটী পলাইবে! পতেটার ঠ্যাং খোঁড়া

করিয়া দিলে হয় না ? পতেটা ডুলি করিয়া দেশে গিয়া ভুগুক,—আর কালাচাঁদও একদিক্ দিয়া পলাইয়া যাক্। না,—প'তের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুটিয়া আনিব ? অথবা তাহার ঘর জ্বালাইয়া দিব ? গৃহদগ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা ! প'তের দুখানি ঘরই পুড়িয়া ছাই হইবে,—কালাচাঁদও স্থানাভাবে অন্যদেশে যাইতে বাধ্য হইবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, গৃহদগ্ধের উদ্যোগ আদি করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম,—কালাচাঁদের পয়সা কমিয়াছে, মুদীর দোকানে ধার হইয়াছে, পতিতেরও সহিত তাহার মাঝে মাঝে একটু আধটু ঝগড়া-বচসা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কৌশলে পতিতকে ডাকাইলাম। মিষ্ট কথায় নাপিতকে ভুলাইলাম। পতিতকে বাটীর ক্ষৌরকার নিযুক্ত করিলাম। চৈত্রমাসে চড়কের দিন পতিতকে দুইটী টাকা সন্দেস খাইতে দিলাম। পতিত আমার গোলাম হইল। নাকবেঁধা পশুর মত পতিতকে তখন যা বলি, তাই সে করে।

কৌশলে পতিতের নিকট প্রস্তাব করিলাম,—"তোমার বাসা হইতে কালাচাঁদকে শীঘ্র তাড়াইয়া দূর করিতে হইবে।" তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "কালাচাঁদ চোর, ডাকাইত, ফাঁসুড়ে। কালাচাঁদ লোকের গলায় ছুরি দিতে পারে। হয় ত তোমাকে একদিন খুন ক'রে, তোমার বাক্স ভেঙ্গে কালাচাঁদ চলে যেতে পারে! দেখ্‌চো না উহার চেহারা? ঠিক যেন যমদূত। ও লোকটা কত গৃহস্থের যে সর্ব্বনাশ করেছে, সে কথা তোমাকে কি আর বল্‌বো! পাকা ডাকাত না হ'লে, কি আর ও জেল খাটে?"

পতিত আমার কথার উত্তর দিল, "আজ্ঞে, আপ্‌নি যা ব'লচেন,—সবই ঠিক কথা। আমি এত দিন ঠাওরাইতে পারি নাই। এখন আমাকে যা আজ্ঞা কর্‌বেন, তাই কর্‌বো!—পতিতত আপনা-ছাড়া নয়।"

আমি। কালাচাঁদের এখন চলে কিসে?

পতিত। মাথামুণ্ড চল্‌বে আর কিসে?

দু-পাঁচ টাকা জেল থেকে চুরি করে এনেছিলো, তাই দিন কতক একে ॥০ আনা, ওকে ১৲ টাকা দিয়ে বাবুগিরি করা হলো। আমি তখন তাকে ঢের নিষেধ কর্‌লাম,—তা, তখন টাকার গরমে সে, আমার কথা শুন্‌বে কেন? পতিতের কথা বাসী হ'লেই মিষ্টি লাগে! পতিত যা বলে-ছিলো, শেষে তাই এসে ঘট্‌লো! আমি মর্‌বো কবে, তা'ই বল্‌তে পারি না,—নচেৎ আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে পতিত কি না জানে? আর-বছর ছিষ্টিধর ঘোষকে বলে এলেম, তোমার বিষয় থাক্‌বে না,—আর এ বছর সেই বিষয় অষ্টমে চড়্‌লো!

আমি। এখন কালাচাঁদের তবে কি হচ্চে?

পতিত। এই হরে মুদীর উঠ্‌নোর দেনা আঠার টাকা হয়েছে,—পর্‌শু আমি তাকে টীপে দিয়ে এলাম, নগদ পয়সা ভিন্ন তুমি পাই-পয়সার জিনিস কালাচাঁদকে দিও না। শেষে যে তুমি পতিতকে দূষবে, তা কখন হ'তে পারে না।

পতিত কারু কখন সিকি পয়সা ধার করে না। পতিতই বরং লোককে ধার দেয়।

আমি। দোকানদার কি কালকুটেটারে উঠ্‌নো আর যোগাইল?

পতিত। আজ্ঞে, না,—উঠ্‌নো আসিল না দেখিয়া, কালাচাঁদ এদিক-ওদিক চারিদিক চাইতে লাগ্‌লো—চাল নাই, ডাল নাই, নুন নাই, তেল নাই, হাঁড়ীটেও ফাটা,—তা, চারিদিক-পানে চাইলে ত হাঁড়ী-কাঠ-নুন-তেল-চাল-ডাল আইসে না!—আমি কালাচাঁদের গতিক দেখিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলাম! আমার ভয় হইল, পাছে কালাচাঁদ আমার নিকট হইতে পয়সা ধার চায়। কর্ত্তা-মোশাই! আপনিই বলুন, আমি কালাচাঁদকে কত আর ধার দিব? দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই,—সদাই তার পেটের ভাতের জন্য পয়সা চাওয়া। আমি একলা পতিত কত দিক্ সাম্‌লাবো বলুন? প্রত্যহ আমাকে ৺ লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য একটী পয়সা রাখ্‌তে হয়,—ভাল

বামুন দেখিয়া প্রত্যহ আমি একটী করিয়া পয়সা দান করি,—কাণা-খোঁড়াকে দিতে প্রত্যহ গড়ে দুইটী করিয়া পয়সা যায়,—তা আমি গরীব-মানুষ, আর কোথা কি পাবো?—কালাচাঁদকে খাওয়াতে নিত্যি নিত্যি পয়সা কোথা পাবো?

আমি। তবে কি গত পরশ্ব কালাচাঁদ খাইতে পায় নাই?

পতিত। কর্ত্তা-মোশাই! কালাচাঁদের কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে এসে শুন্‌লাম,—কালাচাঁদ পথে তিনটী পয়সা কুড়াইয়া পাইয়াছে। তাহাতেই মালসা কিনেচে, চাল্‌ কিনেচে,—কার্‌ বাগান থেকে চুরি করে কাঠ ভেঙ্গে এনেচে,—এই সব যোগাড় করে ভাত ফুটিয়ে গণ্ডে-পিণ্ডে খেয়েচে। সে খাওয়ার চোট্‌ কি মোশাই! তিনটী পয়সার মধ্যে দুইটী পয়সা,—ঐ খাওয়ার খরচ,—আর এক পয়সায় অম্বুরী তামাক কিনেচে। আমি বাসায় ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে, কালাচাঁদ হেসে হেসে আমাকে

ডাক্‌লে, "এসো এসো বন্ধু এসো!—একবার অম্বুরী তামাকটা খেয়ে যাও!" আমি এ-কথা শুনে ভয়ে আর বাঁচি না। ভাব্‌লাম,—বিষ খাইয়ে আমাকে মার্‌বে নাকি? কি করি, ঘরে যখন কালসাপ পুষেচি, তখন চারা কি আছে? কর্ত্তা-মোশাই! আমাকে আর যা বলুন, সব কর্‌তে পারি,—বাঘের মুখে আমি ঢুক্‌তে পারি, কিন্তু অমন গোঁয়ার-গোবিন্দ লোকের কাছে আমি ঘেঁস্‌তে পারি না। কি জানি, পাছে যদি সে একটা চড়িয়ে দেয়, তা'হলে ত একবারেই গেছি! তার আঙ্গুল নয় ত ঠিক যেন আছোলা বাকারি! তখন ছিমধুসূদনের নাম স্মোরণ করিতে করিতে আমি কালাচাঁদের কাছে যেয়ে উপস্থিত হ'লাম। আমাকে দেখেই তার অমনি খিল খিল হাসি আরম্ভ হলো।

আমি। আচ্ছা। সে কথা যা'ক্। হরে মুদীকে এখনি তুমি আমার নাম করে ডেকে নিয়ে এসো। আজই ছোট আদালতে কালাচাঁদের নামে

নালিষ দায়ের করে দাও। নালিষের নাম শুন্‌লেই কেলেটা ভয়ে পালিয়ে যাবে। আর তুমিও গিয়ে বল্‌বে,—"কালাচাঁদ! আমার বাড়ী থেকে তুমি এখনি চলিয়া যাও!"—

হায়! এইরূপ কত উদ্যোগ-সংযোগ করিলাম, কত কৌশলে কেমন পাকা ফাঁদ পাতিলাম,—কিন্তু আজ সবই ব্যর্থ হইয়া গেল! গত কল্য হরে মুদীকে দিয়া ছোট আদালতে কালাচাঁদের নামে নালিষ করাইলাম, পতিতকে দিয়া তাহার বাসা হইতে তাড়াইলাম,—কিন্তু অহো! আজ কিনা সেই কালাচাঁদ মাছ হাতে করিয়া, দই-সন্দেস-তরকারি ভেট লইয়া আসিয়া, আমাকে দাদা বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল!!

আমি যতই তার বুকে পাথর চাপান্‌ দিতে চাই, ততই সে ফুলিয়া উঠে। যতই তাহাকে হ্রস্ব করিবার যত্ন করি, ততই সে দীর্ঘ হইয়া দাঁড়ায়। আমি যতই তাহার মৃত্যু কামনা করি, ততই সে যেন অমর বর পাইয়া, ধেই-ধেই রবে

আমার সম্মুখে বিকট নৃত্য করিতে থাকে। জানি না, ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কি লেখা আছে! আমি বুঝি মজিলাম! ডুবিলাম! মরিলাম!

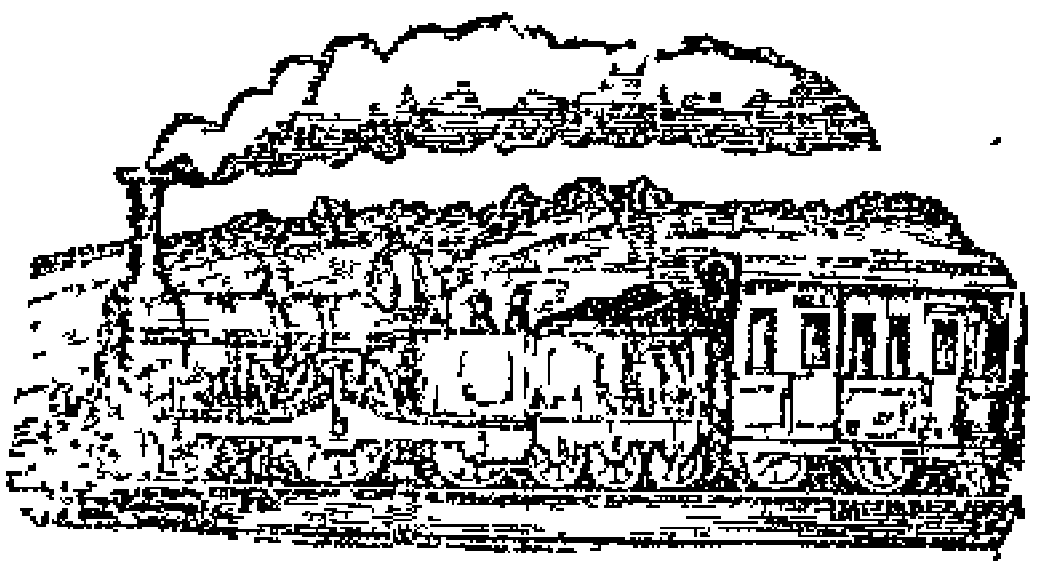

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অদ্য প্রাতে যখন মাছ হাতে করিয়া কালাচাঁদ আমাকে "অ, দাদা-মোশাই!" বলিয়া ডাকিল, তখনি তার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিলাম, একি?—একি?—যেন এক বিষম বিভীষিকা দেখিয়া উঠিলাম! একি ভূত, প্রেত, যক্ষ, না যমদূত? কল্য যাহার একটী মাত্রও পয়সা সংস্থান ছিল না, কল্য যাহাকে অভুক্ত অবস্থায় বিতাড়িত করিয়াছি, কল্য যাহার ছিন্ন মলিন বসন ভিন্ন সম্বল ছিল না,—সে আজ কেমন করিয়া নববস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, হাসি-হাসি মুখে, মাছ-দই-সন্দেস ভেট লইয়া আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে? এ ব্যাপার দেখিয়াইত দেহে আর আমার প্রাণ রহিল না! প্রথম মনে হইল, এই লোকটা কি কোন বহুরূপী?—কালাচাঁদের মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছে কি

কি? তখনি আবার মনে হইল,—ইহা কিছুই নহে,—আমি বুঝি কেবল আতঙ্ক-যুক্ত স্বপ্ন দেখিতেছি। শেষে দেখিতে দেখিতে স্থির বুঝিলাম, ইহা বহুরূপীও নহে, স্বপ্নও নহে,—ইহা সত্য-সত্যই কালাচাঁদ! তখন যদি আমার সম্মুখে বজ্রাঘাত হইত, অথবা মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাহা হইলে আমি তত আশ্চর্য্যান্বিত বা কাতর-যুক্ত হইতাম না।

কিন্তু কি করি? উপায়ত কিছুই নাই!—চারিদিক চাহিয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার ভাবনা হইল, কালাচাঁদ বুঝি ভিটার ভাগ চাহিতে আসিয়াছে। বুঝি আমার ত্রিতল দালানের ইট এক একখানি করিয়া, খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, কালাচাঁদ দড়ি ধরিয়া ভিটার ভাগ লইতে উদ্যোগী হইয়াছে।

আমার মনে হইল, কালাচাঁদের পশ্চাতে ··ক্ষ্য শত শত লোক আছে। কালাচাঁদ একা ·যন সৈন্যদল-পরিবেষ্টিত সেনাপতি।

এখন আমার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছে, কালাচাঁদ কোন লোককে কল্য রাত্রে সহায়-সম্পত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আজ তাই তাহার উপদেশ মত, সৌহার্দ্দভাবে বিষয়ের অংশ লইতে কালাচাঁদ আসিয়াছে। সে লোক অবশ্যই বলিয়াছে, যদি বন্ধুত্বে কার্য্যশেষ না হয়, অন্তিমে নালিষ করাইয়া বিষয় দখল দেওয়াইয়া দিব। তাই সে ব্যক্তি মাছ-দই-সন্দেস দিয়া, প্রথমত কালাচাঁদকে আমার কাছে পাঠাইয়াছে!

বিষয় কি?—সুতরাং কালাচাঁদ তার অংশ লইবেই বা কি? যদি দুষ্ট লোকের দুষ্ট পরামর্শ শুনিয়া কালাচাঁদ বলে,—মৎকৃত এই অতুল বিষয়, জমীদারী সমস্তই পৈতৃক ধনে খরিদ,—তখন উপায়!! কালাচাঁদ যদি আদালতে বলে, "ঠাকুরদাদা দেওয়ানী কাজ করেন, ৫০৲ টাকা মাত্র মাহিনা পান,—তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে কেমন করিয়া এই লক্ষ টাকা মুনফার বিষয় খরিদ করিবেন,"—তাহা হইলে আমি তাহার কি

উত্তর দিব? কালাচাঁদ আদালতে আরও বলিতে পারে, "আমরা একান্ন-ভুক্ত পরিবার,—কস্মিনকালে পৃথকান্ন হই নাই,—যদি পৃথকান্ন পৃথকবাটী হইতাম, তাহা হইলে আমার নিজস্ব ঘর ভিটাই বা কোথায় গেল?" বিশেষ, পৈতৃক পুকুর বাগান জমী—সমস্তই ত উহার ঠাকুরদাদা (আমার জ্যেষ্ঠ) রামতারণদত্তের নামে খরিদ,—মোকদ্দমা-সুত্রে সে দলিল দুইবার আদালতে দাখিল হইয়া তাহা পাকা হইয়া আছে! সেই পুকুর বাগান-জমী-ভিটা সমস্তই আমি দখল করিতেছি। বর্ত্তমান সমস্ত জমীদারীই আমার নামে খরিদ,—(কেবল কোম্পানীর কাগজ গুলি গিন্নীর নামে আছে)। কালাচাঁদ আপত্তি তুলিবে, "যখন আমার নিজ ঠাকুরদাদার নামীয় সম্পত্তির উনি অর্দ্ধেক দখলিকার, তখন উহাঁর নামীয় সম্পত্তির আমি অর্দ্ধেক দখলিকার হইব না কেন?"

কালাচাঁদ বোধ হয় আদালতে আরও বলিবে,—বাল্যকালে আমার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ

হয়,—এতদিন নাবালক ছিলাম;—এক্ষণে সাবালক হইয়া এই নালিষ উপস্থিত করিয়াছি।

এইরূপ ভাবিয়াই আমি প্রাতে কালাচাঁদকে তত আদর করিলাম। মনে ঠিক করিলাম, কালাচাঁদকে এখুন বশ করাই আমার পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়ঃকল্প। কালাচাঁদ ছেলে-মানুষ,—দুটা মিষ্ট-কথায় ভুলাইয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, বাছাধনকে বশে আনিব। কালাচাঁদের কাঁচা বয়স,—হাতে নগদ কিছু টাকা ফেলিয়া দিব,—তাহাতেই সে ভোর্ হইয়া থাকিবে! মোদ্দা কালাচাঁদকে আর ছাড়া হইবে না।

পাঁচ চাল আঁচিয়াই প্রাতে ব'ড়ে টিপিয়াছিলাম। কালাচাঁদ ভাল-সামগ্রী উদর পূরিয়া খাইতে পায় না,—তাই তাহাকে আজ দ্বিপ্রহরে মহা-মহোৎসবে ভোজন করাইলাম। এঁ-এঁ,—কালাচাঁদ বশে থাকিবে না কি?—শিক্‌লি কাটিয়া পলাইবে কি?—কিছুতেই কি সে পোষ মানিবে না?—কিছুতেই কি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না?

যদি একান্তই বশে না থাকে, তখন উপায়?—না থাকিলে—ভাবনাই বা কি আছে?—অবশেষে আমি ‘মরিয়া’ হইয়া, ঢাল খাঁড়া ধরিব! বালক-কালাচাঁদ কতক্ষণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে?—ঐ এক-রত্তি ছেলে, আমার কি করিবে?—ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিব! ভয় কি?

তবে কিনা,—এরূপ ভাবে একটা নালিষ-ফসাদ হইলে, দেখিতে শুনিতে বড়ই মন্দ হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষ, আমার অনেক শত্রু আছে। এই জ্ঞাতি-বিরোধ দেখিয়া শত্রুদের আনন্দ বাড়িবে। তা বাড়ে, বাড়ুক। তা'তেও হরিতারণ দত্ত ভয় খান না!!

কিন্তু ভিটা, পুকুর, বাগান—কালাচাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য। এগার বিঘা জমীও তাহার প্রাপ্য। তা, এগার বিঘা কেন, একশত বিঘা জমী লইয়া, সে ক্ষান্ত হউক,—আমি তাহাতে রাজী আছি। একশত বিঘাই বা বলি কেন, সে পাঁচশত বিঘা জমী লউক, নগদ পাঁচশত টাকা লউক,—আর

আমাকে একটা একরার্-নামা লিখিয়া দিউক্ যে, কি বাস্তুভিটা, কি বাগান, কি পুষ্করিণী, কি অন্য কোন সম্পত্তি—কিছুতেই আর কালাচাঁদ দত্তের স্বত্ব নাই";—এ প্রস্তাবে আমি সবিশেষ সম্মত আছি।

কালাচাঁদ যদি বলে, আমার টাকা চাই না, জমী চাই না,—চাই কেবল বাস্তুভিটা।—তাহা হইলেই মুস্কিল বাধিবে। ন্যায্য প্রাপ্য না দিলে, লোকেও ত দোষ দিতে পারে!

আচ্ছা, জাল-দলিল তৈয়ারি করিলে হয় না কি? দলিলে এই ভাবে লেখা থাকিবে, কালাচাঁদ দত্তের পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবার-বর্গের ভরণ-পোষণের জন্য আমাকে ভিটা, বাটী, পুকুর, বাগান সমস্তই বিক্রয় করিয়া গিয়াছে!

তাহাই বা কেমন করিয়া হয়? কালাচাঁদের মামা পুকুরে মাছ ধরাইত, চালে খড় দিয়া ঘর ছাওয়াইত, বাগানের আম পাড়াইয়া লইয়া যাইত;—এ সকল কথা ত অনেকেই জানে।

তবে কেমন করিয়া কালাচাঁদের পিতা-কর্ত্তৃক তদীয় বিষয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিব?

যাউক ও কথা। ঝগড়া-গণ্ডগোল করা অপেক্ষা প্রথমত কালাচাঁদের সঙ্গে ভাব করাই ভাল। প্রাণপণে সে চেষ্টা করাই এক্ষণে যুক্তি-সঙ্গত! আমি লক্ষ লোক ভুলাইলাম, আর কালাচাঁদকে কি ভুলাইতে পারিব না? অবশ্যই সে কার্য্যে সক্ষম হইব।

কিন্তু এক গোল দেখিতেছি। গিন্নী যেরূপ কালাচাঁদকে স্নেহ করিতেছেন, তাহাতে কালাচাঁদকে কিছুতেই এ-বাড়ীতে রাখা সু-পরামর্শ নহে। আমি গিন্নীর জ্বালায়, জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিলাম! গিন্নী তাহাকে এত ভাল বাসিবেন জানিলে, কে আজ কালাচাঁদকে বাড়ী ঢুকাইত। পূর্ব্বে-পূর্ব্বে গিন্নী মধ্যে মধ্যে বলিতেন বটে, "কালাচাঁদ কোথা?—তার কিছু খবর জান কি?" আমি এ-সব কথা কৌশলে উড়াইয়া দিতাম। অধিক কি, কালাচাঁদ যখন হুগলী-জেলে ছিল,—তখন একদিনের তরেও

সে-কথা গিন্নীকে বলি নাই। এখন বুঝিতেছি, সে সব কথা না বলিয়া ভালই করিয়াছিলাম। গিন্নী যে, কালাচাঁদকে দেখিয়া এরূপ হায়-হায় করিবেন, স্নেহ-রসে গলিয়া চোখের জল ফেলি-বেন, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই! ওঃ—আজ কি কুকর্ম্মই করিয়াছি?—কেন আজ কালাচাঁদকে ঘরে ঢুকিতে বলিলাম, কেন তার সঙ্গে একত্র আহার করিলাম, কেনইবা গিন্নীর সহিত তাহার সাক্ষাতের সুবিধা করিয়া দিলাম? গিন্নী যখন কালা-চাঁদকে বাড়ীর ভিতর অদ্য দুপুর-বেলা শুয়াইয়া-ছেন, তখন গিন্নী যে বলিবেন, কালাচাঁদ এ বাড়ীতে খাবে--মাখ্‌বে-থাক্‌বে—সে'ত একরকম নিশ্চয় ধরা কথা! এরূপ প্রস্তাব গিন্নী করিলে, আমি কি বলিয়া তাহাকে নিষেধ করিব? গিন্নী যদি লুকাইয়া-লুকাইয়া কালাচাঁদকে টাকা-কড়ী দেন, তাহারই উপায় আমি কি করিব? মহা-বিপদ্ ঘটিল—দেখিতেছি!

কালাচাঁদকে বশে রাখিতে হইবে, খুব ভাল-

বাসিতে হইবে, ভরণপোষণ করিতে হইবে,—অথচ কালাচাঁদকে বাটীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না,—তাহারই বা সৎযুক্তি কি ?

এখন কথা হইতেছে, গিন্নী যদি জেদ্ করিয়া বলেন, কালাচাঁদ এই বাটীতেই থাকিবে ;—বালক-কালাচাঁদও যদি জেদ্ ধরে, "হাঁ আমি এইখানেই থাকিব ;"—তখন উপায় কি ? কুল-কিনারা ত কিছুই দেখি না !

এখন আমি করি কি ? যে দিকে চাই, সেই দিকেই অন্ধকার দেখি। যে পথে চলিতে যাই, সেই পথেই বাধা বিঘ্ন সমুপস্থিত হয়। যে ডাল ধরি, সেই ডালই ভাঙ্গিয়া পড়ে। আজ আমার কাছে জাহ্নবী-জল কুক্কুর-মূত্র হয়। পদ্মপত্র বিছুটিতে পরিণত হয়। সুধা, বিষ হয়। আমি করি কি ? কোন্ পথ দেখি ? কোন্ দিক্ রাখি ? কোন্ পাশ বাঁধি ? উঃ, গেলাম ! আমি কোথায় যাই ! কার কাছে যাই ! কিসের কথা বলি ! আমার কে আছে ? আমার কি

আছে ? আমার কে নাই ? আমার কি নাই ?—ইহা'ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

উঃ, আমার বুক বড়ই ধড়াস্-ধড়াস্ করিতেছে, মাথা বন্‌বন্ ঘুরিতেছে, দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! আমার মনে দেখা দিতেছে, বুঝি ঐ মহাপাপ কালাচাঁদ কর্ত্তৃক আমার বিষয়-সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইল! বুঝি কালাচাঁদ আমার জিহ্বা টানিয়া ধরিয়া, আমার প্রাণ-বধার্থ উদ্যত হইয়াছে। আমি কোথাই যাই ? কোথাই গেলে রক্ষা পাই ?

বৃদ্ধ হরিতারণ দত্ত, সে রাত্রে প্রকৃতই এইরূপ ছট্‌ফট্ আই-ঢাই করিতে লাগিলেন। কখন্ যে কি কথা ভাবেন, তাহার কিছুই ঠিক থাকে না! তিনি কোনরূপ সু-মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন না! তিনি যখন যে মন্ত্রণাটী স্থির করেন, তখনই তাহার শত শত দোষ দেখিতে পান।

বৈশাখের সেই কালরাত্রে আদৌ ঠাকুরদাদার চক্ষে ঘুম আসিল না। তাঁহার দেহ যেন তুষানলে

দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার হৃৎপিণ্ডটা হামান-দিস্তায় কে যেন থেঁতো করিতে লাগিল। তাঁহার চোখে কে যেন অসংখ্য ক্ষুরধার ছুঁচ বিঁধিতে লাগিল।

ঠাকুরদাদা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া "ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন,"—ডাক ছাড়িতে লাগিলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কবি কহিয়াছেন,—

কর্ম্মফলে কপালে কেবল সুখ-দুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক॥
স্কন্ধে করি বয় কেহ, কেহ চাপে স্কন্ধে।
যত দেখ ফলাফল সেই কর্ম্ম-বন্ধে॥

ঠাকুরদাদা এ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া,—কষ্ট পাইতেছেন,—কেবল সেই আপনার কৃত-কর্ম্মের ফলে। কালাচাঁদ এই রাজাবিশেষ ঠাকুর-দাদার নাতী হইয়াও, স্বয়ং ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রশস্ত-মনা হইয়াও, কষ্ট পাইতেছেন,—কেবল সেই আপনার কৃতকর্ম্মের ফলে।

কালাচাঁদ, ঠাকুরদাদার কাছে ভিটার ভাগ লইতেও আইসেন নাই, বিষয়ের অংশ লইতেও আইসেন নাই,—আসিয়াছেন, আপন খেয়ালে, আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য। কালাচাঁদ এখনও

জানেন কিনা সন্দেহ যে,—তাঁহার ভিটায় ঠাকুর-দাদা এক ত্রিতল অট্টালিকা বিনির্ম্মিত করিয়াছেন;—স্বগ্রামে তাঁহার পুকুর বাগান ভিটা আছে কিনা, হয় ত এখন তাঁহার মনেই নাই! মনে থাকিলেও, সে দিকে এক্ষণে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র দৃক্‌পাতও নাই! সে ভিটায় বসবাসের স্বত্ব ঠাকুরদাদারই হউক, অথবা শৃগাল-কুক্কুর-সর্পেরই হউক,—সে সম্বন্ধে কালাচাঁদের কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি আসিয়াছেন, আপন মনে, অন্য কারণে,—ঠাকুরদাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

কোথায় কিছুই নাই,—মেঘ নাই, বিদ্যুৎ নাই, বজ্রাঘাত নাই,—অথচ ঠাকুরদাদা যন্ত্রণায় অস্থির! সর্ব্বদিক্ সুপ্রসন্ন, ধূলা-রহিত বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে, নীলাকাশের কোল দিয়া বক-কুল উড়িয়া যাইতেছে,—অথচ ঠাকুরদাদা কাতর,—মর্ম্ম-পীড়াগ্রস্ত, যেন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত! কেন এমন হয়?—সেই কেবল কর্ম্মফল।

কালাচাঁদ যে, আজ প্রায় তিন দিন খাইতে

পাইলেন না, তাহাও কর্ম্মফল। ভূরি-ভোজনের মহামহোৎসবে, একশত আট রকম ভোগের সুবন্দোবস্তে, কালাচাঁদের উদরের এক কোণের এক-ষোড়শাংশও যে পূর্ণ হইল না,—ইহাও সেই কর্ম্মফল।

*কালাচাঁদ ঠাকুরদাদার নিকট কেন আসিলেন?* কেন হঠাৎ তাঁহার এরূপ মতিগতি ফিরিল? কালাচাঁদ আজ ছয় মাস কাল হুগলীতে আছেন;—একটী-দিন ব্যতীত, তিনি ঠাকুরদাদার হুগলীস্থ বাসাবাটীর উঠান মাড়ান্ নাই; এবং সেই একটী দিনেও তিনি ঠাকুরদাদার উপর মহা-বিরক্ত হইয়া সে বাসা পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। যদি এমনটাই হইল, তবে আজ আবার এরূপ বিপরীত ভাব ঘটিল কেন?

আজ শুধু আগমন নয়,—মাছ-দই-সন্দেস লইয়া আগমন,—হাসি-হাসি মুখে, ভাবে গদ্গদ হইয়া আগমন,—প্রেম-প্রীতি-ভরে যেন মাটীতে লুটাইতে লুটাইতে আগমন! কেন এমন হয়?

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—কালাচাঁদ-চরিত্র আঁকা বড় কঠিন,—বুঝা ততোধিক কঠিন। যদি এ কালাচাঁদ-কীর্ত্তি-কলাপের কোন কথা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে জানিবেন, হয় আমার লিখিবার দোষ, না হয় তাঁহার বুঝিবার দোষ। অধিকাংশ বাঙ্গালী-পাঠকই অন্তঃসার-শূন্য,—উপর দেখিয়াই উন্মত্ত,—বাহ্য-চাক্‌চিক্যে বিমোহিত। লিখিবার দোষটুকু যে, বুঝিয়া, সারিয়া লইবেন,—সে আশাও কম।

সেই আশা কম বলিয়াই, প্রতিপদে কৈফিযত দিতে হয়। বাজে কৈফিযতে বিজ্ঞ পাঠকের বড়ই বিরক্তি জন্মে। বিজ্ঞ, বড়জোর হাজার-করা একজন। নয়শত নিরানব্বই জন লেখাপড়া শিখিয়া মা-সরস্বতীর বরপুত্র। এই বরপুত্রগণকে উপেক্ষা করিয়া, পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া কি উচিত? কাজেই কৈফিয়ত দিতে হয়।

কালাচাঁদ চরিত্র বিচিত্র। সাদা, লাল, কালো—সবরকম রঙই আছে। সরু-মোটা, তিক্ত-মধুর,

নরম-গরম—সকলপ্রকার ঢঙই আছে। কালাচাঁদ কখন স্বর্গে কখন মর্ত্তে, কখন পাতালে—এ চরিত্র কি আঁকা যায়?

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহাক্ষুধায় প্রপীড়িত কালাচাঁদ গতকল্য নিশীথে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, আপনমনে স্থির করেন,—"চুরি করায় কোনও দোষ নাই।" পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন চুরি করিতেন, তখন তাঁহার ধারণা ছিল, যে,—তিনি একটা মন্দ কাজ করিতেছেন। ক্রমশ চৌর্য্যকর্ম্ম অভ্যস্ত হওয়ায়, মন্দ-কাজ-করার আঘাত তাঁহার হৃদয়ে বড় একটা লাগিত না। তবে স্থূলত এই বিশ্বাস ছিল, চুরি করা অপকর্ম্মের মধ্যে গণ্য। তৎপরে গ্রহ-বৈগুণ্যে তাঁহার কারাবাস হয়। তিন বৎসর কাল কারা-কূপে বাস করার পর, তিনি যখন খালাস পাইলেন, তখন পৃথিবীকে যেন নূতন দেখিলেন। আলোকমালায় বিভূষিত, স্বচ্ছন্দ-বিহারী পক্ষীকুলদ্বারা ধ্বনিত, সুখস্পর্শ সমীরণ সেবনে সদা প্রফুল্লিত—ধরাধামের এইরূপ অপূর্ব্ব রঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়া কালাচাঁদের হৃদয়ে কেমন এক অভিনব

উল্লাসের উদয় হইল। কারাগারেও কালাচাঁদ একরকম সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে সুখ রাজার সুখ, ব্যবসাদারের সুখ,—নিকৃষ্ট লৌকিক সুখ। কিন্তু মুক্তির পর যে সুখোদয় হইল, তাহা যেন ঋষির সুখ,—নির্ব্বাণমুক্ত পুরুষের সুখ। কালাচাঁদ সদানন্দ পুরুষ হইলেন। অন্ধব্যক্তি বহুদিন পরে, বহুকষ্টে চক্ষুরত্ন-লাভ করিয়াছে, আর কি রক্ষা আছে? কালাচাঁদের কি আহ্লাদের সীমা আছে?

ক্রমশ কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—"কেন মিছে চুরি করিয়া মরি!!"—এইবার কিন্তু সুখে দুঃখ আসিল। ভাবনাই দোষ। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ের সেই পরম উল্লাস,—সেই নির্ব্বাণ-মুক্ত পুরুষের ন্যায় সুখ কমিল! সুখ কমুক,—তিনি কিন্তু চুরিবৃত্তি ছাড়িয়া দিলেন; লোকের দুঃখ-দূরীকরণার্থ তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন,—স্ত্রীমণ্ডলী তাঁহার কাছে জননীর ন্যায় পূজনীয়া হইলেন।

কালাচাঁদের দেহে ভাবনা-কীট প্রবেশ করিল। কি ভাবনা,—তাহা কালাচাঁদও ভাল বুঝিতে পারেন না। মোদ্দা,—তিনি কেবল ভাবেন!—নীরবে, নিস্পন্দে কখন হয় ত এক প্রহর কাল এক স্থানে বসিয়া থাকেন! অন্নে রুচি কমিল। দেহও যেন কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইল।

কালাচাঁদের ভাবনার আদি-অন্ত-মধ্য নাই—আরম্ভ-শেষ-সীমা নাই,—মাত্রা-ওজন-পরিমাণ নাই,—আছে কেবল, ভাবনা আর ভাবনা! ভাবনার অনন্ত সমুদ্র;—যে দিকে চাই, সেই দিকেই ভাবনা! মধ্যে মধ্যে আবর্ত্ত-বুদ্‌বুদ-তরঙ্গ-ফেন-সঙ্কুল।

কালাচাঁদ কখন ভাবেন,—"আচ্ছা, আমি পতিতপাবনের আশ্রয়ে থাকি কেন? পতিত'ত পাকা গাঁটকাটা, তাহার সহবাসে থাকিলে ত আমারও দেহমন কলুষিত হইতে পারে! কিন্তু পতিতকে ত্যাগ করিই বা কেমন করিয়া? পতিত আমার প্রথম আশ্রয়দাতা। আশ্রয়দাতাকে উপেক্ষা করা ত কখনই উচিত নহে! করি কি?"

কালাচাঁদ আরও ভাবেন, "পতিত যে আমাকে সহজে ছাড়িবে, এমন ত বোধ হয় না। পতিত আমার নিকট হইতে পয়সা পায়, খাবার সামগ্রী পায়, মিষ্ট কথা পায়। এমন কল্পতরুকে সহজে কে ত্যাগ করিবে? আমার যদি কখন পয়সা কমে, তথাচ পতিত আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। কারণ পতিত জানে, আমার ক্ষমতা অসীম। আজ যদি পয়সা না থাকে, দুদিন পরে আবার অনেক পয়সা হইতে পারে।"

"আর আমার পয়সাই বা কমিতে গেল কেন? সৎপথে থাকিলে 'অর্দ্ধেক-রাত্রে অন্ন হয়'। আমি ত এখন আর কোন মন্দকর্ম্ম, অসৎকর্ম্ম, পাপকর্ম্ম করিতেছি না যে, আমি অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কষ্ট পাইব? সাধু ব্যক্তি সদাই সুখী,—আমার অসুখ হইবে কেন?"

"পতিতপাবন শঠ, প্রবঞ্চক, চোর হউক,—আমাকে বুঝি সে যথেষ্ট ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। সে-দিন আমার জ্বর হইল, পতিত আমার কত

সেবা-শুশ্রূষা করিল। প্রকৃতই পতিতের আমার প্রতি যেন বড়ই মমতা জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চোর-ডাকাতদেরও-ত স্ত্রীপুত্র পিতা-মাতার প্রতি স্নেহ-ভক্তি আছে,—এস্থলে, পতিতের আমার প্রতি ভক্তি-ভালবাসা না থাকিবে কেন?"

"অতএব যে-দিক্ দিয়া, যে-ভাবেই দেখি, পতিতের হাত হইতে কোন দিকেই পরিত্রাণ দেখিতে পাই না। অথচ পতিতের গৃহে, পতিতের সহিত একত্র বসবাস করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে! করি কি?"

"আচ্ছা, পতিতের গৃহে থাকিতেই বা দোষ কি? পতিত মন্দ হয়, হউক; আমি মন্দ না হইলেই ত হইল। সত্য বটে, মিথ্যাকথা পতিতের অঙ্গের ভূষণ। কিন্তু তা' হউক;—আমি মিথ্যাকথা না কহিলেই ত হইল। নিজে খাঁটি থাকিলে, অপরে কে কি করিতে পারে? আমার কি এরূপ শক্তি নাই যে, আত্ম-সমর্থনপূর্ব্বক আমি এ সংসারে অবস্থান করি? শক্তি আছে বৈ কি?

আর, শক্তি থাকিলে সবই সম্ভব। শক্তি ছিল বলিয়াই, মহাদেব কণ্ঠে মহাবিষ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর, আমি কি এমনই অক্ষম যে, আমি এই ক্ষুদ্র পতিতের সংস্রবে থাকিতে সক্ষম হইব না?”

কালাচাঁদের চিন্তাস্রোত এই ভাবেই প্রবাহিত। তিনি কখন্ কোন্ কথা ভাবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই। “কুলবধূর প্রতি কটাক্ষপাতে দোষ কি? কেবল চোখের দেখা একবার দেখিয়া লইব বই'ত নয়,—ইহাতে কোন পক্ষেরইত ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পুরুষের নয়ন-কর্ত্তৃক একদৃষ্টে নিরীক্ষিত হইলে, রমণীর কোমল অঙ্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কি? দৃষ্টি কি মহাদ্রাবক? না,—ব্রহ্মাস্ত্র? ও-সব কিছুই নয়। কেবল দেখা। দেখায় আসে-যায় কি? গোলাপফুল, মল্লিকাফুল, চাঁপাফুল,—একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলে ত কেহ দোষ দেয় না। সুন্দরী-রমণী সংসার-অরণ্যের প্রস্ফুটিত পদ্ম-পুষ্পের তুল্য;—ক্ষণভঙ্গুর মানব-দেহ ধারণ করিয়া, স্বভাবের সে

শোভা সন্দর্শন-পূর্ব্বক নয়ন সার্থক না করিব কেন? শরদাকাশে বৎসরান্তে দুইটী দিন মাত্র সুধাকর পূর্ণচন্দ্র উদিত হন, কিন্তু এই ধরাধামে কত সুধামুখীর মুখচন্দ্র বারমাস ভুমে গড়াগড়ি যায়। আকাশের চন্দ্রটীকে দেখিলে কোন দোষ নাই,—কিন্তু এই পৃথিবীর চন্দ্রের পানে চাহিলেই যত গোলযোগ!

ভাল হউক মন্দ হউক, দোষ হউক গুণ হউক,—আমি সতী সুন্দরী রমণীর মুখ-চন্দ্রের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিব। চাহিয়া, চাহিয়া, বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখিব। মনে মন্দভাব না থাকিলেই হইল।

দেখিব ত মনে করি,—কিন্তু কেমন বাধ-বাধ ঠেকে। কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হয়। রমণীর সঙ্গে যদি চারি-চক্ষে চাওয়া-চায়ি হইয়া যায়, তাহা হইলে ত গিয়াছি! স্ত্রীলোকটী মনে করিবে কি? সে যদি ভাবে, আমি কামভাবে তাহার পানে তাকাইয়া আছি, তাহা হইলে ত এ কাজ বড় সুবিধাজনক

নহে। তখন সেই কুলবালা লজ্জায় কতই না ম্রিয়মাণ হইবে! হয় ত ভয়ে থরহরি কাঁপিবে! আর, আমাকে মনে করিবে, এ একটা দুষ্ট, পাপিষ্ঠ, লম্পট পশু! আর এক কথা,—যদি সেই কুলবালাটী কুচরিত্রাই হয়,—তাহা হইলেই ত সে-ও এক মহামুস্কিল কাণ্ড। সে আমাকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, আমিও তাহাকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম! তখন ত ঘোর বিপদ্ ঘটিয়া উঠিবে! অগত্যা আমি তাহার রূপমাধুরী দেখিতে ক্ষান্ত হইলাম; কিন্তু সে যদি আর ক্ষান্ত না হয়,—আমাকে দেখিতেই থাকে,—আর বলে, 'আমি কেবল স্বভাবের শোভামাত্র দেখিতেছি;—সুতরাং তাহাতে আমার লজ্জা ত নাই-ই, কিন্তু তোমার হঠাৎ এমন শুধু-শুধু লজ্জা হয় কেন? অতএব হে নবীনপুরুষ-বর! তুমি চক্ষু তুলিয়া, আয়ত-লোচনে আমার প্রতি চাহিয়া থাক।'—তখন উপায়?

এ যে বড় বিষম দায় দেখিতেছি। সুন্দরী—

যুবতী—জিনিসটাই খারাপ্। ওর ভাল-মন্দ ভেদ নাই, বাস্তু-উট্‌কো বিচার নাই, নরম-গরম তারতম্য নাই,—ঐ বস্তুটাই বদ্!—দপ্‌দপে আগুণের খাপ্‌রা! দূর হইতে মনে হয়, বুঝি ঐ আমার সাতরাজার ধন একটী নীলকান্তমণি জ্বলিতেছে!—কিন্তু কাছে গেলেই পুড়িয়া ছাই হইতে হয়। এই কথাই ঠিক্! অন্যের দেখিয়াছি, নিজে ভুক্তভোগীও বটি,—একবার ঝোঁক ধরিলে ত আর রক্ষা নাই। তখন বাষ্পীয় কলেও, সে বেগ টানিয়া রাখিতে পারে না!

আরও একটা কথা শুনিয়াছি,—ঘ্রাণে অর্দ্ধ-ভোজন। যদি স্পর্শনে পূর্ণ পাপ হয়, তবে দর্শনে অর্দ্ধ পাপ না হইবে কেন?

আরও কথা আছে। ক্রমশ দেখিতে দেখিতে যদি লোভ জন্মিয়া যায়!—তখন উপায়? প্রথমে না হয় স্বভাবের শোভা বলিয়াই দেখিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু শেষে যদি গোল বাধে?—তখন রক্ষা করিবে কে? মন যদি মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়

বৃংহিত ধ্বনি করিয়া উঠে, তবে তখন তাহাকে থামাইবে কে? মনকে বিশ্বাস কি? মনটী ঠিক্ কালসাপ। দেহ-গৃহে বাস। দেখিতে বেশ ভাল-মানুষটীর মত। কিন্তু সুবিধা পাইলেই কুট্ করিয়া কামড়!—অমনি বিষে জর্জ্জরিত দেহ!

আচ্ছা,—সুন্দরীর রূপমাধুরী নাই বা দেখি-লাম!—তাহা হইলে ত সকল গোলই চুকিয়া যায়! মেয়েমানুষের মুখ না দেখিলে যে, হাঁড়ী-চড়া বন্ধ হয়—এমন ত কিছু নয়? বলিতে পার, স্বভা-বের সুন্দর শোভা সন্দর্শনে বঞ্চিত হইলাম। স্বভাবের ঐ শোভাটী না দেখিলে কি তোমার সংসার অচল হয়? আরও ত অন্যরকম শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ শোভা রহিয়াছে,—তাহাই কেন দেখ না? নীলাকাশ দেখ না? অনন্ত কাল, বসিয়া বসিয়া, চাহিয়া চাহিয়া নীলাকাশ দেখ না? আকাশ পছন্দ না হয়,—সবুজ ময়দান দেখ। বেশ লহ-লহ ঘাস-পূর্ণ মনোহর মাঠ দেখ। ঘাসে রুচি না হয়,—সেণ্টহেলেনা-দ্বীপে বসিয়া, অনন্ত-

বিস্তৃত, তরঙ্গভঙ্গময়, সমুদ্র সন্দর্শন কর। স্বভাবের শোভা দেখিতেই যদি এত সাধ, তবে হিমালয়ে যাও—ধবল-গিরিতে বাস কর। সাহারায় যাও,—মরুভূমে ভ্রমণ কর। কেবল মেয়েমানুষের সেই মুখটী না দেখিলে কি তোমার স্বভাবের শোভা দেখা হয় না? ছি!!

রমণী জননীর ন্যায় পূজনীয়া। কুলবধূ—দেবী—স্বর্গের সামগ্রী। দুর্ব্বল মানব সেই দেবীর মুখকমল দেখিবার অধিকারী নহে,—উপযুক্ত নহে। এই কথাই ঠিক্। কুলকামিনী সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে, আমি কেবল তাঁহার চরণযুগল নিরীক্ষণ করিয়াই নয়ন সার্থক করিব।”

কালাচাঁদের রমণী-সম্বন্ধিনী ভাবনা এইরূপই। সম্যক্‌রূপে এ ব্যাপার বর্ণন করিতে সক্ষম হইলাম কি না—জানি না। কেন না, এরূপ ভাবনার কূল-কিনারা নাই। কখন এই,—কূলের কাছে, কখন ঐ,—মাঝ-দরিয়ায়! কখন তরণীর কোলে নিশ্চিন্ত মনে সুখ-শয্যায় শয়ান, কখন গভীর

আবর্ত্তে পড়িয়া নিরন্তর ঘূর্ণমান! কিছুই ঠিক নাই,—কেমন করিয়া এ কাহিনী কীর্ত্তন করিব?

কালাচাঁদ যে, একটী-দিন-মাত্র একবেলা বসিয়া স্ত্রীলোক-ঘটিত বিষয় ঐরূপ ভাবিয়াছিলেন, তাহা নহে। দিন নাই, রাত নাই, যখন খেয়াল চাপিত, তখনই ঐ কথা তোলাপাড়া করিতেন। হয় ত একই কথা একশ-বার প্রস্তাব, আলোচনা এবং মীমাংসা করিতেন। কিছুরই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না।

কারাগার হইতে কালাচাঁদ কয়েক-শত টাকা আনিয়াছিলেন। কিন্তু পতিত-পাবনের বাসায় অবস্থানকালে তিনি অর্থের উপর নির্ম্মম হইলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করেন, টাকা ত খোলাং-কুঁচি,—টাকাতে আছে কি? একটা সাদা চাকৃতি বৈত নয়? এই টাকার জন্য মানুষ মারামারি করে, রক্তপাত করে,—এই টাকার জন্য বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়, পিতাপুত্রে বিবাদ হয়, মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। টাকাটা বড় বদ্ জিনিস—উহা ঘরে রাখিতে

নাই। অতএব কর বিদায়—টাকা। সম্মুখে সুপাত্র দেখিলেই—দাও টাকা। বস্ত্রহীনের বস্ত্র কিনিয়া দাও; ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা-শান্তি কর; পিপাসার্ত্তকে শীতল জল দাও।

কালাচাঁদ দানের উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া দান-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কাহাকেও চারি-আনা, কাহাকেও আট-আনা, কাহাকেও একখানা কাপড়, কাহাকেও দুইসের চাউল,—কালাচাঁদ সাধ্যমত দিতে লাগিলেন। কালাচাঁদকে ঠকাইতে লাগিল,—কেবল বন্ধু-পতিতপাবন পরামাণিক। যাহার কোন অভাব নাই, পতিতপাবন তাহাকে ছেঁড়া কাপড় পরাইয়া, দুঃখী সাজাইয়া, কালাচাঁদের নিকট আনিত; কালাচাঁদ সেই দুঃখীকে যাহা দিতেন, পরামাণিক তাহার অর্দ্ধেক ভাগ তাহার নিকট হইতে লইত। কালাচাঁদ এ সব বুঝিয়াও, তাহা উপেক্ষা করিতেন। যে মাছটীর মূল্য পাঁচ আনার অধিক নহে, পতিত সেই মাছটী বাজার হইতে হাতে করিয়া আনিয়া বলিত, “বন্ধু! তোমার জন্য

৮১৭॥ বার আনা সাড়ে তিন পয়সা দিয়া এই মাছটী এনেচি!—এর কি আমি দাম নিতে পারি?—তুমি খেয়ো।” বলা বাহুল্য, কালাচাঁদ সে মাছের কথিত মূল্যত দিতেনই, অধিকন্তু সে মাছের বার আনা অংশ উপহার স্বরূপ বিনামূল্যে বন্ধু-পতিতপাবনকে অর্পণ করিতেন।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনন্ত গুণাকর পরামাণিকের আর একটী অন্তরের সাধ ছিল। সে আশা ফলবতী করণার্থ সেই নাপিত-কুল-ধুরন্ধর বহুবিধ বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই সেই প্রাণের সাধ পূর্ণ হয় নাই।

সেটি কি? এমন কিছু বিশেষ বিষয় নয়, যাহার জন্য ঔৎসুক্যের আবশ্যক! এই,—কিঞ্চিৎ মদ এবং বেশ্যা। এই, কি জান্‌লেন্,—কালাচাঁদ একটু আমোদ-প্রমোদ করেন, সুখে-স্বচ্ছন্দে হেসে-খেলে বেড়ান—বন্ধু-পতিতের ইহাই ইচ্ছা। কালাচাঁদের এই উঠ্‌তি বয়স্,—একটু-আধটু নেশা না করিলে মনের স্ফূর্ত্তি হবে কেন? আর, কালাচাঁদের এই ঘোরতর যৌবনে রমণী ব্যতীত শয্যাগৃহ সজ্জিত হয় কি?—পরমবন্ধু পতিতপাবনের অন্তরে অহর্নিশি এ সকল কথাই উদিত হইত।

এ দিকে যোটকতাকার্য্যে পতিতপাবন কথঞ্চিৎ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার নানাস্থানে যাতায়াত ছিল, নানা নর-নারীর সহিত আলাপ ছিল।

কালাচাঁদ এক দিন পতিতের ঘরে একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী মেয়েমানুষ আসিয়া দাঁড়াইল। বয়স্ তার বছর বাইশ। আধ্-ঘোম্‌টা দেওয়া। পরণে রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী। হাতে বেলওয়ারি চুড়ি। কপালে একটী টিপ্। মেয়েটী আসিয়া দাঁড়াইতে না-দাঁড়াইতে, পতিত দৌড়িয়া আসিয়া কালাচাঁদকে বলিল,—"বন্ধু! এই ঝীটিকে অনেক কষ্টপেয়ে খুঁজে খুঁজে এনেচি। বড় ভাল মেয়ে এটী। অতি-ঈ সৎ। মুখে কথাটী নেই। যখন যা বল্‌বে, তখনি তাই কর্‌বে! ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, বিছানা করা, পান সাজা—সকল কাজই এঁর দ্বারা হবে। জাতিতে সৎগোপ। বন্ধু! প্রত্যহ উনুন ধরিয়ে রেঁধে খেতে তোমার কষ্ট হয়,—তা, ইনি থাক্‌লে, সে সব কিছু দেখতে হবে না! আর, তোমার

ঘুম থেকে উঠে রাত্রে দু-তিনবার তামাক খাওয়া আছে ; তা, এঁকে বল্‌লে,—ইনি এই ঘরের দাওয়ায় রাত্রে শুয়ে থাক্‌তে পারেন,—আর উঠে উঠে তোমাকে তামাক-টামাক সেজে দিবেন। এঁকে কিছু বেশী মাইনে দিয়ে, রাত-দিনের ঝী ক'রে রাখ্‌লে, বন্ধু! তোমাব আর কোন ক্লেশ হবে না।"

স্ত্রীলোকটীকে সম্মুখে রাখিয়া পতিত এই ভাবেই বক্তৃতা করিতে লাগিল। কালাচাঁদ সেই ঝীটির ত্রিভঙ্গ ঠাট্‌ দেখিয়াই অবাক্‌! সহসা তাঁহার মুখ হইতে বাক্যস্ফুরণ হইল না। তখন সাবেক বৃদ্ধা ঝীর গুণকীর্ত্তন ব্যাপারে, পতিতের বক্তৃতা-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিল,—"হরের মা-বেটী বুড়ী, বজ্জাত,—কাণে শুন্‌তে পায় না, চোখে দেখ্‌তে পায় না,—সে, বাসন মাজ্‌লে থালে এঁটো সক্‌ড়ি থাকে। সে, বেলায় আসে, সন্ধ্যে হ'লেই চলে যায়,—বাজারের পয়সা চুরি করে। বন্ধু! তাকে আর কাজ নেই,—তার বদলে এঁকে রাখ। এ মেয়েটী আমাদের জানা-শুনা লোক,

বিশ্বাসী। স্বভাব-চরিত্তির ঠাণ্ডা। মুখে কথাটী নেই। এমনি এঁর মেজাজ যে, কোন কাজ ক'র্‌বো না, বা কত্তে পার্‌বো না—এমন কথাটী এঁর মুখ দিয়ে কখন বেরুবে না। আর কি জান, বন্ধু! তোমারও ত সুখ-অসুখ আছে। তা, সুখে-অসুখে ইনি তোমার বেশ যত্ন-সেবা কর্‌তে পার্‌বেন।"

স্ত্রীলোকটীর চেহারা দেখিয়া এবং পতিতের কথা শুনিয়া ক্রমশ কালাচাঁদের চক্ষুস্থির! পতিত অবিরত মিথ্যা কথা কয়, ঠকাইয়া পয়সা লয়, চোরাই মাল কিনে,—এ সকল কালাচাঁদের সহ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই বঙ্কিম-ভাবাপন্না, চারুচন্দ্রবদনা, কুটিলায়ত-নয়না স্ত্রীমূর্ত্তিকে দাসীরূপে রক্ষা করিবার প্রস্তাবে তিনি মহাবিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এটী কি গৃহদাসী, না স্বর্গের উর্ব্বশী? ইহাকে যেরূপ সু-পরিষ্কার, সু-পরিচ্ছন্ন, রঙ্গরাগে পরিপূর্ণ দেখিতেছি, তাহাতে এ আমার বাসন মাজিবে কি।—ইহারই যে, বাসন মাজিতে আমার ইচ্ছা হয়! দণ্ডবৎ! কাজ নাই আমার এমন ঝীয়ে।

কালাচাঁদ এরূপ ভাবিলেন বটে, কিন্তু পতিতকে যে হঠাৎ চটাইয়া দিবেন, বা ঝগড়া করিবেন,—এরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কি কথা বলিবেন, কি উত্তর দিবেন,—কোন্ কথা বলিলে, সবদিক্ বজায় থাকে,—কালাচাঁদ বিব্রত হইয়া ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পতিত, কালাচাঁদের এপর্য্যন্ত কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিল,—"কি বলো, বন্ধু!—তবে কালথেকেই এই মেয়েটী কাজকর্ম্ম করুক—"

কালাচাঁদের মুখে তথাচ কোন কথা নাই। কালাচাঁদ ভাবিতেছেন, "কি বিপদ্! এ যে মহামুস্কিল কাণ্ড বাধালে দেখ্‌চি—"

কালাচাঁদকে আর অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। সাবেক ঝী,—সেই হরের মা—সেই বুড়ী, ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল। বলিল, "কুসুমীকে আর, কাল থেকে আস্‌তে বলা কেন? ও এসেচে,—আজ থেকেই কাজ করুক!—আমি এমন চাক্‌রি কত্তে চাই না! গতর থাক্‌লে ঢের চাক্‌রি হবে।

ভগমান জীব দিয়েচেন, আহার দেবেন! কুসুমী তোমাদের এখানে থাকুক্, দিনে-রেতের কাজ কর্‌বে!—”

পতিত নীরব। পতিত ভাবে নাই যে, হরের মা এখনি আসিয়া পড়িবে। পতিতের এখন চিন্তা,—“হরের মা যদি সব কথা শুনে থাকে, তা হ'লে একটা হুলস্থুল বাধাবে। আমি তাকে, চোখে দেখ্‌তে পায় না, কাণে শুন্‌তে পায় না,—অবিশ্বাসী-চোর বলেচি;—এ-সব কথা যদি হরের মা শুনে থাকে, তবে সে এখনি একটা কুরুক্ষেত্তর ক'র্‌বে।” বলা বাহুল্য, হরির মাতার শুভাগমনে পতিত নিতান্ত অপ্রতিভ এবং একান্ত বাক্‌শক্তি-হীন হইল।

হরির মা। অগো গেরস্থরা! তোমরা জিনিস-পত্তর বুঝে নাও,—আমি চল্লেম! নাও না গো,—দেরি কচ্চো কেন?

কালাচাঁদ মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—এ সঙ্কটে, এ ঘোর বিপদে

শ্রীমধুসূদনই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। হরির মা! এ জন্মে আমি তোর ধার শুধিতে পারিব না। তুই আজ আমাকে বড় বাঁচিয়েচিস্! তুই ভয় করিস্ না। দুকথা বলে নে। আমি তোকে এক-খানা পাটের কাপড় কিনে দিব।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত হরির মা কোন উত্তর না পাইয়া, অঙ্গের বসন কতকটা উন্মোচন করিয়া, আঁচল ঝাড়া দিতে আরম্ভ করিল। মুখে বলিতে লাগিল, "এই নাও,—তোমরা দেখে নাও—আমি কোন জিনিসপত্তর নিয়ে যাচ্চি কি না?—এই দেখো, এই দেখো—"

ক্রমশ অঙ্গবস্ত্র ঈষৎ অধিক মাত্রায় অঙ্গ-মুক্ত হইতে থাকিল।

পতিত ভাবিল, এ যে ঘোরতর বিপদ্ দেখি-তেছি। মাগী ক্রমশ উলঙ্গ হইবে না কি? তখন আর নীরব থাকিতে না পারিয়া, পতিত অগত্যা হরির মাকে একটু মিষ্ট কথায়, আমৃতা-আমৃতা করিয়া বলিল,—"হরির মা! তুমি অমন করচো

কেন? তোমাকে ত এখন কেউ কিছু বলে নাই! তুমিও থাকো না কেন?"

হরির মা। আমার আর কি থাকা-থাকির বয়স্ আছে? আমার হাতে চুড়ি নেই, দাঁতে মিসি নেই, ঠোঁটে আল্‌তা নেই,—আমার দ্বারা বাসন-মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া চল্‌বে কেন? আমার যদি মিহি শাড়ী থাক্‌তো, পেটো-পাড়া চুল থাক্‌তো,—বেঁকে বেঁকে কোমর ঘুরিয়ে চলা থাক্‌তো,—তা, হ'লে আজ আমি সোহাগের ঝী হতেম। আমাদের তিন-কাল গিয়ে এক-কালে ঠেকেচে, কাজেই আমরা কাণা, কালা, চোর হয়েচি,—কাজের বা'র হয়েচি। থাকুক্ কুসুমী,—ওর এখন চোখ ভাল, সব দেখ্‌তে পাবে; কাণ ভাল, সব শুন্‌তে পাবে;—ওর এখন হাতের রস আছে, বাসন মাজ্‌বে ভাল; ওর এখন পেটে বুদ্ধি আছে, হাটবাজার কর্‌বে ভাল;—অলো! কুসুমী! আয়্ লো!—এখন তোর ঘর, তোর দোয়ার হ'লো,—জিনিস-পত্তর সব দেখে-শুনে বুঝে নিবি আয়!

নবাগতা ঝী-রূপিণী মহিলাটীর নাম—কুসুম-কামিনী। হরির মায়ের হঠাৎ এরূপ আগমনে এবং এরূপ বাক্‌বিতণ্ডায় সে-ও কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ এবং বিব্রত হইল। কিন্তু হরির মায়ের এখন ঝগড়ার মুখ,—হঠাৎ কোন কথা কহিলে মিছা গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে,—এই ভাবিয়া কুসুম এতক্ষণ নীরব ছিল। কিন্তু হরির মা ক্রমশ যখন কুসুমের উপরই সকল কথা ঝোঁক দিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, তখন আর সে নীরব থাকিতে পারিল না। ধীর অথচ কঠোরস্বরে বলিল,—"হেঁগা, তুমি আমাকে নিয়ে অমন কর্‌চো কেন? তুমি যা ব'ল্‌বে, ওঁদিগে বল—"

হরির মা। তোকে আবার কে কি বল্লে যে,—তোর অম্‌নি ঠ্যাকার হ'লো। সোয়াগে যে, গলে পড়েচিস্ লো!—গরবে যে আর গা ধরে না!—

কুসুম তখন সুর একটু রুক্ষ করিল। উচ্চ-কণ্ঠে বলিল, "তুমি আবার আমার আজ সোয়াগটা

কিসে দেখ্‌লে গ্যা? তুমি যাকে তাকে, যা-না-তাই বল!—কেন বল দেখি?

হরির মা তখন একটা বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ—কুস্‌মিলো!

তুই অত করিস্‌ না—অত করিস্‌ না।
সজ্‌নে খাড়ার মত যেন ঝুলে পড়িস্‌ না॥

পাড়া-মজানি! পাড়া-চলানি! সাতপাড়া মজিয়ে আবার এখানে মজাতে এসেচিস্‌! তোকে কে না জানে লো! তোর সকল কথা বলতে গেলে প্রাচিত্তির কত্তে হয়।"

কুসুমকামিনী তখন 'দশ-বাই-চণ্ডী' হইলেন। নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বাহু নাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোকেই বা না জানে কে লো? ডাইনি! রাক্কুসি! তোর মেয়ের খপর্‌ রাখিস্‌—সে এখন কোন্‌ মুলুকে আছে? আগে তোর ঘরের খপর্‌ রাখ্‌গে লো,—তার পর পরের খপর রাখিস্‌—"

হরির মা তখন গাছ-কোমর বাঁধিয়া, চক্ষু দুইটী

কপালে তুলিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণপূর্ব্বক কিড়্-কিড়্-কিড়্-কিড়্ শব্দ করিয়া, আঁউ-আঁউ রবে, কাল-ভৈরবীর ন্যায় তিড়ীং তিড়ীং নৃত্য করিতে লাগিল। রণভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

পতিতপাবন 'হতভম্ব'। মুখে কথা নাই, চক্ষের পলক নাই, নাসিকারও বুঝি নিশ্বাস নাই।

কালাচাঁদের অন্তরে কেবল আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত। দেহ পুলকে পূর্ণ। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"নারোদ! নারোদ!"

সমর-প্রাঙ্গণে মুহূর্ত্ত-কাল "তাথেই তাথেই" নৃত্য করিয়া হরির মা বাক্য-বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিল,—"অলো হোল্‌সা-মুখী! কটাচুলি! উট্‌কপালী। চেরন্-দাঁতী। তোকে আমি ডরাবো না লো—আমি ডরাবো না। যারা তোর সোমত্ত বয়স্ দেখে ভয় খায় লো, তাদের কাছে তুই বাক্‌চাতুরী করিস্। সে দিন দত্ত-বাড়ী মার-খেয়ে তোর যে পিঠের চাম্ড়া উঠে গেছলো-লো!—

চূণে-হলুদ দিয়ে আরাম কল্লে কে-লো? এই, কথায় বলে,—

তিতাক তিতাক তিতাক লো!
তিন-কুড়ি-তিন তোর সোয়ামী লো!!

তাই হয়েচে তোর! তুই আবার কোন্ মুখে কথা ক'স্? ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দিবো জানিস্!

কুসুমকামিনী তখন ব্যাপার বড় গুরুতর বুঝিয়া, কালাচাঁদকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল,—"দেখুন, মোশাই! আপনাদের সমুখেই বুড়ী কত অকথা-কুকথা বল্‌চে। আপনারা ওকে থাম্‌তে বলুন,—নহিলে আমার সঙ্গে ওর ভাল হবে না—এখনি একটা কাণ্ড বেধে যাবে।"

হরির মা মুখ ভেঙাইয়া, দাঁত বাহির করিয়া, তালে তালে নাচিতে নাচিতে কুসুমের দিকে অগ্রসর হইয়া,—বলিতে লাগিল, "অলো! মারবি নাকি লো!—তোর গায়ে আজকাল বেশী বল্ বেঁধেচে লো,—বল্ বেঁধেচে!—তোর দলে লোক

ঢের লো,—লোক ঢের হয়েচে!—মার্-না লো,—মার্না,—কাঠের সখীর মত অমন দাঁড়িয়ে রইলি কেন? অলো! মেরে হাতের সুখ করে-নে লো—হাতের সুখ করে-নে!—এমন দিন তোর আর থাক্‌বে-না লো—থাক্‌বে না!”

হরির মা এই কথা বলিতে বলিতে ক্রমশ কুসুমকামিনীর নিকটবর্ত্তিনী হইল। কুসুম, বেগতিক বুঝিয়া দুই-চারি পা পশ্চাৎ হটিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

তখন হরির মায়ের বিক্রম আরও বাড়িল। মুখখানিকে অধিকতর বিকৃত করিয়া খাঁটি বাজখাঁই সুরে আরম্ভ করিল,—“যাস্ কোথা লো—ময়না! পিঠ যে পেতে দিয়েচি লো,—তুই যদি আজ আমাকে না মারিস্, তবে তুই ভেয়ের মাথা খাস্।”

এই বলিয়া হরির মা, কুসুমের গায়ে, পিঠ ঠেকাইয়া দিল।

ইত্যবসরে, পতিতপাবন, বিষম বিভ্রাট উপস্থিত

দুই দাসীর দ্বন্দ্ব।

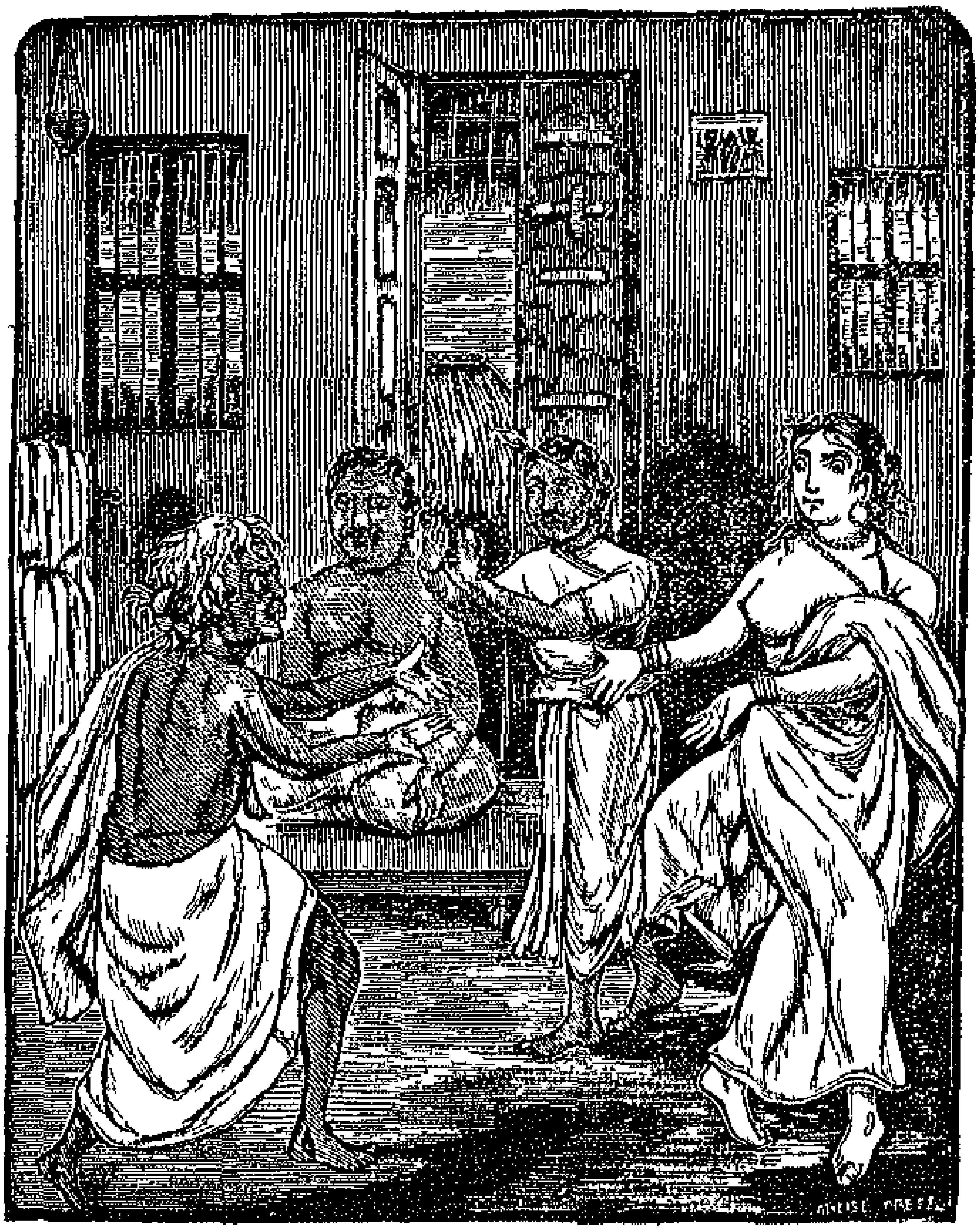

দেখিয়া, হাঁ—হাঁ রবে দৌড়িয়া গিয়া, তাহাদের উভয়ের সংমিলিত অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া, মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন কুসুম বলিতেছেন,—"ঠাকুদ্দা! তুমি সরে যাও, পথ ছেড়ে দাও,—ও কেমন হরের মা—বেটা-খাগী!—ওকে আমি একবার বুঝ্‌বো। ওর মুখ দিয়ে রক্ত বার না ক'রে আজ জলগ্রহণ কর্‌বো না।"

এ দিকে হরির মা পতিতকে বলিতেছেন,—"তুমি সুমুখে দাঁড়ালে কেন? সরো বল্‌চি—ও নচ্ছারনী—ভাই-খাগী-আমাকে একবার মারুক্‌,—ওর গতরে তেজ কত,—মগজে ঘী কত,—আমি একবার দেখ্‌বো!—আরে মোর তুমি-রে! যা-নয়-তাই—ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি!"

প্রকৃতই এবার রণভূমের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। দক্ষিণে কুসুমকামিনী, বামে হরির জননী,—মধ্যভাগে শ্রীপতিতপাবন। একদিকে শেয়া-কুল, অন্যদিকে বাব্‌লা,—মধ্যস্থলে খেজুর। এক-দিকে কুক্কুরী, অন্যদিকে শৃগালী,—মধ্যস্থলে বলীবর্দ্দ।

রণভূমির শোভা যতই বৃদ্ধি পায়, পতিতের অবস্থা ততই শোচনীয় দৃষ্ট হয়। রণ-রঙ্গিণী দুইটী মাতঙ্গিনী, পতিত-পেয়ারাবৃক্ষের দুইদিক হইতে দুইটী বাহু-শাখা লইয়া আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সম্প্রকর্ষণ করিতেছেন! আর, ঐ মাতঙ্গিনীদ্বয় যেন বৃংহিতধ্বনি করিয়া মুখে এই কথা বলিতেছেন, "একবার পথ ছাড়িয়া দাও, একবার পথ ছাড়িয়া দাও,—রণভূমে অদ্য রুধিরের নদী বহাইব।" পতিত-পেয়ারাবৃক্ষ দুইটী বাহু-শাখা লইয়া উভয়কেই আটক করিয়া থামাইতেছেন, "ক্রোধ সম্বরণ কর, ক্রোধ সম্বরণ কর,—রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

ক্রমে বাহু-শাখাদ্বয় দেহ-স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। ঘোররণে মাতঙ্গিনীদ্বয়ের বসনভূষণও শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। রণ-সংঘর্ষণে কুসুমকামিনীর দক্ষিণ-হস্ত-স্থিত চুড়ি কতক ভাঙ্গিয়া ভূতলে পতিত হইল। অর্দ্ধ-ভগ্নভাবে কতক চুড়ি হস্তে সংলগ্ন রহিল। সেই অর্দ্ধভগ্ন চুড়ির আঘাতে পতিতের কপাল দিয়া

রুধির-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে এই মহাসমরে ক্রমশ পতিতেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিল। পরামাণিকের প্রাণ ওষ্ঠে আসিল।

কালাচাঁদ এখনও ধীবভাবে বসিয়া আছেন। সম্মুখে যে এরূপ প্রলয়-ঝড় বহিয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি তাঁহার যেন দৃক্পাত নাই। বোধ হয় তিনি এখনও মনে মনে মহানন্দ উপভোগ করিতেছেন। কিন্তু ইহা কি আমোদ-কৌতুকের সময়? তিনটা লোক খুনোখুনি করিতেছে, ইহা দেখিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কালাচাঁদের এখন মজা দেখাটা—উচিত হইয়াছে কি?

উচিত হউক, আর অনুচিতই হউক—কালাচাঁদ মোদ্দা মজাই দেখিতে লাগিলেন। ওদিকে সমর-রঙ্গ-ভঙ্গ ক্রমশই চরমমাত্রায় উঠিতে চলিল। কুসুমের কবরী খসিল, চুল এলাইয়া পড়িল, টীপ্ মুছিয়া গেল,—অধিক আর কি বলিব,—অঙ্গের বসনও বিধ্বস্ত হইল।

এদিকে হরির মাতা, বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিয়া সজোরে স্বয়ং তদুপরি চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই চটাচট্, পটাপট্, সটাসট্ শব্দে পল্লী প্রকম্পিত হইল। আর তিনি তদুপলক্ষে মুখে বুলি ধরিলেন,—"অলো কুসমী-লো!—মার্-না—মার্-না—মার্না-লো!—তুই যদি না মারিস্, তুই ভেয়ের মাথা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাস্ লো!" হরির মাতার তখন গলা ভাঙ্গিয়াছে,—কণ্ঠস্বর স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইতেছে না।

আর সে-দিকে,—অর্থাৎ পতিতপাবনের দিকে, যাহা ঘটিল, তাহা আর বলিবার উপযুক্ত নহে। সে এক বিতিকিচ্ছি বীভৎস ব্যাপার! কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়, চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়, নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিতে হয়। সমর-সংঘর্ষণে শ্রীল শ্রীযুক্ত পতিতপাবন পরামাণিক মহাশয়ের কোমরের কাপড় খুলিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে পতিতও ভূমিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিলেন। কুসুমকামিনী অমনি বেগে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত

হইলেন। হরির মাতাও কুসুমের সম্মুখীন হইবার আশায় সে গৃহ পরিত্যাগের উদ্‌যোগ করিলেন।

তখন কালাচাঁদ দৌড়িয়া গিয়া হরির মাকে আটকাইলেন; আর তাহাকে ঘরের বাহির হইতে দিলেন না। মুরুব্বি-আনা-ভাবে বুড়ীকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—"যাঃ বুড়ী বেটী! ঐ ঘরের ভিতর ব'স্‌গে যা! আর ঝগড়া করে না!"

বৃদ্ধাকে ঠেলিয়া দিয়া, কালাচাঁদ বাহির হইয়া, ঘরে শিকল দিয়া রাখিলেন। সম্মুখে কুসুমকে দেখিয়া তিনি মধুর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"কেন মা! আর, বিবাদ কর? দেখ্‌চো ত ঐ বুড়ী ভারি দুষ্ট!—তুমি ঘরে যাও।"

কুসুম তখন কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলিল, "আপনি মোশাই! ভদ্র লোক। এর বিচার করুন,—আমার কোন দোষ আছে কি না?"

কালাচাঁদ কহিলেন,—"না।"

কুসুম তখন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—বলিল, "ঐ বুড়ী কি না দশজনের

সাক্ষাতে আমার ভাই-কেটে গাল দেয়! নাপিত-ঠাকুদ্দা আমাকে কি না ডেকে এনে এই অপমান কল্লেন?”

কালাচাঁদ। মা! তুমি আর কেঁদো না—ঘরে যাও।

কুসুমকামিনী তখন সর্ব্বরকমে পরম আপ্যায়িত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, গালি দিতে দিতে, গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য, হরির মাতাই ঝী-রূপে কালাচাঁদের গৃহে রহিল। পতিতপাবন অবশ্যই কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইল; তবে মুখ ফুটিয়া কালাচাঁদকে কোন কথা বলিতে পারিল না।

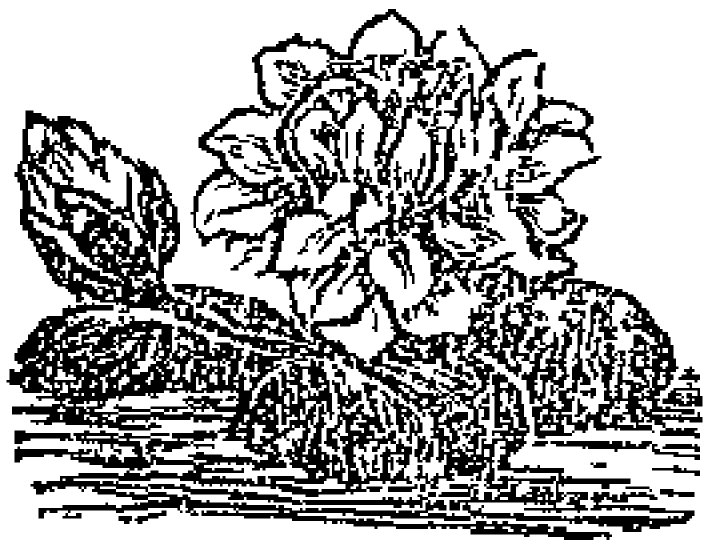

## নবম পরিচ্ছেদ।

প্রথম চেষ্টা বিফল হইল। তার পর দ্বিতীয় চেষ্টা। কালাচাঁদের গঙ্গাস্নান যাইবার পথে, কয়েক ঘর বেশ্যার বাস ছিল। পতিতের শিক্ষামত বারাঙ্গনাগণ কালাচাঁদকে দেখিয়া মুচকি হাসিত, ইশারা-ইঙ্গিত করিত, কখন বা স্পষ্টতঃ বলিত, “আসুন্ না মোশাই!—এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাবেন!” কালাচাঁদ ঈষৎ হাসিয়াই কথা উড়াইয়া দিতেন।

একবার পতিতের ষড়যন্ত্রে বার জন বিলাসিনী গঙ্গার ঘাটে কালাচাঁদকে ঘেরাও করিয়াছিল। কালাচাঁদ বিব্রত হইয়া বলিলেন, “আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও।” প্রধানা বেশ্যা উত্তর দিল,—“যদি কথা রাখো, তবে পথ ছাড়িব।”

কালাচাঁদ। আমার সঙ্গে তোমাদের আবার কি কথা?

প্রধানা। কোন গূঢ় কথা না থাকিলে কি আর আমরা তোমার শরণ নিতে এসেচি?

কালাচাঁদ মনে মনে ভাবিলেন, "বাবা! বেশ্যা-গুলা বলে কি?—আমার আবার শরণ নিতে চায়!"

প্রধানা। কথাটী রাখ্‌বে ব'লো—তা' হলে বলি। নহিলে বেণাবনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কি?

কালাচাঁদ। কি কথাটাই আগে বল না কেন? রাখারাখি কথা পরে হবে।

প্রধানা। (হাসিয়া) তা হবে না,—আমাদের এক একটী কথার দামই লাখ টাকা। কথাটী শুনে নিয়ে শেষে তুমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাও—আর, আমরা ফ্যাল-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকি আর কি? বাঃ বাঃ মজা বেশ! আগে তুমি গঙ্গা-সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বীকার কর যে, নিশ্চয় আমাদের কথা রক্ষা করিবে,—তবে ত আমরা সে কথা বলিব!

কালাচাঁদ। আমি এত সাত-সতের কাণ্ড

করিতে, প্রতিজ্ঞা করিতে, গঙ্গাজলি করিতে পারিব না। তোমাদের ইচ্ছা না হয়,—সে কথা আমাকে বলিয়া কাজ নাই। তার পর, তোমরাও ঘরে যাও, আমিও ঘরে যাই। স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে এমনভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিব?

প্রধানা। কাপড় তোমার ভিজেই হউক, শুক্‌নাই হউক,—পথ আমরা কিছুতেই ছাড়িতেছি না। আমরা এই তোমাকে ঘেরিয়া রহিলাম,—তোমার শক্তি থাকে, আমাদিগকে ভে করিয়া যাও।

কালাচাঁদ মনে করিলেন, "এ পর্য্যন্ত বিপদে ত কখনও পড়ি নাই। এমন ঘটনাও ত কখন দেখি নাই। হুগলীট বিশ্রী সহর। এখানে মেয়ে মানুষে মাথায় চড়ে বেড়ায়!—এই মেয়েগুলা ঠেলিয়া ভেদ করিয়াই বা যাই কি একটা মেয়েকে ধাক্কা মারিয়া য় যাইতে চাই,—আর যদি বা হইয়া

আমার ঘাড়ে পড়িয়া আমাকে আটকাইবার চেষ্টা করে,—তখন ত একটা বিপরীত-ব্যাপার ঘটিয়া উঠিবে। মেয়েগুলার সঙ্গে ধরাধরি, ছুটাপাটি, পাছড়া-পাছড়ি, বাধিয়া যাইবে। হয় ত আমার দারুণ আঘাতে কোন মেয়েটার হাত ভাঙ্গিবে, নাক দিয়া মুখ দিয়া, রক্ত পড়িবে, কাহারও বা চুল এলাইয়া ছিন্নভিন্ন হইবে,—এমন কি, কেহ বা বিবস্ত্রাও হইতে পারে। এখন, এই রাখ শ্যাগুলার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কি?—আচ্ছা, ইহাদের সেই গূঢ় কথাটাই কি,— এক ঘা শুনা যাক্ না কেন?—তার পর যা হয় শুনে পি প্রথমত একটা কৌশল করা যাক্।"

আর, আ ভাবিয়া কালাচাঁদ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি কি? বাঃ কথা রাখিব,—প্রতিজ্ঞা করিতেছি। সাক্ষাতে প্রতি াদিগকেও আমার নিকট এক সত্য আমাদের কথা র—"

কথা বলিব! ামরা সকলেই রাজী আছি।

কালাচাঁদ। আমি,—এ কোন্ বড় কথা? তুমি

বার-নারী বেষ্টিত কালাচাঁদ।

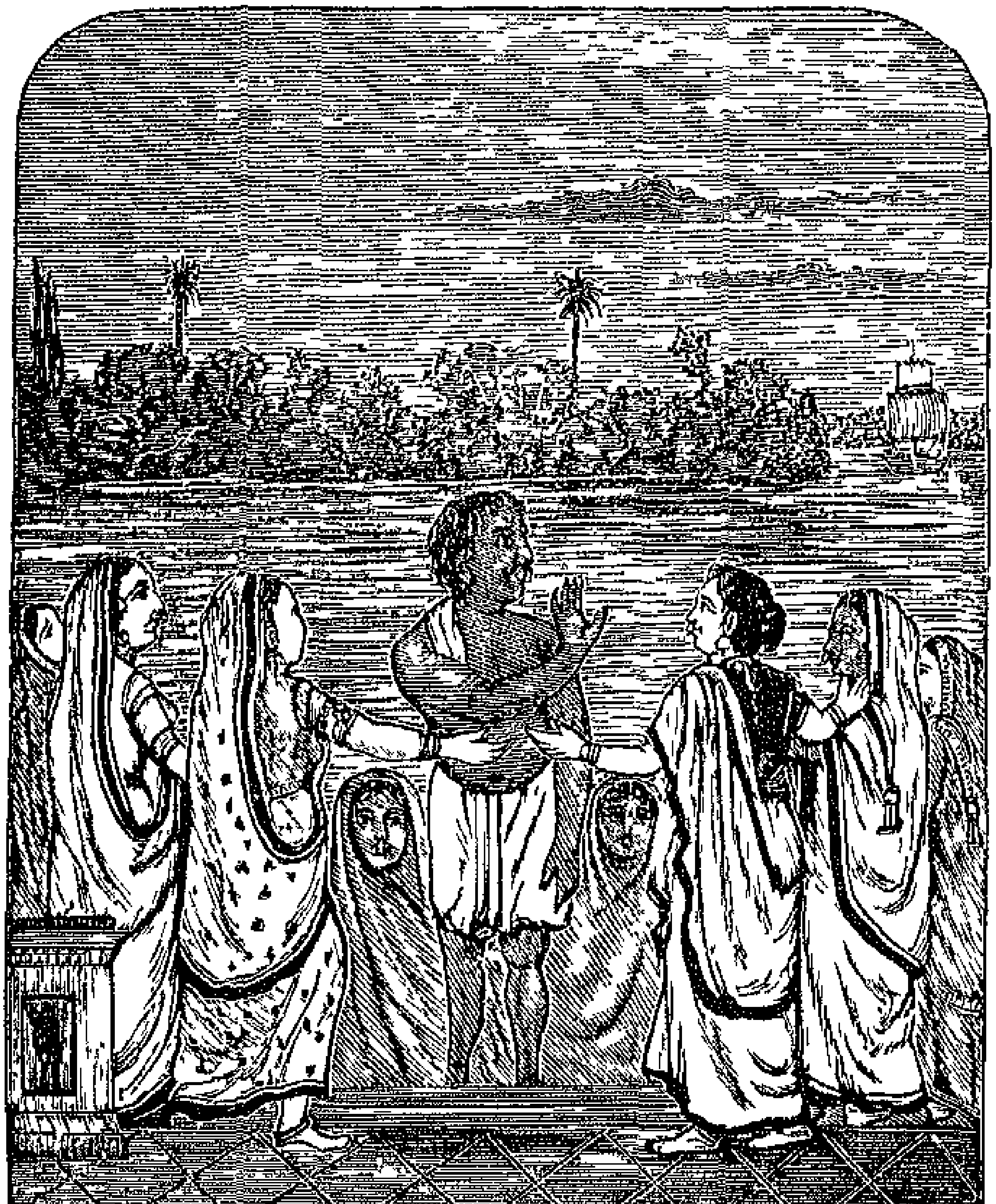



কথা ২

কালি

হ'লে আজ আমাদের ইষ্টদেবতা!—তুমি যা বলিবে, তাই করিব।

কালাচাঁদ। এইবার তবে তোমাদের সেই গূঢ় কথা বল।

প্রধানা। অদ্য রাস-পূর্ণিমা। আমরা একটী কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। তোমাকে সেই পদে বরণ করিলাম। অদ্য রাসলীলায় তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ সাজিতে হইবে।

কালাচাঁদের শরীর দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। বাজারের বেশ্যাগুলা বলে কি? ইহাদের এত সাহস বাড়িল কিসে? আমার সঙ্গে আলাপ নাই, চাক্ষুষ কথাবার্ত্তা নাই, পরিচয় নাই, ইহারা পথে যাইতে আমাকে দেখে এই মাত্র—তথাচ ইহাদের এত আস্পর্দ্ধা হইল কিরূপে? অবশ্যই ইহারা কাহারও নিকট হইতে সাহস পাইয়া, আমাকে এরূপ-ভাবে বেষ্টন করিয়াছে। বোধ হয়, বন্ধু পতিতপাবনেরই এই কাজ। যাহাই হউক,—উদ্ধারের এখন উপায় কি? ইহারা যদি বারজন স্ত্রীলোক না হইয়া

বারজন মল্ল-বেশধারী অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত দস্যু হইত,—তাহা হইলে আমি এত ভয় করিতাম না।—এত কেন, ইহার সিকির সিকি ভয়ও করিতাম না। এখন মেয়ে-মানুষের গায়ে হাত তুলিব কেমন করিয়া?—শুধু হাত তোলা নয়,—প্রকৃত-প্রস্তাবে মল্ল-যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবে। তাহাই বা কেমন করিয়া করি? বিষম লেঠা দেখিতেছি। যা'হোক,—এখন কথা কাটাকাটিই খানিক চলুক,—ভবিষ্যতে অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে।

তখন কালাচাঁদ ধীরভাবে বেশ্যাগণকে বলিবেন, "আমি আমার প্রতিজ্ঞামত নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সাজিতেছি। কিন্তু তোমরা এখন তোমাদের সত্য রক্ষা কর।"

প্রধানা। প্রভুর যা আজ্ঞা হয়, এ দাসীগণ এখনি তাই করিতে সম্মত।

কালাচাঁদ। আমার কথা এই,—'তোমরা পথ ছাড়িয়া দাও, আমি ঘর যাইব।'

তখন বেশ্যামণ্ডলী হইতে একটা কল-কল-

হল-হল ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু প্রধানা নায়িকা, সকলকে থামাইয়া কালাচাঁদের উদ্দেশে যোড়হাতে বলিল, "তুমি কি ফাঁকি দিয়ে পালাবে হে শ্যাম?—তুমি কি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাবে হে?—তা'ত হবে না!—পলাতে ত দিব না! আমরা প্রেমডোরে বেঁধে তোমায়, হৃদি-কারাগারে রাখ্‌ব বার মাস।"

এ কথা শুনিয়া কালাচাঁদের পায়ের নখের মুড়ি হইতে মাথার চুলের ডগ পর্য্যন্ত একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি একটা বিভীষণ হুঙ্কার ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে যেন দশহাত লাফাইয়া উঠিলেন।

তার পর কি ঘটনা ঘটিল, তাহার প্রকৃত ইতিহাস নাই। পতিত বলেন,—"কালাচাঁদ কয়েক জন বেশ্যা দেখিয়া, ভয়ে, গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন,—শেষে সাঁতার কাটিয়া, গঙ্গা পার হইয়া গরিফায় গিয়া আশ্রয় লন।" কালাচাঁদ বলেন, "আমি লাফাইয়া বীর-পুরুষের ন্যায় চলিয়া

আসি,—বেশ্যারা আমার গামছা-খানি ধরে,—তা, গামছা-খানি তাহাদের হাতেই থাকিয়া যায়।” সে যাহা হউক—এ প্রসঙ্গ লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে।

পতিতপাবনের সব আশাই অন্তর্হিত হইল। কালাচাঁদ, কামিনীর মোহিনী মায়ায় ভুলিলেন না, কাম-ফাঁদে পড়িলেন না। পতিতের দুঃখের অবধি রহিল না।

## দশম পরিচ্ছেদ।

কারাবাসের পূর্ব্বে, কালাচাঁদ মদ, ভাঙ্গ, গাঁজা, আফিং, চরস, চণ্ডু, সিদ্ধি, তামাক—সব কয়টা নেশাই যথানিয়মে করিয়াছিলেন। তবে সুবিধার মধ্যে এই ছিল,—তিনি কোন নেশারই অধীন হইয়া পড়েন নাই। যখন যে মাদক-দ্রব্যটা সম্মুখে পাইতেন, তখন তাহাই সেবন করিতেন। দশদিন কোন নেশা করিতে পারিলেন না,—তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। তামাকটা কিন্তু প্রায় অষ্ট-প্রহরই আবশ্যক হইত।

কাবাগারেও কালাচাঁদের কিছু-কিছু নেশার কার্য্য চলিয়াছিল। কারামুক্তির পর কালাচাঁদ সব নেশাই এককালে ছাড়িয়া দিলেন;—কেবল কয়েক দিনমাত্র গাঁজা এক-আধ-ছিলিম খাইতেন। শেষে তাহাও তিনি পরিত্যাগ করিলেন। রহিল কেবল, গুড়ুক-তামাক,—সেটা যেন সঙ্গের সাথী।

কালাচাঁদের গাঁজা-ত্যাগের কথা শুনিয়া, পতিত-

পাবনের ডাক-ছাড়িয়া কান্না পাইল। শতপুত্রের শোক পতিত ভুলিতে পারে,—কিন্তু কালাচাঁদের গাঁজাত্যাগের কথা ভুলিবার নহে। হে গাঁজে! তুমি ত্বরিতানন্দ! তোমার মহিমায় মুহূর্ত্তমধ্যে করতলে স্বর্গ পাই। তুমি আছ বলিয়াই, এ-সংসার, মরুভূমি হইয়াও, ফুল্লকমলদলপূর্ণ কেলীকুঞ্জবন। তোমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া, পথশ্রান্ত পথিক সর্ব্বকষ্ট ভুলিয়া যায়। তোমার সাহায্যে, ব্যোমযান-ব্যতীত, আকাশপথে উড়িতে পারি। তোমারই সাহায্যে, বাষ্পীয়-শকট-ব্যতীতও, অল্পসময় মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ-ভ্রমণে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম! তুমি যখন দেহে বাস কর, তখন ক্ষুধা থাকে না, তৃষ্ণা থাকে না, বাসনা থাকে না;—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পুরুষের ন্যায়, আত্মারাম হইয়া কেবল এক অক্ষয়, অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ উপভোগ করি। তখন কেবল মনে হয়,—

আমি কার, কে আমার
কারে ভাবিরে আপন।

এ-হেন গঞ্জিকা-বিহনে পরামাণিকের কান্নাই ত আসিতে পারে। কান্না ত সামান্য কথা,—নিদারুণ-যন্ত্রণায় পতিতের দেহ যে, চৌষট্টি-খণ্ডে বিভক্ত হয় নাই,—ইহাই আশ্চর্য্য। পতিত, প্রকৃত বীর-পুরুষ বলিয়াই, এ দুরন্ত দৈব-বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; অন্য কোন সামান্য মানব হইলে, সেই দিনই তাহার অপমৃত্যু ঘটিত।

অভিমান ভরে পতিত গোটা একদিন-কাল কালাচাঁদের সহিত কথা কহে নাই। কিন্তু কালা-চাঁদ যে, পরামাণিকের প্রাণের বন্ধু;—কথা না কহিয়া কতক্ষণ তিষ্ঠিবে?

পরদিন প্রাতে তামাক খাইতে খাইতে পতিত খুব গম্ভীর স্বরে কালাচাঁদকে বলিল;—"বন্ধু! তুমি কাজটা ভাল কর নাই। বড়ই কু-কাজ হইয়াছে।"

কালাচাঁদ ব্যাপার তত তলাইয়া বুঝেন নাই—একটু চমকাইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"এঁ,—আমি এমন কি খারাপ কাজ করিয়াছি?—কিছুই ত মনে হয় না!!"

পতিত। আমি একা নই,—পাড়ার সকলেই বলিতেছে,—অতি মন্দ কাজ হইয়াছে। আমার নিজের জন্য বলি নাই;—বন্ধু! তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই বলিতেছি।

কালাচাঁদ। বলই-না শুনি,—মন্দ কাজটা কি?

পতিত। এই, এখানকার জল একরকম,—সেখানকার জল একরকম;—এখানকার খাওয়া একরকম, সেখানকার খাওয়া একরকম! তা, সহ্য হবে কেন? শেষে একটা ঘোরতর কাণ্ড উপস্থিত হবে দেখ্‌চি।

কালাচাঁদ। অত ভূমিকায় কাজ কি?—খুলেই বল না,—কি হয়েচে?

পতিত। তোমাকে আর সে সব কথা বলেই বা কি হবে?—তুমি কি বুঝালে, বুঝ যে,—বুঝাব? তখন এক দিন-কাল ছিল,—পতিত যা বল্‌তো, তাই হ'তো। এখন পতিতকে মানে কে? পতিতের কথা শুনে কে? বন্ধু! তোমারই

ভালোর জন্য বলি। এতে আমার কিছু স্বার্থ নাই।

কালাচাঁদ। আঃ,—কি তোমার কথা আছে, সোজা-সুজি বল্‌বে ত বল!—নহিলে আমি এখনি উঠে চল্লেম। ধান্‌ভান্‌তে আমি এত শিবের গীত শুন্‌তে পারি না।

পতিত। তা, পতিতের কথা এখন শিবের গীত হবে বৈ কি? পতিতকে এখন বেঙেও লাথী মেরে যায়! কিন্তু পতিত যা বলে, তাই ফলে। পতিত বলেছিল, বাঁড়ুয্যেদের নারকেল গাছে বাজ্ পড়্‌বে, তা, এক মাস সইলো না, গাছে বাজ্ পড়্‌লো!

কালাচাঁদ মনে মনে হাসিলেন। বাহ্যিক গম্ভীর-ভাব দেখাইয়া, মিষ্ট বাক্যে কহিলেন,—"বন্ধু। তুমি রাগ কর কেন? আমি তোমার কোন্ কথা শুনি নাই?—তুমি কোন একটা কথা বলিলে, তাহা কি আমি না শুনিতে পারি?"

পতিতের মন একটু প্রসন্ন হইল। বলিল,—

"তোমাকে আমি পর ভাবি না। বন্ধু! তোমাব উপর কেমন যে একটা ঝোঁক্ পড়েচে, তা, তোমার 'ভালাই' আমাকে আট-পহরই ভাব্‌তে হয়। এই হুগলী-সহবটী এক পক্ষে বেশ ভাল হ'লেও, অন্য পক্ষে বড় খারাপ। বন্ধু! দেখ্‌চো না, এখানে অধিকাংশ লোকেরই পায়ে গোদ, গলায় গর্‌গণ্ড, হাতে ফুলো! কেন এমন হয়?—এখানকাব জলে একটা দোষ আছে।"

কালাচাঁদ। জলে দোষ থাক্‌লে ত, আমার এতদিন গোদ, গর্‌গণ্ড—সবই হ'তো। বন্ধু! তুমি জানো ত,—দু-ঘণ্টার কম আমাব স্নান হয় না—অন্তত এক শ ডুবের কম আমার তৃপ্তি হয় না,—ডুব-সাঁতার-কেটে অন্তত একবার মাঝ-গঙ্গায় না গেলে আমার পূর্ণ-স্নান হয় না,—এ সবই ত তুমি জানো;—তবে কেন তুমি বল্‌চো,—এখানকার জলে দোষ আছে? জলে যদি কোন দোষ থাক্‌তো, তা হলে আমি আর এতদিন বাঁচতাম না।

পতিতপাবন এইবার তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ন্যায়

ওস্তাদিধরণে খুব খানিক হাসিয়া বলিল,—"বন্ধু! তুমি এতদিন ভাল ছিলে বটে, কিন্তু এখন তুমি আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছ।"

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) আমার ঘরে কুড়ুলই নাই,—তা, আবার পায়ে চোটাব কেমন করে?

পতিত। বন্ধু! আমি তোমাকে তামাসা কর্‌চি না,—

কালাচাঁদ। তা, আমি কি দোষটা করেচি,—চোক-কাণ বুজে তাই বলেই ফেল না কেন?

পতিত। আচ্ছা, একটা কথা আগে তুমি বল;—এ দুদিন তোমার খিদে হচ্চে কেমন? প্রাতে চোঁয়া ঢৈ-ঢেঁকুর মারে কি না? সন্ধ্যার পর হাই উঠে কিনা? শরীরটা কেমন ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে কিনা?

কালাচাঁদ এইবার পতিতের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া, মনে-মনে অনন্ত-হাসি হাসিয়া, উদর পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। খানিক হাসি, উদর উপ্‌ছা-ইয়া, মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কালাচাঁদ উত্তর দিলেন, "এ দুদিন ক্ষুধা কম

হওয়া দূরে যাউক, বরং বৃদ্ধিই রাখিয়াছে। বেলা দুইপ্রহরে ভাত খাইলাম,—আবার দুইটা না-বাজিতে-বাজিতেই ক্ষুধার আরম্ভ। শেষ-রাত্রে উঠিয়া আবার ক্ষুধা। "হাই"—কখন্ উঠে তা'ত কিছুই জানি না।—

পতিত। পিদিমটা নিবিবার পূর্ব্বে একবার খুব জ্বলে উঠে বটে!—ওটা খিদে নয়—দিষ্টি-খিদে!—আর দু-চার দিন বাদে, বন্ধু। তুমি আমাব কথা জান্‌তে পার্‌বে!

কালাচাঁদ। দু-চার দিন পরে আমার কি রোগ হবে,—তা, আমি এখন থেকে কেমন ক'রে জান্‌বো—

পতিত। জান্‌তে হয়!—সংসারে থাক্‌তে হ'লেই, জান্‌তে হয়;—

কালাচাঁদ। আমি ত কিছু জান্‌তে-টান্‌তে পারচি না,—তুমি কিছু* জেনে থাক,—বলে দাও।

পতিত। বলাবলিই আর কি আছে?—তুমি ত কারু কথা শুন্‌বে না—বলেই বা কি ফল আছে?

তবে তোমার কষ্ট দেখ্‌তে পারি না—তাই বল্‌তে হয়।

দুঃখমিশ্রিত ক্রোধভরে পতিতপাবনের অবস্থান।

কালাচাঁদ। বন্ধু! তুমি বলো,—বলো!

পতিত। এই, তরুণ্ড থেকে তুমি একেবারে তামাক খাওয়াটা উঠিয়ে দিলে!—তা, আমি একজন ঘরে রয়েচি, আমাকে ত একবার জিজ্ঞেস্ করলেও হতো! আমি দেখ্‌চি;—তুমি আপন মনে কাজ করচো—আমি সে সময় বাধা দিব কেন?—আমি মজা দেখ্‌চি,—এখন ও করচে করুক;—এই দু-দিন পরে, শেষে আমার কাছে গুড়িয়ে আস্‌তে হ'বে! তখন পতিতকে না-হ'লে কারু চলবে না! তবে কি না,—বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমার বড়ই ভালবাসাটা হয়েচে,—তাই এ কথা আজ না ব'লে থাক্‌তে পার্‌লাম না।

হাস্যরস-ময় কালাচাঁদ দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া বলিলেন,—"বন্ধু! আমি কি সাধ ক'রে 'বড়-তামাক্‌টা' একবারে ছেড়ে দিয়েচি? এর ভিতর

অনেক গোপনীয় কথা আছে! আমার বিছানার উপর একদিন একটা জবাফুল পড়েছিল, তাহা কি তুমি দেখেছিলে?”

পতিত। দেখি নাই,—ঝীয়ের মুখে শুনেছিলাম বটে।

কালাচাঁদ তখন কথার স্বর নরম করিলেন,—বলিলেন, “সে'ত ফুল নয়,—মা-কালীর অনুগ্রহ।”

কালাচাঁদ আর কথা না কহিয়া, পতিতের কাণে কাণে কি কথা বলিলেন।

পতিত শিহরিয়া উঠিল। তাহার নয়নদ্বয় বিস্তৃত হইল। মুখটা ‘হাঁ’ হইয়া গেল। পতিত বলিল, “বল কি, বন্ধু! বল কি?”

কালাচাঁদ। এর্ সবটাই সত্য। তাই ‘তামাক’ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

পতিত প্রকৃতিস্থ হইয়া, খানিক ভাবিয়া বলিল, “মা-কালীর আজ্ঞে, অবিশ্যি লঙ্ঘন করিতে নেই;—কিন্তু কথক-ঠাকুর সে-দিন বলেছিলেন, শরীরটে আগে, ধর্ম্মটা পরে।”

কালাচাঁদ। কি কর্‌বো বল, বন্ধু!—শরীর রক্ষা করিতে গেলে, মা-কালীর আজ্ঞে লঙ্ঘন করিতে হয়। কাজেই তামাকটা ত্যাগ করিতে হইল।

পতিত আর কোন কথা কহিল না। ত্বরায় তথা হইতে উঠিয়া গেল। ঘরেও আর তিষ্ঠিল না। 'ভাঁড়' বগলে করিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। আপন-মনে যদৃচ্ছাক্রমে যাইতে যাইতে বোধ হয় এই ভাবিল,—"কালাচাঁদ ত গাঁজাটা ছাড়িয়া দিল। এর পর যদি মাছটা ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে এ সংসারে থাকাই বৃথা!"

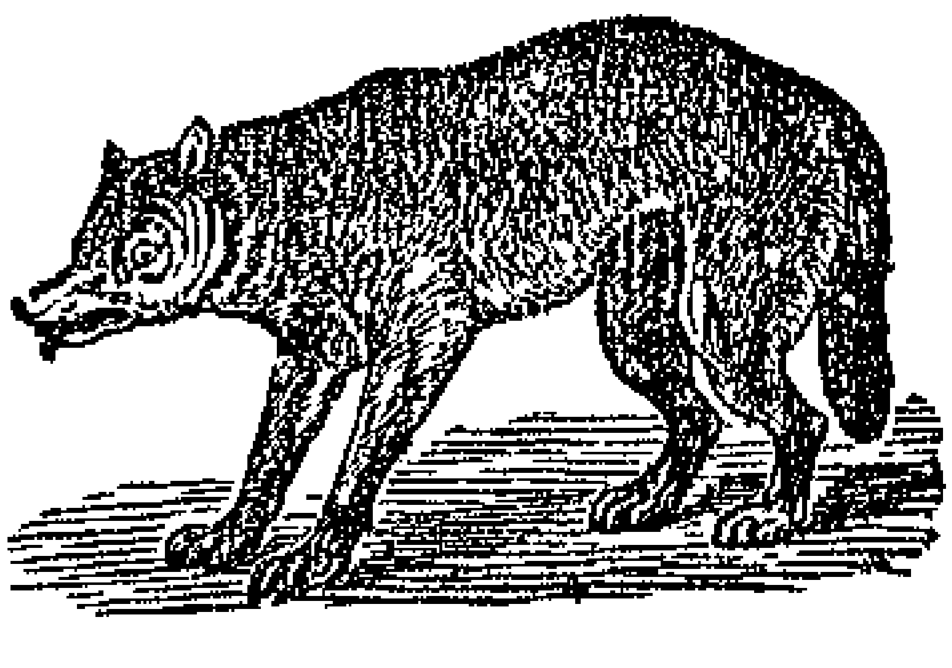

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

রমণী এবং গঞ্জিকা উভয়ই কালাচাঁদ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল,—তথাচ পতিতপাবন ক্ষান্ত নাই। কালাচাঁদ কিসে মদিরা-সুধায় আসক্ত হন,—তাহাই তখন তাহার ভাবনার বিষয় হইল। কালাচাঁদের যদি কোন দিন সর্দ্দি করে, পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" গ্রীষ্মে যদি কালাচাঁদের ঘাম ঝরে, পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" বসন্তে যদি মলয় বায়ু বহে, পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" যে দিন আমোদ-প্রমোদ-সঙ্গীত হয়, সে দিন পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" যে দিন কোন কারণে শোক-দুঃখ ঘটে, সে দিনও পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" যে দিন বর্ষা-বাদলে বাটীতে চাল-কড়াই-ভাজা হয়, পতিত সে দিনও

উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" কালাচাঁদ কিন্তু কিছুতেই মদ খাইলেন না।

পতিত এক এক দিন, কালাচাঁদের সম্মুখে, অন্যের সহিত, সুরা-বিষয়ে বিচার করিতে বসিত। পতিত বলিত,—"মদে কোন দোষ নাই, তবে অধিক মাত্রায় খাইলেই দোষ। মদ মহৌষধ-স্বরূপ। জ্বর-বিকার হইয়াছে;—ঔষধ মদ। পাঁচ-ক্রোশ পথ চলিয়া পা-দুটী অসাড় হইয়াছে;—ঔষধ মদ। কেহ পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়াছে,—ঔষধ মদ। মদ অতি মূল্যবান্ সামগ্রী,—উহা যেরূপ উচ্চ-অঙ্গের জিনিস, তাহাতে উহার দাম আরও অধিক হওয়া উচিত। তবে মাত্রা অধিক হইলে, মদে দোষ ঘটে। তা, মাত্রা অধিক হইলে, কোন্ জিনিস্‌টায় দোষ না ঘটে? সন্দেস অতি উপাদেয় বস্তু। খুব বেশী খাও, পেট ফাঁপিবে,—আরও খুব বেশী খাও, পেট ফাটিয়া যাইবে। সেইরূপ মদে কোন দোষ নাই, মাত্রায় কেবল দোষ আছে। মদে কোন দোষত নাইই,

অধিকন্তু মদ সুপবিত্র। মদ দেবতার ভোগে লাগে। মদ মা-কালীর প্রসাদ! মদ যদি অপবিত্র অশুদ্ধ, হেয় দ্রব্য হইত, তাহা হইলে মা-কালী উহা তাঁহার পানীয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেন? সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখ, মদে কোন দোষ নাই।”

এত বিচার বিতর্ক শুনিয়াও, কালাচাঁদ মদ ধরিলেন না। পতিতের দুর্ভাবনার সীমা রহিল না। পতিতের ইচ্ছা হইল, কালাচাঁদের যদি একবার জ্বর-বিকার হয়, তাহা হইলে উহাকে মনের সাধে মদ খাওয়াই। কিন্তু জ্বর-বিকারত কাহারও হাত-ধরা নয়! পতিত ভাবিল, কালাচাঁদ যদি একবার দড়াম্ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায়,—হাতে-পায়ে-গায়ে খুব ব্যথা লাগে,—তাহা হইলে বন্ধুকে মদ খাওয়াইবার খুব সুবিধা হইবে। তখন আর কাহারও কথা শুনিব না,—একেবারে জোর করিয়া মুখে মদ ঢালিয়া দিব। কিন্তু কালাচাঁদ পড়েন কিরূপে ?

ভাবিতে ভাবিতে পতিতের মনোমধ্যে এক সুযুক্তির কথা উদিত হইল।—“কালাচাঁদ খুব ভোরে উঠিয়া বেড়াইতে যায়। আমি খানিক তেল ফেলিয়া পৈঁঠা পিছল কবিয়া রাখি। যাই সে, পৈঁঠায় পা-টী বাড়াইয়া দিবে, অমনি চীৎপাত হইয়া পড়িয়া যাইবে।”

এইরূপ কল্পনা করিয়া, পতিত একসের সরিষার তৈল কিনিয়া আনিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহবে উঠিয়া পৈঁঠায় আচ্ছা করিয়া তেল ঢালিয়া দিল। স্বয়ং পতিত, কালাচাঁদের পতন দেখিবার জন্য, জানেলায় মুখটী দিয়া, জাগিয়া বসিয়া রহিল।

কালাচাঁদ প্রভাতে যথানিয়মে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যথানিয়মে দুপ করিয়া দোয়ার হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িলেন। কালাচাঁদ প্রাতে অন্যের অগোচরে, প্রায়ই লাফ মারিয়াই ভূমিতে অবতরণ করেন। এ সংবাদ পতিত জানিত না। তাই সে, পৈঁঠায় ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কালাচাঁদের লম্ফে,

"দুপ্" ইত্যাকার শব্দ হওয়ায়, পতিত নিশ্চয় করিল, বন্ধু অবশ্যই পড়িয়াছে।

তখন পতিত আস্তে-ব্যস্তে এইরূপ হাঁকাহাঁকি করিতে করিতে দৌড়িল,—"কি হে বন্ধু! কি হে বন্ধু!—প'ড়ে গেলে না-কি? আহা-হাঃ—ভারি লেগেচে, ভারি লেগেচে।"

পতিতের অদ্য হঠাৎ এই কাণ্ড দেখিয়া কালাচাঁদ কিছু চমকিত হইলেন। প্রথমত তিনি কোন কথা কহিলেন না।

পতিত স্থির করিলেন,—বন্ধু তবে পড়িয়া মূর্চ্ছা গিয়াছে;—তাই কথা কহিতেছে না।

পতিত উচ্চরবে মূর্চ্ছিত বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া আপ্যায়িত করিলেন,—"যাচ্চি, বন্ধু!—যাচ্চি!—কোন ভয় নেই! আমি একেবারে বড় ঔষধের যোগাড় ক'রে নিয়ে যাচ্চি। একটু থামো,—বন্ধু! এই তাকে একপোয়া মায়ের প্রসাদ আছে,—তাই নিয়ে যেয়ে খাওয়ালে, তবে তোমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গবে।"

এখনও কালাচাঁদের কথা নাই। তিনি স্থির-বুদ্ধিতে ভাবিতে লাগিলেন,—"আজিকার কাণ্ডখানা কি? প্রিয় বন্ধুটী আজ এমন করে কেন?" কালী-মায়ের প্রসাদের কথা শুনিয়া তাঁহার কতক চমক ভাঙ্গিল। "তবে কি পতিত আজ রাত্রি জাগিয়া আমার পতন প্রতীক্ষা করিতেছিল? 'পড়িলেই গায়ে ব্যথা!—অতএব মদ খাও।'—বন্ধু ত এইরূপ কৌশল-জাল পাতে নাই! আমার পড়িবার জন্য পতিত'ত কোনরূপ কল-কৌশল করে নাই?—ঐ পৈঁঠায় জল কেন? পাকা কলার ছোবা কেন? কলাপাতার নীচে মটরকলাই কেন? উহা ত জল নয়!—তেল যে!"

কালাচাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না। পতিত যখন তাক্ হইতে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ-কার্য্যে ব্যস্ত ছিল,—কালাচাঁদ তখন—সেই অবকাশে,—নিঃশব্দে দীর্ঘ-দীর্ঘ পা ফেলিয়া, বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। দ্রুতপদে একেবারে পাড়া ছাড়াইয়া, গঙ্গার ধার ধরিয়া, চুঁচুড়ায় গিয়া উপনীত হইলেন।

এ দিকে পতিত-পাবন ঔষধ-পত্র লইয়া আসিয়া দেখে,—রোগী নাই। পতিত চিন্তা-যুক্ত হইল,—রোগী পলাইল কোথা? এই ভোরবেলা মূর্চ্ছিত কালাচাঁদকে 'নিশিতে' ডাকিয়া লইয়া যায় নাই ত? ঘরে বসিয়া থাকা উচিত নহে,—বন্ধুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। পতিতও চাদর কাঁধে ফেলিয়া, বগলে গামছা-ঢাকা মহৌষধ লইয়া, বন্ধু-অন্বেষণে বহির্গত হইল। পথে যাহাকে পায়, তাহাকেই জিজ্ঞাসে,—"কেহ কি আমার বন্ধুকে দেখেচো।" অনেকে বলিল, "কালাচাঁদকে এই পথেই যাইতে দেখিয়াছি।" বেলা নয়টা পর্য্যন্ত পতিত সমস্ত হুগলী-সহরটা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, বন্ধুকে না পাইয়া, শুষ্কমুখে ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দেখিল, কালাচাঁদ স্বয়ং একটা দশসের রুইমাছ কুটিতেছেন। পতিত দেখিয়াই, চমকিয়া উঠিয়া ভাবিল,—"ভূত নাকি?"

কালাচাঁদ স্ফূর্ত্তির সহিত হাস্যমুখে পতিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বন্ধু। আজ কালিয়ে-

পোলাও হবে। পূজারি-ঠাকুর এসে রাঁধ্‌বেন বলেচেন। আজ দেখ্‌বো,—তুমি কত খেতে পারো।

কালাচাঁদকে ব্যথা-শূন্য এবং অক্ষত-দেহ দেখিয়া,—প্রফুল্লমনে মৎস্য-কর্ত্তন-কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া, পতিতের প্রকৃতই রাগ হইল। বলিল,—"আমাকে না বলে, না কয়ে,—আজই তুমি এত বড় মাছটা কিন্‌লে কেন? আজ রবিবার—আজ কি মাছ খেতে আছে?

কালাচাঁদ। আজ রবি নয়,—সোমবার।

পতিত। আচ্ছা, না হয় সোমবারই হলো। আমি যদি বাবা তারকনাথের 'সোমবার' আজ থেকেই কত্তে আরম্ভ করি,—তা'হলে ত সব নষ্ট হবে। আমাকে আগে জিজ্ঞেস্ করে—তবে এ সব কাজ আরম্ভ কত্তে হয়।

কালাচাঁদ। জিজ্ঞাসা করিবার সময় পাইলাম কৈ? কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, কে যেন এক কেঁড়ে তেল কিনে এনে গৌঁঠেয় মাখিয়ে রেখেচে।

আমি না জেনে, পৈঁঠে দিয়ে নাব্‌তে গেছি। অমনি পা পিছলে পড়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে গেল। বাঁচ্‌বার আর উপায় ছিল না। স্বপ্নে কালী মা বল্লেন,—তুই পাড়ার সমস্ত লোক্‌কে যদি কালিয়া-পোলাও খাওয়াস্‌, তবে তোর এই ব্যথা আরাম হবে। এমন সময় আমার ঘুমটী ভেঙ্গে গেল। দেখিলাম, ভোর হইয়াছে। অমনি দুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িয়া গিয়া, মল্লিক-কাসেমের হাট হইতে এই মাছটী কিনে এনেচি। বন্ধু! এতে আর আমার অপরাধ কি?

পতিত। তবে কি তেল আমি ফেলেচি নাকি? যে তেল ফেলেচে, তার সর্ব্বনাশ হো'ক! তিনদিন পেরুবে না—সে মরুক্‌। তার মুখের গ্রাস উড়ে যাক্‌।

কালাচাঁদ। বন্ধু! তুমি অমন কর্‌চো কেন?—তোমাকে ত আমি কিছুই বলি নাই।

পতিত। বলতে আর বাকি কি রহিল? এ যে ঝীকে মেরে বৌকে শেখান হ'লো,—এ কি কেউ

আর বুঝ্‌তে পারে না? পতিত জানে সব, বুঝে সব,—তবে পতিত ‘মরেচে, কথা কইতে নেই,’—এই যা পতিতের দোষ। যত দোষ, নন্দঘোষ। যে যা করুক্‌, দোষ হবে পতিতের। পতিত আর বেশী-দিন সংসারে থাক্‌বে না,—শীগ্রই বিবাগী হয়ে, কাশী-বিন্দাবন চলে যাবে। আর এ দেশে আস্‌বে না। বন্ধু! এ বাড়ীত তোমাকেই দান করেচি,—তুমিই ইহা ভোগ-দখল ক'রো।

কালাচাঁদ তখন কার্য্যগতি বুঝিয়া, হাসিয়া উঠিয়া, পতিতের হাত ধরিলেন। বলিলেন, “বন্ধু! আমার উপর কি তোমার রাগ করিতে আছে? এস,—ব'স।”

পতিত বসিলে, কালাচাঁদ তাহাকে স্বয়ং সাজিয়া একছিলিম গয়ার তামাক খাওয়াইলেন। তাম্রকূট-ধূমে দেহ পরিশুদ্ধ এবং প্রফুল্লিত হইলে, কালাচাঁদ পতিতের হাতে ৪৲ চারিটী টাকা দিয়া বলিলেন, “বন্ধু! পোলায়ের জন্য চাল, ঘি, মসলা, কিনে নিয়ে আস্‌তে হবে।”

পতিত টাকা চারিটী লইয়া ট্যাকে রাখিল। মনে মনে সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু মুখে একটু কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিল,—"পতিত এখন বাজার কত্তে পাল্লে হয়! হুঁ—হুঁ!—বন্ধু! তুমি এই যে, মাছটী নিজে কিনে নিয়ে এসেচো, এটী যদি আমার হাত দিয়ে কিন্‌তে, তা'হলে নিশ্চয়ই ১৲ এক টাকা সস্তা হ'তো। পাঁচগণ্ডা পয়সা—দস্তুরিই কেটে নিতেম। আর, তুমি কি মাছ চেনো? এ যে পশ্চিমে মাছ! এর যে ভাল সোয়াদ হবে না। ভারি ঠকিয়েচে! হাঃ হাঃ!—তোমার পয়সা সস্তা,—যা-ইচ্ছা তাই কর;—তবে নিতান্ত অন্যায়-গুলা দেখতে পারি না, তাই দু-কথা বলি! আমার চুপই আচ্ছা! কি জান, বন্ধু! পুকুরের দিশি-মাছ কেন্‌বার দরকার হ'লে, হাটে-বাজারে যেতে নেই। আগে জেলেবাড়ী যেতে হয়। গিয়ে, জেলেনীর সঙ্গে পরামোশ কত্তে হয়। সেই জেলের মেয়েকে মিষ্টি ক'রে দু-কথা বুঝিয়ে বল্লে, মাছটীও ভাল হয়, দু-পয়সা সস্তায়ও পাওয়া যায়।—"

কালাচাঁদ। এই হুগলী সহরে যার-ই মাছের দরকার হচ্চে, সে-ই কি অম্‌নি জেলেবাড়ী যেয়ে জেলেনীর সঙ্গে মিষ্টি কথা কচ্চে?

পতিত। বন্ধু! তোমাকে কথায় কেউ পার্‌বে না।

এই কথা কহিয়া পতিত বাহুনাড়া দিয়া বাজার করিতে চলিল। বহু-বিলম্বে বাজার হইতে ফিরিল। জিনিস-পত্র রাখিয়া, কালাচাঁদকে বলিতে লাগিল,—"গেলাম, মো'লাম,—উঃ, আর বাঁচিনা; বেলা তিতীয় পহর হইল, মুখে জল দিই নাই! বন্ধু! তোমার জন্য খেটে খেট গেলাম।"

বাজার করায় যতই কষ্ট হউক, সে দিন পতিত পরিতোষরূপে আহার অর্থ, এবং আনন্দ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক। শুস্ক-মূল ছাড়িয়া পাতায় জল সেচনে ফল কি?

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পতিতপাবন সর্ব্বপ্রকারে বিফল-মনোরথ হইল। অবশেষে অগত্যা কালাচাঁদকে একরকম ছাড়িয়াই দিল। মনে মনে ভাবিল, "কালাচাঁদকে সংশোধন করিবার আর উপায় দেখি না। লোকটা একবারে খারাপ হইয়া, বহিয়া গিয়াছে। নূতন ব্যক্তিকে লওয়ান সহজ; কিন্তু কালাচাঁদ বকেয়া-পাপী—উহাকে বশ করা বড়ই বিষম। কালাচাঁদ পুরাণ-পাপী,—ভুক্তভোগী—সিদ্ধ-পুরুষ। বাঁশ পাকিয়া ঝন্‌ঝনে হইয়াছে,—উহাকে কি আর এখন নোয়ান যায়?"

পতিত, কালাচাঁদ সম্বন্ধে নির্ভরসা হইল বটে, কিন্তু আশা ছাড়িতে পারিল না। আশা,—বড়ই দুষ্টা,—মায়াবিনী। এই, এবেলা ছাড়িয়া দেয়, আবার ওবেলা গ্রহণ করে। পতিত ভাবে, "এত লোকের বড় বড় রোগ আরাম হইল,—কালাচাঁদের

কি এ রোগ আরাম হইবে না? এত ভাল ভাল ঔষধ দিলাম, কিন্তু কিছুতেই ত ফল হইল না। দোষটা ঔষধের কি?”

পতিত এইরূপ ভাবে, আর থাকে। কালাচাঁদও অন্যরূপ ভাবেন, আর পতিতের গৃহে অবস্থিতি করেন।

কালাচাঁদ কারাগার হইতে যে টাকাগুলি আনিযাছিলেন, তাহা ক্রমশ ফুরাইতে লাগিল। আয় নাই, কেবল ব্যয়;—সঞ্চিত অর্থ কতক্ষণ টিকে? এক কলসী-জল,—গড়াইতে-গড়াইতে কতক্ষণ থাকে? আমদানি নাই কেবল রপ্তানি,—রাজার ভাণ্ডার টুটিয়া যায়;—কালাচাঁদের ভাণ্ডার ত কোন্ ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র!

টাকা ফুরায় আর কালাচাঁদ ভাবেন—‘কুচ পরোয়া নেহি’; আমি এখন সৎ, সাধু, নিষ্পাপ,—সুতবাং আমার কষ্ট কিছুতেই ঘটিবে না। ভগবান নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিকে কষ্ট দিবেন কেন? আমার নিজের ভাবনা আমি

কিছুই ভাবি না; আমার একটা পেট পূর্ণ করিতে কতক্ষণ? একবেলা মুটেগিরি করিয়া আসিলেও আমার উদর পরিপূর্ণ হইবে। এর জন্য আর চিন্তা কি?

আচ্ছা, কোন কাজ-কর্ম্ম করিলে ক্ষতি কি? অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে, সর্ব্ব-দিকেই সুবিধা। হাতে অর্থ থাকিলে দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হইব।

কৃপণ ব্যক্তি 'যখের' ধন আগুলিয়া রাখে; নিজেও খায় না, অপরকেও খাইতে দেয় না। কত কাঙ্গালী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়; তবু কৃপণ ব্যক্তি তাহাকে একটী পয়সাও দেয় না। দেশের সমস্ত টাকা যদি প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে সমভাগে থাকে, তাহা হইলে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। কোন ব্যক্তি টাকার উচ্চ পাঁজা সাজাইয়া, তাহার উপর রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া আছেন; কেহ বা ভূতলে, কণ্টকাকীর্ণ গর্ত্তের নীচে দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না! কেন এমন হয়?

ভগবান কি একচক্ষু, দয়ামায়া-হীন? কাহারও খাইয়া খাইয়া পেট ফুলিয়া উঠিয়া, ফাটিয়া যাইতেছে; কাহারও না-খাইতে পাইয়া, আঁত মরিয়া গিয়া, পেটের চাম্‌ড়া পিঠে ঠেকিতেছে! ঈশ্বর এমন বিসদৃশ নিয়ম কেন করিলেন?

যাই-হউক, আমার অর্থ হইলে, দুঃখী দরিদ্রকে দান করিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিব। একটা চাকুরীর চেষ্টা দেখাই ভাল। না,—ব্যবসা করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট! ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে মূলধন কোথা পাইব? আমার ত সঙ্গতি কিছুই নাই,—কেমন করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিব? প্রথম চাকুরীই করিব। কিছু মূলধন জমিলে শেষে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিব।

কিন্তু চাকুরির জন্য যাই কোথা? কাকে গিয়া বলি? কেইবা আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া, আমার চাকুরি করিয়া দিবে?

আমার ঠাকুরদাদার হুগলীসহরে প্রবল প্রতাপ। তিনি প্রভূত ধনশালীও বটেন। বহু-ব্যক্তি তাঁহার

কথার বশ। তিনি মনে করিলে, একদিনেই—এক দণ্ডেই আমার একটা চাকুরি করিয়া দিতে পারেন। বিশেষ, তাঁহার অপেক্ষা এ সংসারে আমার আত্মীয় আর কেহই নাই। আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—কেহই নাই;—আপনার বলিতে আছেন কেবল,—ঐ একমাত্র ঠাকুর-দাদা। তাঁহার কাছে যাই, তাঁহার পায়ে ধরি, কাঁদি,—বলি,—'আমি বড় হতভাগ্য। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি না রাখিলে, আর কে স্থান দিবে? আপনিই আমার সব। আপনি ভিন্ন আব আমার কে আছে? আপনার চরণে শবণ লই-তেছি,—আমাকে পায়ে ঠেলিবেন না।' ঠাকুব-দাদাকে একথা বলিতে ত কোন দোষ নাই! কল্য তাহাই গিয়া বলিব।

কিন্তু ঠাকুরদাদা আমায় চরণে স্থান দিবেন কি? শুনিতে পাই, তিনি আমার উপর খড়্গ-হস্ত। শুনিতে পাই, আমার নামে তিনি ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করেন। শুনিতে পাই, আমার

ছায়ায় তিনি লাথী মারেন। শুনিতে পাই, আমাকে নাতী বলিয়া পরিচয় দিতেই তিনি লজ্জিত হন। যদি কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরে, তাহা হইলে বলেন,—'কেলে-ছোঁড়া আমার জ্ঞাতির জ্ঞাতি, তস্য জ্ঞাতি,—গ্রামসম্পর্কে নাতী হইলেও হইতে পারে।' বিধাতার কেন যে এই বিড়ম্বনা, তাহা'ত বুঝিতে পারি না। ইহজন্মে আমি তাঁহার কখন মন্দ করি নাই, মন্দ ভাবিও নাই,—তথাচ কেন-যে তিনি আমার উপর এরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন,—ইহার গূঢ়রহস্য ভেদ করিতে কিছুতেই সক্ষম নহি।

যখন বর্দ্ধমানে আমি দায়রা-সোপরদ্দ হই, তখন শুনিয়াছিলাম, ঠাকুরদাদা আমাকে জেলে পূরিবার জন্য, আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি,—আমি এ-কথা তখন তিলার্দ্ধও বিশ্বাস করি নাই। কোথা হুগলী, আর কোথা বর্দ্ধমান,—মধ্যে বিশ ক্রোশ পথ ব্যবধান। এতদূরে, হুগলীতে অবস্থিতি করিয়া,

ঠাকুরদাদা আমাকে যে নষ্ট কবিবাব অভিপ্রায়ে বর্দ্ধমানে লোক পাঠাইয়া ষড়্‌যন্ত্র করিবেন,—এ কথা কাহার মনে স্থান পায়? বিশেষ, আমি ঠাকুরদাদাব আপনার-লোক—স্নেহের পাত্র,—আর, কোন কালে তাঁহার সহিত বিবাদ নাই, বচসা নাই,—কেনই বা তিনি আমার অনিষ্ট অনুসন্ধানের চেষ্টা কবিবেন? কাজেই তখন আমি ঠাকুরদাদার তদ্বিবেব কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই; হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন যেমন শুনিতেছি, বুঝিতেছি,—তাহাতে আমাব স্থির-বিশ্বাস,—ঠাকুরদাদা বর্দ্ধমানে আমাব বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তদ্বির করিয়াছিলেন। তাই ভাবি,—কেন এমন হইল?

আচ্ছা, ঠাকুরদাদা প্রকৃতই আমার উপর বিরূপ কি না,—তাহা'ত একবার স্বয়ং সশরীবে বুঝিয়া আসা ভাল। কেবল শুনা-কথায় ঠাকুরদাদার উপর এরূপ অভিযোগ আনা ত উচিত নহে। একবার তাঁহার কাছে যাই না কেন? যাইয়া স্বচক্ষে একবার দেখা ভাল। তিনি ত বাঘ নন

যে, আমাকে দেখিলেই অমনি গিলিয়া ফেলিবেন। আর, আমাকে গ্রাস করেই বা কে?

যাওয়া উচিত। যাইব। কল্যই যাইব। কাল-বিলম্বে ফল নাই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কালাচাঁদ বন্ধু-পতিত-পাবনকে কহিলেন, "বন্ধু! আমি এক জায়গায় বেড়াতে যাচ্চি। তুমি যাবে কি?"

পতিত। কোথা?

কালাচাঁদ। ঠাকুরদাদার বাসায়।

পতিত পূর্ব্বমুখ হইল। ঊর্দ্ধপানে চাহিল। চাহিয়া, যুক্তকরে, প্রণাম করিতে লাগিল। বলিল,—"দণ্ডবৎ! দণ্ডবৎ! ঈস্! সকালে উঠেই ঐ নাম। আজ অন্ন হবে না।"

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) কেন? কেন?—তাঁর কি এতই অপরাধ?

পতিত। বন্ধু! তুমি জান না। মাছ সম্বরবে, তা তেল দেবে না। ঠিক্ যেন মড়া-পোড়ার গন্ধ উঠে। আলু-ভাতে খাবে, তা [illegible] না। ঐ

পাকা বুড়ো পিঁপ্‌ড়ের গা-টিপে গুড় বা'র করে ;—ওর কি মুখ দেখ্‌তে আছে ?

কালাচাঁদ। বন্ধু! ঠাকুরদাদার উপর তুমি অত চট্‌লে কেন ?

পতিত। আমিই না হয় চটেচি। তোমারই বা আজ অত ভক্তি উথ্‌লে উঠ্‌লো কেন? নাতীকে বাগে পেলে ঠাকুদ্দা এখনি ঘাড়ের রক্ত চুষে খান।—সে নাতীর আজ আর আদর দেখে বাঁচি না।

কালাচাঁদ। আমি যা বল্‌বো,—বন্ধু তার ঠিক উল্টোটী বল্‌বে। বন্ধুর সঙ্গে কোন পরামর্শ ক'রে,—সুখ হয় না। যাহোক আব কোন কথায় কাজ নেই,—চল, বন্ধু! আমার সঙ্গে ঠাকুদ্দার বাসায় চল।

পতিত। আমি ত যাবোই না; তোমাকেও সে কুস্থানে যেতে দিব না। সে লোকটা খুনে। আমাদিগে দেখ্‌লেই, মেরে-ধরে হাড়-গোড় ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে দিবে। বাপ্‌! সে খানে কি আমি কাঁচা-মাথাটা দিতে যাবো ?

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) সে ভয় তোমার নাই!

আমাকে মারে কে? আমাকে খুন করিতে অন্তত পাঁচ-শ লোক চাই। ঠাকুদ্দার ঘরে পাঁচজন দরোয়ান আছে বৈত নয়! এক-এক কীলে আমি পাঁচজনকে পাঁচ দিকে শুইয়ে রেখে আস্‌বো। তোমাকে সে সব কিছু চিন্তা কর্‌তে হবে না। যদি তেমন তেমন বাধে,—

পতিত। (সভয়ে) না বন্ধু! আমি যাবো না,—আমাকে ক্ষমা কর!

আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল, পতিত ঠাকুরদাদাব গৃহে জুতা খাইয়াছিল। সেই চর্ম্ম-পাদুকা-প্রহার-রূপ-ভীতি পতিতের হৃদয়ে এখনও অষ্ট-প্রহরই উদিত হয়। কাজেই সে, ঠাকুরদাদার নিকট যাইতে একান্ত অসম্মত।

কালাচাঁদ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধু! তা হবে না! তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে! তোমাকেই সেখানে দরকার। আমি একা গেলে যদি হ'তো, তা'হলে এতক্ষণ আমি চলে যেতাম।"

পতিতই ভয়ে কাঁপিয়াই আকুল। কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল “হেঁই বন্ধু! তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যেয়ো না। আমি গেলেই খুন হবো।”

পতিতের একটী গাভী ছিল। পতিত বলিত, গাভীটী সুরভী-জাতীয়। জাতিতে যাহাই হউক, পতিত প্রাণ-খুলিয়া গরুটীর সেবাযত্ন করিত,—যেখানে যা-কিছু পাইত, গাইকে আনিয়া খাওয়াইত। কোঁচার খুঁট দিয়া গোরুর গা মুছাইয়া দিত। লোকের নিকট প্রকাশ করিত,—“গাভী মা-ভগবতী। যে ঘরে গোরু নাই, সে ঘর শ্মশান। আমি যে এই গাইটীকে এত ভক্তি করি, তাহা দুধের জন্য নহে;—মায়ের সেবার জন্য—পরকালের জন্য।” দুগ্ধের জন্য গো-সেবা না করিলেও, গাভীটী খুব দুধ দিত। খুব ভক্ত হইলেও, পতিত মা-ভগবতীর সেই দুধ বাজারে বেচিত।

পরম ভক্ত পতিতপাবন, শণ কিনিয়া, ঢেরায়

দড়ী কাটিয়া, সম্প্রতি স্বয়ং স্বহস্তে গোরুর জন্য একগাছি দড়া ভাঙ্গিয়াছিল। প্রকৃতই সে দড়াগাছটী গোটা এবং শক্ত। গত কল্য, সে দড়া পতিত, বন্ধুবান্ধবগণকে দেখায়;—বলে;—"ইহাতে পাকের এরূপ কৌশল আছে যে, ইহা একবারে বজ্র হইয়াছে। দশটা হাতী একত্র হইয়া টানিলেও, এ দড়া ছিঁড়িবে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ইহা ছিঁড়িতে পার, তাহা হইলে আমি তাহাকে পাঁচ টাকা দিব।"

একে একে সকল বন্ধু দড়া পরীক্ষা করিল। দড়া ছিঁড়িতে না পারিয়া সকলেই পতিতের নির্ম্মাণ-কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিল। শেষে পতিত, কালাচাঁদকে বলিল,—"বন্ধু! তুমিত লোহার শিকল ছিঁড়িয়া থাক,—এই দড়াগাছটী একবার ছেঁড় দেখি—দেখি, কেমন তোমার শক্তি! এ দড়া স্বয়ং পতিতের বুড়ো-আঙ্গুলের টীপুনি দিয়ে ভাঙ্গা,—কার সাধ্য ছেঁড়ে?"

কালাচাঁদ হাসিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,

"পতিত অর্দ্ধপাগল। ও মনে করে, কেবল গায়ের জোরেই শিকল ছেঁড়া যায়, দড়া ছেঁড়া যায়, কবাট ভাঙ্গা যায়, দ্বিতল গৃহ হইতে লাফাইয়া পড়া যায়। কিন্তু তাহাত নয়। অবশ্য গায়ের জোর কিছু চাই বৈকি?—কিন্তু গায়ের জোর ছাড়া আর একটা জোর আছে, যাহার দ্বারা সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। সেই জোরের নাম কৌশল-বোধ, হিসাব-জ্ঞান, তুকতাক, এবং অভ্যাস। আমি মনে করিলে, অনায়াসেই এ দড়া ছিঁড়িতে পারি। কিন্তু এত লোকের সাক্ষাতে সে বাহাদুরি দেখাইয়া ফল কি? লাভের মধ্যে, পতিতের এত সাধের দড়াগাছটী নষ্ট হইবে।"

এইরূপ ভাবিয়া কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন,—"না, বন্ধু!—এ দড়া কি আমি ছিঁড়ুতে পারি?—আমার মত এক-শ লোক এলেও পারুবে না।"

পতিত। তবে তোমার কিসের শক্তি?

গতকল্য এইরূপই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। অদ্য

যখন পতিত, ঠাকুরদাদার বাসায় যাইতে ভীত হইল, তখন কালাচাঁদ নিজ পরাক্রম দেখাইয়া পতিতের সাহস বৃদ্ধির জন্য, দোয়ার হইতে সেই দড়াগাছটী লইয়া, এক হেঁচ্‌কাটানে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পতিত অবাক্। এত পরিশ্রম-লব্ধ, প্রাণসম দড়াগাছ্‌টীকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া, সত্যসত্যই পতিতের চক্ষে জল আসিল। একে, সে, ভয়ে অস্থির, তার উপর দড়ার শোক। শোক বলিয়া শোক!—মহাশোক! দেহ হইতে দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হইলেও, পতিতের এত শোক হইত না।

সুখের মধ্যে এই যে, শোক-সামগ্রীটী অধিকক্ষণ পূর্ণমাত্রায় তিষ্ঠে না। একটু সুস্থ হইয়া পতিত ভাবিল, "কালাচাঁদ ভীম, না, ভগদত্ত? এমন আশ্চর্য্য শক্তি ত আমি কোথাও দেখি নাই।"

কালাচাঁদ দড়া ছিঁড়িয়া হাসি হাসি মুখে বলিলেন, "বন্ধু! দেখ্‌লে ত আমার গায়ে জোর কত! এখনও কি আমার সঙ্গে ঠাকুদ্দার বাসায়

যেতে তোমার ভয় হয়? যদি ভয় হয়, তবে খুলে বল;—আরও একটা শক্তির পরিচয় না-হয় দেখাই!"

পতিত কিংকর্ত্তব্যজ্ঞানহীন। হৃদয়-কমল আন্দোলিত। সে, এইভাবে ভাবিতে লাগিল,—"অদ্যকার কালরাত্রি কি আমারই জন্য পোহাইয়াছিল? যদি আজিকার দিন বাঁচি, তাহা হইলে পতিত বোধ হয় এক-শ কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে। বন্ধুকে যদি বলি, আমার এখনও ভয় আছে, তাহা হইলে বন্ধু হয় ত এখনি আর একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড করিয়া ফেলিবেন। হয় ত বাই-ঠুকিয়া আমার বড় ঘরের দেওয়ালটা ভঙ্গিয়া দিবেন। হয় ত আমার এই দো-ফলা আমগাছটা সজোরে উপ্‌ড়াইয়া ফেলিবেন। হয় ত জোর দেখাইবার জন্য, আমাকেই ঊর্দ্ধে এক-শ হাত উচ্চে ছুড়িয়া ফেলিয়া, লুফিয়া লইবেন। আমাকে রামে মেলেও মেরেচে, রাবণে মেলেও মেরেচে। বন্ধু এখন যা বলেন, সেই কথাই শোনা ভাল।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে পতিত বলিল,—“বন্ধু। তোমার সঙ্গে তবে আমি যাবো;—কিন্তু দেখো বন্ধু! শেষে যেন প্রাণে মরি না।”

কালাচাঁদ কহিলেন,—“ভয় নাই।”

পতিতের সঙ্গ ব্যতীত কালাচাঁদ যে, ঠাকুরদাদার গৃহে যাইতে অক্ষম, তাহা নহে! পতিতকে সঙ্গে লইবার বিশেষ যে, কোন কারণ ছিল, তাহাও নহে। তবে কালাচাঁদ এত জেদ ধরিলেন কেন?—কেবল মজা করা ভিন্ন অন্য কোনও কারণ ত দেখি না। পতিত ভয়ে ভীত হইয়া বলিল, ‘যাইব না,’—কালাচাঁদের মজা হইল। ভীত ব্যক্তি দেখিলে, কালাচাঁদের আনন্দ হইত। পতিত ভীত হইয়াছে; অতএব পতিতকে সেই ভয়সঙ্কুল স্থানে লইয়া যাইতে হইবে;—ইহাই হইল,—কালাচাঁদের রঙ্গরস, রসিকতা, রস-চাতুরি।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ, পতিতের সমভিব্যাহারে, ঠাকুরদাদার বাসায় গেলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তথায় আদৌ আদর-অভ্যর্থনা পাইলেন না। ঠাকুরদাদা, নাতীকে দেখিয়া মহা বিরক্ত হন; মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া থাকেন; যে দু-একটী কথা কন, তাহাতে বিরক্তি এবং ব্যঙ্গের ভাবই প্রকাশিত হয়। কালাচাঁদ শুষ্কমুখে প্রত্যাগত হইলেন। পতিত বলিল, "বন্ধু! দেখ্‌লে,—আমি যা বলেছিনু, তাই ঠিক্ হ'লো। আমি মর্‌বো কবে, তাই জানি না,—নহিলে, পতিত জানেনা কি?"

কালাচাঁদ। তুমি যা বলেছিলে, ঠিক্ তার উল্টা হলো।

পতিত। উল্টা হবে কেন?—ঠিক্‌ই হয়েচে।

কালাচাঁদ। তুমি বলেছিলে, ঠাকুদ্দা দুজনকেই খুন ক'রে ফেল্‌বেন; না হয়, মেরে পিঠ ছিঁড়ে দিবেন।

পতিত। খুন কে কাকে করে? এ কোম্পানীর

মুলুকে খুন আর কাকেও কত্তে হয় না! কথার কথা একবার বলেছিলেম ব'লেই কি, ঠাকুদ্দা অমনি তুইটা জেয়ান্ত মানুষকে খুন কত্তে পারেন! বন্ধু! তুমি কি তামাসা বুঝ না?

কালাচাঁদ। তা, আর কৈ বুঝিতে পারিলাম!

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তুইবন্ধুতে বাসায় প্রত্যাগত হইলেন। সন্ধ্যার পর আবার পতিতকে সঙ্গে লইয়া, কালাচাঁদ অন্যান্য আত্মীয়, গ্রামস্থ ব্যক্তির বাসায় গেলেন। তিনি যেখানে যান, সেইখানেই উপেক্ষিত এবং উপহসিত হন। কোথাও কালাচাঁদ স্নেহ, ভালবাসা,—অধিক কি, মৌখিক মিষ্ট কথা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার ভগ্নমন আরও ভাঙ্গিল।

কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, আমি এখন সচ্চরিত্র, সাধু, সত্যবাদী হইয়াছি,—তথাচ লোকে আমাকে এত ঘৃণা করে কেন? এরূপ উপহাসইবা করে কেন? লোকগুলা বড়ই বদ্। লোকগুলা চোর, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক।

লোকগুলা মন্দ হয়, হউক ;—আমি কিন্তু সৎপথ কখন ছাড়িব না। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, আমাকে সৎপথাবলম্বী দেখিলে, অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। ভগবানের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে, অনলে, জলে, শৈলে, রণে, বনে, ভবনে,—কোথাও আমি কষ্টে বা সঙ্কটে পতিত হইব না। আমি মানুষের ভালবাসা চাই না। ভগবানই আমার ভরসা। ভগবান আমাকে ভালবাসুন। হে ভগবন্! আমি তোমার ক্ষুদ্র দাস ;—চরণাশ্রিত, সেবক। তুমি অসীম, অনন্ত, অক্ষয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার উদরে অধিষ্ঠিত। তুমি স্নেহময়ী যশোদাকে, লীলাচ্ছলে, তোমার মুখাভ্যন্তরে সমুদায় সংসার দেখাইয়াছিলে। তুমি ভক্তের অধীন, তুমি ভক্তের বৎসল। প্রাণ-সঙ্কটে তুমি ধ্রুব-প্রহলাদকে রক্ষা করিয়াছ। হে শ্রীমধুসূদন! কুরুসভায়, তুমিই দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছ। হে দীনবন্ধু! সুধন্বাকে তপ্ততৈল হইতে রক্ষার তুমিই কারণ। হে প্রভু! আমার বাপ নাই, তুমিই আমার

পিতা; আমার মা নাই, তুমিই আমার জননী; আমার বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই, তুমিই আমার সুহৃদ্! প্রভু! তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা, যেন মন্দকর্ম্ম করিতে আর মন না যায়। আমি পাপী, দুরাচার, অকৃতী, অধম। তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে, আমার আর উপায় নাই। প্রভু! আমার কেবল এই মিনতি,—তোমার চরণযুগলে স্থান দিও।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কালাচাঁদের হৃদয় কতকটা সুস্থ হইল! মন ঠাণ্ডা হইলে, তিনি গো-সেবায় তৎপর, পতিতপাবনকে বলিলেন, "বন্ধু! তুমি আজ কি খাবে বল? লুচি বল, খিচুড়ি বল, সরুচাকলি বল,—এ তিনের মধ্যে, তুমি যা'বল, তাই খাওয়াইব।"

বন্ধু তখন খুব কুঁচি কুঁচি করিয়া গোরুর জাব কাটিতেছিল। আহারের নামে অর্দ্ধ-কর্ত্তিত খড়-আটিটী ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। ঝটিতি কালাচাঁদের নিকট আসিয়া বলিল,—"বন্ধু। তুমি আমার খাবার

কথা ব'ল্‌চো বটে,—কিন্তু আমার মুখে কোন জিনিস্ আর রোচে না। ভাত খাওয়াত উঠে গেছে। এই, আধ্‌পো চেলের অন্ন রাঁধি,—তারই বার-আনা-ভাগ পাতে পড়ে থাকে। তবে একটু দুধ খেয়ে থাকি। দুধই হ'লো আমার এখন জীবন। তা, আমাকে লুচি, খিচুড়ি খাবার কথা বলা বৃথা। তবে তুমি বল্লে'ত কথা এড়াতে পারি না—"

কালাচাঁদ। ওসব কথা যাক্। এখন বল,—ঐ তিনটা জিনিসের মধ্যে কোন্‌টা খাবে?

পতিত এইবার বড় বিপদে পড়িল। সরুচাক্‌লিটে তাহার বড়ই প্রিয়তম। সরুচাক্‌লির নামে তাহার রসনা লহ-লহ করে। কিন্তু এদিকে লুচি, ওদিকে খিড়িচু। এ দুইটার মধ্যে কোনটাইত মন্দ জিনিস নহে। লুচি হইলে, দই, তরকারি, সন্দেস থাকিবে। কিন্তু খিচুড়ি হইলে মাছ ভাজা, মাছের কালিয়ে থাকিতে পারে। দই ত হইবেই। খিচুড়িতে দই না খাইলে গরম হয়। আর, শেষে মিষ্টিমুখ করিবার জন্য অবশ্যই সন্দেস থাকা চাই। তবে

লুচি-খিচুড়ির মধ্যে খিচুড়িটেই ভাল। কিন্তু লুচি-সামগ্রীটা সর্ব্ব-মনোহর। আচ্ছা করিয়া ময়ান দিয়া, একটু খর-খর করিয়া ভাজিয়া, অল্প গরম গরম থাকিতে থাকিতে খাইতে পাইলে,—খিচুড়ি কোথায় লাগে? কিন্তু আমি যে, সরুচাকলিটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি—তাহার কি? খাঁটি দুধের পরমান্নের সহিত সরুচাকলি মাখিয়া খাইবার সময় যে কিরূপ আরাম, সোয়াস্তি হয়—তাহা আর বলিবার নহে। আ—আঃ—আহা,—গরাসে গরাসে যেন চাঁদ নিঙড়িয়া সুধা খাইতেছি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সরুচাকলি খাইলে বড়-মাছের মুড়ার কালিয়ে পাইব না। বন্ধু বলিবে,—সরুচাকলির সঙ্গে আবার মাছ খাওয়া কি? সুতরাং আমি বলি কি? কোন্ জিনিস্‌টা খাই?—এ-যে দেখিতেছি,—আমার পক্ষে সবই সমান হইয়া দাঁড়াইল!

কালাচাঁদ। বন্ধু! এত ভাব্‌চো কি? বল না কি খাবে?

পণ্ডিত মাথা চুলকাইতে লাগিল; কিছুই ঠিক

করিতে পারিল না। ভাবিল, "অদ্যকার বড়ই গুরুতর সমস্যা। বিশেষ না ভাবিয়া, না বুঝিয়া, হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইবে না। রাত্রে শুইয়া-শুইয়া, সমস্তক্ষণ জাগিয়া জাগিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, একটা যা-হয়, ঠিক করিয়া, বন্ধুকে কল্যপ্রাতে ইহার উত্তর দিব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, একটু বুদ্ধিব্যয়পূর্ব্বক পতিত বলিল,—"বন্ধু! ক্ষুধাটা মন্দা আছে;—আজ না হয় থাক্—কাল খাওয়ান হবে।"

কালাচাঁদ। তাও কি কখন হয়? পূজারি-ঠাকুরকে বলে এসেচি,—তিনি এসে রাঁধ্বেন।

পতিত জানে,—কালাচাঁদ যাহা ধরে, তাহা সহজে ছাড়ে না। নিরুপায় হইয়া বলিল, "আচ্ছা, বন্ধু! সরুচাকলি হ'লেত পায়েস নিশ্চয়ই হচ্চে—

কালাচাঁদ। তা, অবশ্য হবে।

পতিত। আমি সে কথা বল্‌চি না—পায়েস ত হবেই! আমি বল্‌চি কি,—বড় মাছের কালিয়ে হবে না কি?

কালাচাঁদ। আচ্ছা,—তুমি বল ত,—তাও হবে।

পতিত। আমার কোন বলাবলি নেই,—তোমার ইচ্ছা হয়—হোক; না ইচ্ছা হয়..........., কি জান্‌লে, বন্ধু! বড় মাছের মুড়া জিনিসটা ভাল।

কালাচাঁদ। আচ্ছা, মাছের কালিয়াও করা যাবে।

পতিত। বন্ধু! একসের ময়দায় আদসের ঘিয়ের ময়ান দিয়ে, তুমি কখন কি লুচি খেয়েছ?

কালাচাঁদ। না।

পতিত। আমি খেয়েচি। তোমার ঠাকুদ্দার কাছ থেকে আইবুড়ো-ভাতের তত্ত্ব নিয়ে আমি একবার রাজবাড়ীতে যাই। রাজা অনেকদিন মরে গেছেন,—রাণীই কর্ত্তা। রাণী আমাকে একটা সিধে দিলেন,—আধমণ চাল, দশসের ময়দা, পাঁচসের ঘি, পাঁচ[illegible]র একটা মাছ,—আরও যে কত-কি সিধেতে [illegible]া, তা আর কি বল্‌বো। সিধে দেখেই ত আমা[illegible] আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। ভাব্‌লাম,—

এত সিধে নিয়েইবা আমি কি কর্‌বো? তখন মনে হ'লো, একসের ময়দায় আধসের ঘিয়ের ময়ান দিয়ে লুচি তৈয়ের করা যা'ক্!—দেখি-না কেমন হয়! তাহাই করিলাম। বন্ধু! লুচি যা তৈয়ের হলো, তা আর তোমাকে কি বল্‌বো? মুখে দি,—আর মিলিয়ে যায়! সে লুচি ঠোঁটের কাছে ঠেকাই,—আর নাই!—ঠোঁটের কাছে ঠেকাই,—আর নাই! বুকের কল্‌জেটা-সুদ্ধ একেবারে সাফ হয়ে গেল। সে রকম লুচি সেই একবার কোন্‌-কালে খেয়েছিলেম,—আর খাই নাই। বন্ধু! আমার ইচ্ছে যে, তোমাকে একদিন সে-রকম লুচি খাওয়াই। যদি বল, তবে আজই, সরুচাক্‌লি তৈয়েরির সময় পূজারি-ঠাকুরকে দিয়ে, সেরখানেক ময়দার সে-রকম লুচি ভাজাই।

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) একসের ময়দায় আধসের ঘি ময়ান দিলে যে, লুচি গুঁড়ো হয়ে যাবে—খোলায় ভাজা হবে কেন? ঘিটেও নষ্ট হবে, লুচিও কেউ খেতে পাবে না।

পতিত। আমি বল্‌চি, হবে! যদি না হয়, তবে তার দায়ী আমি আছি।

কালাচাঁদ। তাই হোক,—আমার আপত্তি নাই।

পতিত। বন্ধু! আমি নিজের খাবার জন্য বলি নাই;—তোমাকে খাওয়াব, এই আমার সাধ। তুমি খেলেই আমার তৃপ্তি।

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) তবে আর খিচুড়ীটে বাকী থাকে কেন?—খিচুড়ীও হোক।

পতিত। (হাঁ—হাঁ রবে) তা হবে না, তা হবে না,—এত জিনিস খাবে কে? পয়সা নষ্ট করা তোমার একটা রোগ বৈত নয়। (একটু থামিয়া) তবে বন্ধু! তোমার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা'হলে ভুনিখিচুড়ীই না-হয় হোক! তোমার কোন কাজে আমি বাধা দিতে পারি না।

সে রাত্রি সরুচাক্‌লি, লুচি, খিচুড়ি তিন রকমই হইল। পতিতের অন্তরের আশা পূর্ণ হইল। এমনটা শুনা গিয়াছে, আহারের পর তিনদিন

পতিত কোন কাজকর্ম্মে বাহির হইতে পারে নাই। পতিত বলিত,—"পায়ে গেঁটে-বাত হইয়াছে।" বন্ধু-বান্ধবগণ বলিত, "আহারের রাত্রি—অর্থাৎ ভোর বেলা—হইতে পতিতের এমন একটী ব্যারাম হইয়াছে, যাহার নাম করিলেই পতিত রাগিয়া উঠে।"

পতিতের নামে কালাচাঁদ এইরূপ আহারাদির উদ্যোগ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য অন্য-রূপ ছিল। প্রতিবেশীগণের মধ্যে যাহারা দীনদরিদ্র, যাহারা উদরপূর্ণ করিয়া কখন খাইতে পায় না, কালাচাঁদ তাহাদিগকে ধরিয়া-ধরিয়া আনিয়া ভোজন করাইতেন। গৃহস্থ-ঘরের যে সকল দুঃখিনী রমণী, কালাচাঁদের বাসায় আসিয়া খাইতে সম্মত হইত না, পূজারি-ঠাকুরের দ্বারা কালাচাঁদ, তাহাদের লুচি সন্দেস পাঠাইয়া দিতেন। বন্ধু পতিতপাবন, এ সব কার্য্যে বড়ই প্রতিবাদ করিত; বলিত,—"তোমার পয়সা রাখ্‌বার ত যায়গা নেই,—খাওয়াচ্চ কি না ভূতগুলাকে, আর পেত্‌নীগুলাকে।" কালাচাঁদ

বলিত,—"বন্ধু! এরা কখন লুচি সন্দেস খেতে পায় না—এক দিন খাগ্।"

বলা বাহুল্য, এরূপ দরিদ্র-ভোজনে কালাচাঁদের কোনও আড়ম্বর ছিল না। এদিকে পূজারি-ঠাকুর রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিলেন, ওদিকে কালাচাঁদ সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। গয়ারামের বাটী গিয়া দেখিলেন, চাঁদের আলোকে গয়ারাম বিচালির বড় পাকাইতেছে। অমনি আস্তে-আস্তে গিয়া, পশ্চাৎ হইতে গয়ারামের পিঠে ছুই কীল। গয়ারাম ভয়ে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, পশ্চাতে কালাচাঁদ। সে তখন আর কোন কথা কহিল না। নমস্কার করিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইল।

কালাচাঁদ কহিলেন, "তুই এখনও বসে আছিস্—যা,—আমার ওখানে যা। বুঝেচিস্,—ছেলেপিলেকে নিয়ে যাস্।"

গয়ারাম যোড়হাতে প্রণাম করিয়া বলিল,—"যাচ্চি।"

বৃদ্ধ হলধর তাঁতির চিরদিনই অন্নকষ্ট। কালাচাঁদ

গিয়া, তাহার চোখ টিপিয়া ধরিলেন। বুড়া ভয়ে "আঁউ মাঁউ" করিয়া উঠিল।

কালাচাঁদ। আমি কে, বল,—তবে চোখ্ খুলে দিচ্চি।

হলধর। আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না,—আপনি যে হও,—পায়ে পড়ি, চোখটী খুলে দাও,—হাঁপিয়ে মরে গেনু—

কালাচাঁদ। সন্দেস্ খাবি? ক গণ্ডা খাবি বল্?

হলধর। বুঝেচি—বুঝেচি—তুমি ঠাকুদ্দা—

কালাচাঁদ তখন হাসিয়া চোখ খুলিয়া দিলেন। বলিলেন,—এখনি যা—দৌড়ে যা—আমার বাসায় আজ ভারি মজা।

কালাচাঁদের নিমন্ত্রণ-প্রথা এইরূপই ছিল।

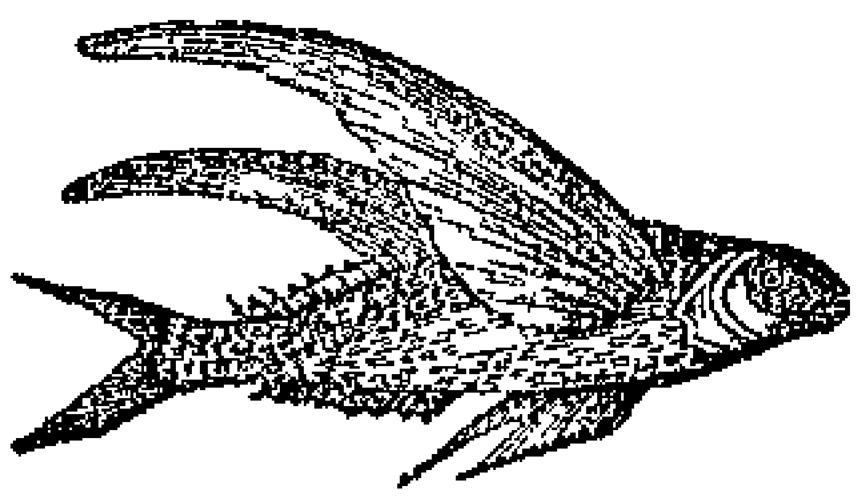

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ একদিন তাঁহার তহবিল গণিলেন। দেখিলেন, আর ৫১৲ একান্নটী মাত্র টাকা মজুদ আছে। ভাবিলেন,—"ফুবাইয়া ত আসিল। ৫১৲ টাকায় আর কদিন চলিবে? হদ্দ—বড় জোর এক মাস। তার পর কি? অর্থ কোথা পাই? খাই কি?—খাওযাই কি?

চাক্‌রি!—তা, যার কাছে যাই, সে-ই আমাকে দেখিয়া উপহাস করে। যে ব্যক্তি উপহাসের পাত্র, সে, চাকুরির প্রস্তাব করিবে কেমন করিয়া? চাকুরিব জন্য ত পাঁচ সাত স্থানে গমন করিলাম,—কিন্তু সর্ব্বস্থানেই যে, অবমানিত হইলাম।

পুনরায় তাঁহাদের নিকট যাই-না কেন? তোষামোদ করিয়া বলি,—আমাকে একটী চাকুরি দাও। তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া পীড়াপীড়ি করি-না কেন?

পায়ে ধরিতে কোন ক্ষতি নাই,—কিন্তু ধরি কার্? পায়ে ধরিবার উপযুক্ত পাত্র কৈ? যে কয়জন লোকের নিকট চাকরীর উমেদারীতে গিয়াছিলাম,—তাঁহাদের সকলেই ভাগ্যবান্, ক্ষমতাবান্, অর্থবান্ বটেন,—কিন্তু কেহই ত সৎস্বভাব-সম্পন্ন নহেন। মাথামুণ্ড কি আর বলিব,—সকল বেটাই চোর। ইহঁাদের মধ্যে কেহ হইলেন, লম্পটকুল-চূড়ামণি; কেহ হইলেন, জালিয়াৎ-কুলতিলক; কেহ হইলেন, দস্যুবংশাবতংস; কেহবা সর্ব্বগুণ-ধর;—তিনি হইলেন, লম্পটকুল-চূড়ামণি+জালিয়াৎ-কুলতিলক+দস্যুবংশাবতংস। এই সমস্ত পাপী পাষণ্ড ব্যক্তির সেবা করিতে আমি কিছুতেই সক্ষম হইব না। এক পয়সা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারি, তাও স্বীকার,—খাইতে না পাই, তাও স্বীকার,—ভিক্ষা করিতে হয়, তাও স্বীকার,—তথাচ আমি মূর্ত্তিমান্ মল-মূত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইব না।

আমি এখন সাধু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়,—এই

কয়মাস আমার চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা তিলমাত্রও স্পর্শ করে নাই,—আমি খাইতে-মাখিতে পাইব না; আর, এই ঠক-চেঁটা, লম্পট-শঠ লোকগুলা চিরদিনই পরমভোগে পরিতৃপ্ত হইতে থাকিবে,—ইহা কি কখন সম্ভবপর কথা? মাথার উপর ভগবান আছেন,—তিনি কি এসব দেখিতে পাইতে-ছেন না?

অবশ্যই ভগবান ইহার বিচার করিবেন। অবশ্যই আমি খাইতে পাইব।”

কালাচাঁদ আরও ভাবিতে লাগিলেন,—“এখন মোট মজুদ ৫১৲ টাকা। এইটীই এখন জীবন। এইটী ফুরাইলেই, ভগবান ভরসা।

একান্ন টাকায় একমাসের অধিক চলিবে না। ত্রিশদিন পরেই কি আমাকে “হা অন্ন! হা অন্ন”—বলিয়া, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে হইবে? আচ্ছা, একটু কৃপণ হইনা কেন? অন্যান্য খরচ সমস্তই একেবারে বন্দ করিয়া, কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিনা কেন?

তাহাতে আর কত খরচ লাগিবে? মাসিক চারি টাকা হইলেই ভাসিয়া যাইবে। এরূপ করিলে, এক বৎসরেরও অধিককাল নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ? এক বৎসর পরে ত আবার ঠিক সেই দশা!—সেই ভিখারীর ভাব—সেই ঝুলি—সেই হা-অন্ন—হা-অন্ন!

যদি অন্নের জন্য প্রকৃতই আমাকে ভিক্ষার ঝুলি বহন করিতে হয়, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? শুভস্য শীঘ্রং। একমাসের স্থানে আমি একবৎসর বৃথা অতিবাহিত করিব কেন?

কিন্তু সৎপথে থাকিলে, অর্দ্ধরাত্রে অন্ন হয়,—পণ্ডিতগণের মুখে কতবার এই কথা শুনিয়াছি। আমি কখনই নিরন্ন হইব না,—ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।”

দেখিতে দেখিতে একমাসের মধ্যে কালাচাঁদের ৩৮৲ আটত্রিশ টাকা খরচ হইল। সংক্রান্তির দিন হাতে নগদ ১৩৲ তেরটী টাকা রহিল। সেই দিন কালাচাঁদ কাঙ্গালী-ভোজন করাইলেন। মোটাচেলের

ভাত, কড়ায়ের ডাল, কুমড়ার তরকারি, এবং মাছের অম্বল,—বন্দোবস্ত হইল। দুইশত কাঙ্গালী বসিয়া খাইল। পূর্ণমাত্রায় আহার করিয়া, পরম-পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, কাঙ্গালীগণ কালাচাঁদের জয় গাহিতে-গাহিতে প্রস্থান করিল। সকলে চলিয়া গেলে, কালাচাঁদ, পতিতকে বলিলেন, "বন্ধু! তুমি একবার উঠানের মধ্যস্থলে দাঁড়াও।"

পতিত। কেন, কেন? কি হয়েচে?

কালাচাঁদ। একবার দাঁড়াওই-না ছাই?—

পতিত দাঁড়াইল।

কালাচাঁদ অমনি এক বকুনা কড়ায়ের ডাল আনিয়া পতিতের মাথায় ঢালিয়া দিল।

পতিত। করো কি, বন্ধু! করো কি?

কালাচাঁদ। বন্ধু! কেমন শোভা হইয়াছে, দেখ দেখি?

পার্ষদগণ উচ্চ-হাসি হাসিল। কালাচাঁদ কিন্তু হাসিলেন না।

পতিত একটু রাগ করিয়া উঠিল। বলিল,—

সন্ধ্যাবেলা আবার নাইতে হবে,—দেখ্‌চি। এমন কাজও করে কি? সর্দ্দি হ'য়ে মারা পড়্‌বো আর কি।

কালাচাঁদ। বন্ধু! রাগ ক'রো না।—আজই শেষ। আর কখন এমন দিন হবে না। আজ এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হ'লো।

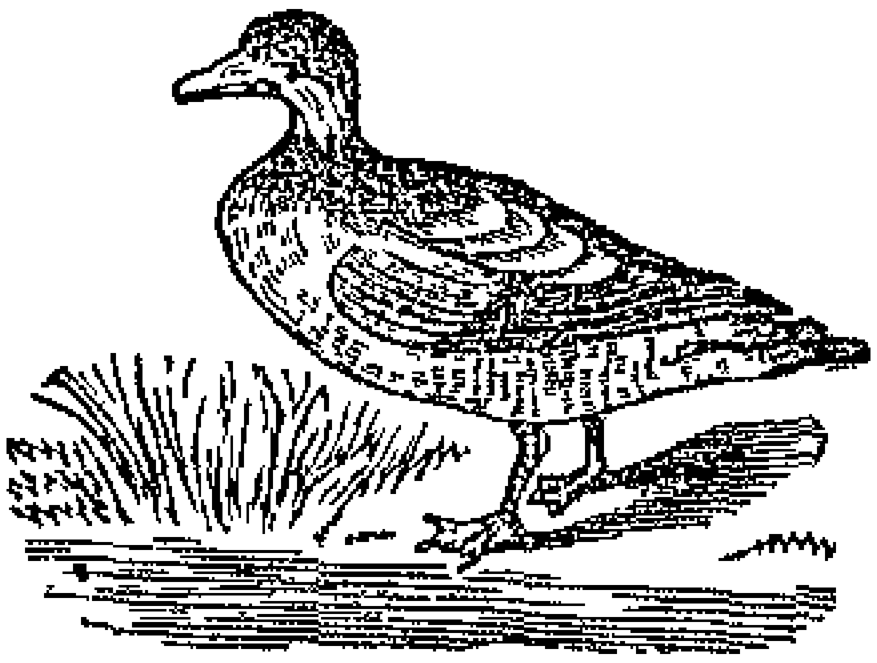

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ যে, অদ্য কপর্দ্দক-শূন্য হইলেন, পতিত তাহা জানিত না। একা পতিত কেন, এ সংবাদ কেহই অবগত ছিলেন না। তখনও লোকের ধারণা ছিল,—কালাচাঁদের হাতে অনেক টাকা আছে।

কালাচাঁদ ঠিক এক ভাবেই আছেন। অর্থযুক্ত-কালে, যে ভাব,—এখন, অর্থহীনকালেও তাঁহার সেই ভাব। কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই।

সংক্রান্তির দিন হইতেই মুদির দোকানে ধার আরম্ভ হয়। ক্রমে ধারেই সংসার চলিতে লাগিল। এক মাস কাল ধারে উঠ্‌না দিয়া, পর মাসের প্রথম দিবসেই মুদি, কালাচাঁদের কাছে তাগাদায় আসিল। কালাচাঁদ কহিলেন,—"আমার হাতে এখন কিছু নাই।"

মুদি। তা, থাক্—তা, আজ থাক্—যে দিন

আপনার সুবিধা হবে, সেই দিনই দিবেন। টাকার জন্য এসে-যাচ্চে কি? আপনি অতি মহাশয়-ব্যক্তি।

মুদি চলিয়া গেল। আবার দশ দিন পরে তাগাদায় আসিল। বলিল,—"আজ কিছু কি অনুগ্গরো ক'রবেন? পাইকেরের কাছ থেকে গুড় কিনেচি,—সব টাকা জোটাতে পারি নি—পাইকেরকে দোকানে বসিয়ে রেখে, আপনার কাছে এসেচি।

কালাচাঁদ। টাকা কড়ি, বাপু। আমার হাতে কিছুই নাই।

মুদি। কিছু দিন্‌না,—নিদেন পাঁচটা টাকাও দিন্‌না? বাকী টাকা দশ দিন পরে দিলেই হবে। তা, আপনার কাছে ত আমার টাকার ভাবনা নেই।

কালাচাঁদ। ৫৲ টাকা দূরে যাউক, পাঁচটী পয়সা আমার হাতে নাই।

মুদি। তবে আমি টাকার জন্য কবে আস্‌বো?

কালাচাঁদ। তাইবা ঠিক কেমন ক'রে বল্‌বো? তোমাকে আর আস্‌তে হবে না। টাকা হাতে এলেই, তোমাকে আমি পাঠিয়ে দিব—

মুদি। কি জানেন,—আমরা গরীব মানুষ,—পুঁজি-পাটা কম। এতটাকা আপনি যদি ফেলে রাখেন, তবে আমি দোকান চালাই কেমন করে? আমরা নগদ আনি, নগদ বেচি। আপনাদের দোয়ার থেকে দু-পয়সা নিয়ে গুজরান করি। তা, আজ কিছু না-হয় টাকা দিন্‌,—

কালাচাঁদ। বাপু! আজ একটী পয়সা থাকিলেও তোমাকে দিতাম,—

মুদি। আপনি যদি এমন করেন, তবে আর কোথা থেকে উঠ্‌নো যোগাব?

কালাচাঁদ। ইচ্ছা না হয়,—আর যোগাইও-না।

মুদি। আমি তা বল্‌চি না,—আমি আর পাবো কোথা,—তাই বল্‌চি।

কালাচাঁদ। সেই কথাত আমিও বল্‌চি—

মুদি। আমি, মোশাই! পরশু তারিখে

আস্‌বো—কিছু আমাকে যোগাড় ক'রে দিবেন। আমি আপনার উঠ্‌নো বন্দ কর্‌বো না—

কালাচাঁদ। তুমি উঠ্‌নো বন্দই কর। আমি এ কথা রাগ ক'রে বল্‌চি না—

মুদি। আমি যদি উঠ্‌নো বন্দ করি,—তবে আপনাকে ত নগদ চাল-ডাল কিনে আন্‌তে হবে।

কালাচাঁদ। পয়সা না থাক্‌লে, নগদ কিনিব কেমন করিয়া?

মুদি। আপনার সঙ্গে অনেক দিন থেকে লেন্‌-দেন, আলাপ-পরিচয়, তাই আমি ধারে দিতে পার্‌বো। অন্য কেহ ত ধারে দিবে না।

কালাচাঁদ। নাইবা দিলে?

মুদি। তখন ত নগদ পয়সা বা'র্‌ কত্তে হবে!

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) তোমার ত বড় আশ্চর্য্য কথা শুন্‌চি। মোটেই পয়সা না থাক্‌লে, কোথা থেকে নগদ পয়সা বার্‌ করবো?

মুদি। তবে, চাল ডাল কোথা থেকে আস্‌বে—বলুন?

কালাচাঁদ। কোথাও থেকে আস্‌বে না—

মুদি। তার পর!—

কালাচাঁদ। তার পর আবার কি?—

মুদি। খাওয়া-দাওয়া চল্‌বে কোথা থেকে?

কালাচাঁদ। কোথাও থেকে চল্‌বে না। আমি উপ'স করে থাক্‌বো।

মুদি। সে কি কথা?

কালাচাঁদ। আমার কথায় দোষ কি হইল?

মুদি। না খেলে মানুষ বাঁচে কি?

কালাচাঁদ। না,—বাঁচে না।

মুদি। তবে?—

কালাচাঁদ। আমি বাঁচিব না।

মুদি হাসিল।

কালাচাঁদও হাসিলেন।

যাত্রাকালে মুদি বলিল, "পরশু দিন আমি আস্‌চি,—সে দিন কিছু টাকা যোগাড় করে আমাকে দিবেন। সেদিন আর ফির্‌বো না।"

কালাচাঁদ মনে মনে কেবল হাসিলেন; কোন কথা কহিলেন না।

মুদি কালাচাঁদের উঠ্‌না বন্দ করিল না,—পর দিন যথানিয়মে সামগ্রী-পত্র পাঠাইয়া দিল। বরং অন্যদিন অপেক্ষা উত্তম উত্তম সামগ্রী পাঠাইল। অদ্যকার ওজন কম'ত নহে-ই, বরং খব-খর।

পরশ্ব দিন শীঘ্রই আসিল। মুদিও আসিয়া সমুপস্থিত হইল। কালাচাঁদ শুইয়া ছিলেন; মুদীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। হাসি হাসি মুখে মুদীকে বলিলেন,—"এস, এস—ভাল হয়ে ব'সো।"

সমাদর দেখিয়া মুদী ভাবিল,—আজ নগদ টাকা।

কালাচাঁদ মুদিকে আপ্যায়িত করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন,—"আমি যদি আজ টাকা না দি, তা হ'ইলে তুমি কি কর?"

মুদি একটু হাসিল। ভাবিল, "সে দিন কিছু

কড়া তাগাদা হয়েছিল কি না,—তাই বাবু আজ টাকা মজুদ রে'খে,—আমার সঙ্গে তামাসা কচ্চেন।" মুদি প্রকাশ্যে বলিল,—"আপনারা ভদ্দর লোক; আপনারা যদি টাকা দিতে দেরী করেন, তা'হলে, আপনাদিগে কি আর বল্‌বো?—আর, আমি আপনাদের কর্‌বোই বা কি? নিতান্ত চলে না বলেই,—তাগাদায় আস্‌তে হয়।

কালাচাঁদ। কিছুই ব'লবে না!

মুদি। আজ্ঞে, তা কি কিছু বল্‌তে পারি?

কালাচাঁদ। বাপু! আমি একটী পয়সাও দিতে পার্‌বো না। আজও আমার একটী পয়সাও যুটে নাই।

মুদি। (বিস্ময়ে) বলেন কি মোশাই?

কালাচাঁদ। তুমি আর কেন কথা ক'চ্চ বাপু!—তুমি কেন চুপ করে উঠে চলে যাও না?

মুদি। তা'হ'লে যে, মোশাই! আমার সর্ব্বনাশ হবে! দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

কালাচাঁদ। আবার কথা ক'চ্চ! তুমি এই

মাত্র বল্লে যে, টাকা না পেলে, তুমি কোন কথা কবে না। তবে কেন, বাপু! কথা কও?

মুদি। (ক্রোধভরে) সে কি মোশাই?—আপনারা ভদ্দর লোক। আমরা মুরুক্ষু মানুষ। আমরা কি এত কথাব কাটাকাটি বুঝ্‌তে পারি?—আপনি এখন টাকা দিবেন কি না বলুন?—ভদ্দর লোক হ'য়ে, এমন ক'রে টাকা ফাঁকি দিতে আছে কি?

কালাচাঁদ। (মিষ্টস্বরে) বাপু! তুমি কি আমাকে কিছু গাল্ দিতে ইচ্ছা করেচো?—তা, দাও, কিছু বল্‌বো না,—মনের সাধে গাল্ দাও।

মুদি। গাল্ কে দিচ্চে? আমাদের কার্‌বার্ যত ভদ্দর লোকের সঙ্গে। আমরা গালাগালি জানি না—কখন করিও না। সে-যা'হোক—মোশাই! টাকা দিন্। টাকা না পেলে আজ আমি আর ছাড়্‌চি না—

কালাচাঁদ। ছাড়িয়া কাজ কি? আমাকে লইয়া কি করিতে হয়,—কর।

মুদি। আমি আপনার সঙ্গে বাক্‌চাতুরি কত্তে আসি নাই। উঠুন্—উঠুন্—টাকা দিন্।

কালাচাঁদ। যদি উঠিলেই টাকা মিলিত, তাহা হইলে, আমি এতক্ষণ দশহাত ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিতাম।

মুদি। আপনি সোজা কথায় দিবেন কি না, বলুন?

কালাচাঁদ। আমি সোজা কথায়ও দিব না,—বাঁকা কথায়ও দিব না। বাপু! টাকা নাই,—কোথা থেকে দিব? তুমি রাগ করো না। টাকা হলেই পাঠিয়ে দিব।

কালাচাঁদ যত নরম স্থরে, মিষ্টি করিয়া মুদিকে বুঝাইতেছেন,—মুদি তত চড়িয়া-চড়িয়া উঠিতেছে। চড়িয়া-চড়িয়া ক্রমশ অন্তিমে উঠিয়া, মুদি বলিল,—"ভদ্দরলোক ব'লে তোমাকে এতক্ষণ কিছু বলি নাই। তুমি জানো,—আমার নাম হরিহর মুদি? তুমি আজ টাকা না দিলে, গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় কর্‌বো—"

মুদি এত শক্ত কথা বলিলেও, কালাচাঁদের রাগ হইল না। কালাচাঁদ অধমর্ণ,—মুদি উত্তমর্ণ। মুদির এখন যা-খুসি-তাই বলিবার অধিকার আছে। ইহাই কালাচাঁদের ধারণা। এইরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাসে, তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের উদয় হইল না। তিনি ধীরভাবে মুদিকে কহিলেন, "বাপু! আজ তুমি আমার বুকে বসিয়া গলায় গামছা বাঁধিলেও, আমি কিছু বলিব না। কিন্তু গলায় গামছা দিলেই কি টাকা আদায় হইবে? আমাকে কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিলেও, তোমার এক পয়সা আদায় হইবে না। আমার আছে কি?—যদি কিছু পিতল-কাঁসার জিনিসও থাকিত, তাহা হইলে, আজ তোমাকে তাহা দিয়া বিদায় করিতাম। মুদি! তোমাকে প্রকৃতই বলিতেছি, আমার কিছুই নাই। বরং তুমি আমার ঘর খুঁজিয়া দেখ—কিছু আছে কি না? আমি এই এক-বস্ত্র পরিয়া আছি, আমার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। আর একখানি শতধাছিন্ন চাদর আছে। গঙ্গা-স্নানের পর, ঐ চাদরখানি পরিয়া,

আমার কাপড় শুখাইতে দি। একটী জল খাবার লোটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইচ্ছা হয়, তুমি লোটাটী লইয়া যাও। মুদি! আমার ভাত খাইবার থালা-পাথর নাই,—জল খাবার গেলাস-ঘটী নাই, পাতিয়া শুইবার বিছানা পর্য্যন্ত নাই। আছে, এক ছেঁড়া মাতুর, এক পিতলের লোটা, আর এই কাপড় এবং ঐ চাদরখানি। ইহার মধ্যে তুমি কি লইবে বল?

মুদি "থ" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন কালাচাঁদের কি যেন কথা একটা স্মরণ হইল;—এইরূপ ভাব দেখাইয়া, তিনি দ্রুতগতিছন্দে বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"ও হোঃ!—বড় মনে পড়েচে! একখানি তলোয়ার আছে, আমার কাছে। সেই তলোয়ারের নূতন বেলায় দাম ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার কম নহে। ভাল জিনিস। এক চোটে বাঘ বলি দেওয়া যেতে পারে। সেই তলোয়ারখানি পতিত নিয়ে রান্না-ঘরে, রেখে দিয়েচে। একটু ব'স্—ঐ রান্না-ঘরে আছে, শিগ্গির আন্‌চি আমি।

কালাচাঁদ তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া রন্ধনশালায় গেলেন। সেই চক্‌চকে তলোয়ার সবেগে ঘুরাইয়া আসিতে-আসিতে কালাচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "মুদি! বড় সরেস্ তলোয়ার! খুব হাল্‌কা।—ইহা বেচে, তুমি—"

কালাচাঁদকে আর অধিক কথা কহিতে হইল না। কালাচাঁদের সেই ভীষণ কৃষ্ণমূর্ত্তি, তীক্ষ্ণধার তরবারির সেই উজ্জ্বলদ্যুতি—দেখিয়া মুদির প্রাণ উড়িয়া গেল। মুদি ভাবিল,—"কালাচাঁদের গলায় আমি গামছা দিব বলিয়াছি;—কালাচাঁদ, সেই রাগে, আমাকে খুন করিবার জন্য, কৌশলে এখানে বসাইয়া রাখিয়া, ঐ তলোয়ার আনিতেছে।" কালাচাঁদকে তদবস্থায় তলোয়ার ঘুরাইতে দেখিয়া, মুদি "বাপ্!—বাপ্‌রে!—মেরে ফেল্লেরে!"—রবে দৌড়িয়া পলাইল।

সেই তরবারি হস্তে করিয়া কালাচাঁদও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। মুখে উচ্চকণ্ঠে মুদিকে বলিতে লাগিলেন,—"ভয় কি? পালাও কেন?—

এ তলোয়ার বেচিলে, অন্তত তোমার পঁচিশ টাকা নিশ্চয় হবে—”

তখন সে কথা আর কে শুনে? মুদি প্রাণ-ভয়ে “বাপ্ বাপ্” ধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া ভীমবেগে দৌড়িল। কালাচাঁদ মুদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ খানিক গিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

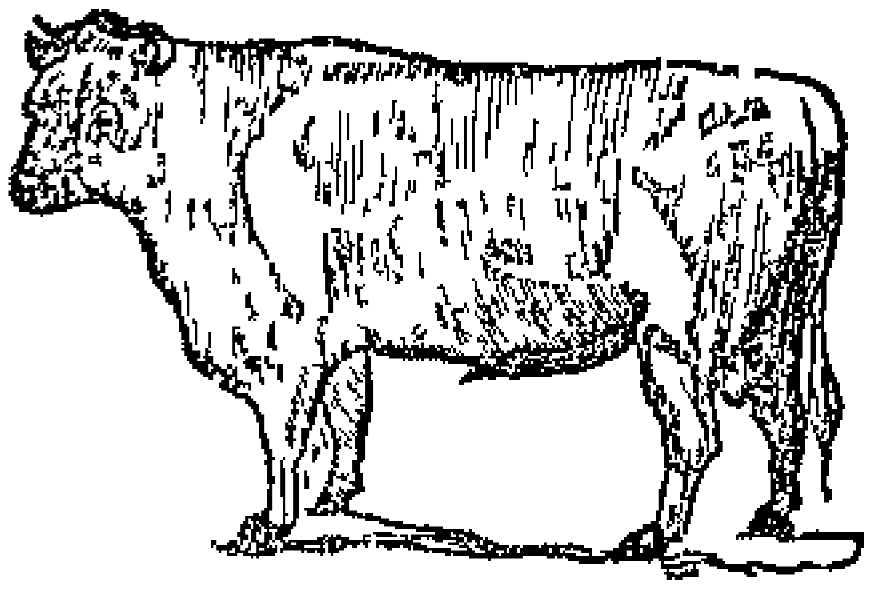

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মুদি নিজ পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র করিল, "উঠ্‌নার টাকা চাহিতে যাওয়ায়, কালাচাঁদ তাহাকে কাটিতে আসিয়াছিল। তলোয়ার উঁচাইয়া পথ পর্য্যন্ত পেছু পেছু ছুটিয়াছিল।" এই কথায় সেদিন-সেরাত্রি সে পাড়াটি খুব গরম হইয়া রহিল।

অনতিবিলম্বে পতিতপাবনের কর্ণকুহরে এ কথা প্রবেশ করিল। পতিত তখন ঠাকুরদাদার গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে,—চড়কে তাঁহার নিকট টাকা বক্‌শীশ পাইয়াছে,—ভবিষ্যতে আরও অনেক টাকা পাইবার আশা করিয়া বসিয়া আছে।

কালাচাঁদ যে সম্বল-বিহীন, পতিত এখন তাহাও বুঝিয়াছে। কালাচাঁদের যে, সমস্তই ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড, তাহাও পতিতের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। পতিত, কালাচাঁদকে প্রত্যহ একসের করিয়া দুধ বিনামূল্যে খাইতে দিত। বলিত,—

"গো-দুগ্ধ বেচিতে নাই;—মূল্য কিছুতেই লইব না।" কালাচাঁদ, পতিতকে অন্যরূপে সে দুগ্ধের দামের দ্বিগুণ পোষাইয়া দিতেন। আজ প্রায় পনের দিন হইল, পতিত, কালাচাঁদকে সে দুগ্ধ দেওয়া বন্দ করিয়াছে।

ক্রমশ পতিতের ইচ্ছা হইল, কালাচাঁদ তাহাব বাসায় আর না থাকেন। কিন্তু সে, ভয়ে একথা কিছুতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না। কালাচাঁদ যেরূপ গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক, তাহাতে তিনি যদি রাগিয়া উঠিয়া, পতিতকে একটা চড়াইয়া দেন,—ইহাই তাহার ভাবনা হইয়াছিল।

পয়সা-শূন্য কালাচাঁদকে তাড়াইবার জন্য, পতিত ঠাকুরদাদার সঙ্গে ক্রমে বেশী ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল। ওদিকে যতবেশী ভাব হয়, এদিকে কালাচাঁদের সঙ্গে তত ভাব কমে। এমন কি,—ক্রমশ কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

অদ্য তরবারি-ঘটিত ব্যাপার শুনিয়া পতিত বড়ই ভীত হইল। ভাবিল,—"কালাচাঁদের হাত

হইতে তলোয়ার খানি ভুলাইয়া লইবার উপায় কি?—আমি নিজে যাইয়া চাহিব কি? বাপ্! বাঘের মুখে কে যাবে? বাঘ কিন্তু আমার পোষা। আমাকে সে কিছুই বলে না। মুদির নিকট আগে একবার যাইয়া নিজের কাণে সকল কথা শোনাই উচিত।”

এইরূপ ভাবিয়া, পতিত, হরিহর মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। দোকানে বসিয়া, পতিত প্রাণ ভরিয়া কালাচাঁদের নিন্দা আরম্ভ করিল। সেই নিন্দাবাদ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, তাহার চতুর্দ্দিকে বহু লোক দাঁড়াইল। এই পৃথিবীমধ্যে কালাচাঁদের ন্যায় মন্দ লোক আর দ্বিতীয় নাই,—ইহাই পতিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় একজন লোক আসিয়া হরি মুদির হাতে একখানি পত্র,—এবং সেই তরবারি,—প্রদান করিল। পত্রলেখক কালাচাঁদ। পত্রে লিখিত আছে,—“তুমি বড় ভুল বুঝিয়াছ। পলাইলে কেন? তরবারি পাঠাইলাম। বেচিয়া

যাহা দাম হয়, লইও। অবশিষ্ট দেনা,—হাতে টাকা আসিলে, অগ্রে শোধ দিব।”

তরবারি দেখিয়া, পতিত চমকিয়া, লাফাইয়া উঠিল। ভাবিল,—“আমি তরবারির ভয়ে নিজের ঘর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেচি,—কিন্তু তরবারি যে, আমাকে ছাড়ে না;—আমার সঙ্গে সঙ্গে এখানেও এসে পড়্‌লো। এস্থানে আর থাকা হবে না।”

তরবারির আগমনে পতিত তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিয়া পড়িল। ভয়ে সেদিন আর আহার করিল না। কালাচাঁদের সহিতও সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। রাত্রে শুইয়া-শুইয়া কেবল ভাবিল,—“এ বাড়ী হইতে কালাচাঁদকে তাড়াইবার উপায় কি?”

তার পর যে ঘটনা ঘটে, তাহা পাঠক অবগত আছেন। ঠাকুরদাদার নিকট হইতে প্রশ্রয় পাইয়া, তাঁহার সাহসে সাহসী হইয়া, পতিত অর্দ্ধভুক্ত কালাচাঁদকে বেলা তৃতীয় প্রহরে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিল।

গৃহত্যাগের পর কালাচাঁদ যাহা যাহা করিলেন,—গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যেরূপ ভাবিলেন; ‘চুরি করায় দোষ নাই’—যেরূপে ঠিক করিলেন;—তাহা অবশ্যই সকলেরই মনে আছে। কিন্তু লাঠিদ্বারা কাছারির ঘাটের লণ্ঠন ভাঙ্গার পর, সে রাত্রি কালাচাঁদ যে, কোথায় কিরূপে অতিবাহিত করিলেন, তাহা পাঠক জানেন না।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কোন প্রহরী জাগ্রত আছে কি-না,—ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই কালাচাঁদ লণ্ঠন ভগ্ন করেন। প্রহরী নয়ত—যেন ঠিক্ এক-একটী মূর্ত্তিমতী নিদ্রা। কুঞ্জর-পদতলদ্বারা মর্দ্দিত হইলেও, সহসা ইহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় কি-না সন্দেহ। ইহারা জাগিয়া থাকিবার জন্য মাহিনা পায়,—চোর ধরিবার জন্য মাহিনা পায়,—দুর্ব্বল ব্যক্তিকে প্রবলের উৎ-পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাহিনা পায়;—ইহারা মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে মাহিনাটী বেশ বুঝিয়া লয়,—কিন্তু কাজের বেলায় কেবল ঘুম,—মহাঘুম। যেটী করিতে নিষেধ, সেইটীই করে। ইহাদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি ত সংসারে আর দেখি না। ঠাস্ করিয়া গালে চড়্ই—ইহার উপযুক্ত ঔষধ।

কালাচাঁদ সেই গভীর নিশীথে এইরূপ ভাবিতে

ভাবিতে ব্রাঞ্চ-স্কুল-ভবনের প্রাচীরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন প্রাচীর এত উচ্চ ছিল না। তিনি চ'কের বাজারের দিকে লোলুপ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ক্ষুধায় তাঁহার জঠর জ্বলিতেছে। মন "কিখাই, কিখাই"—করিতেছে। সম্মুখেই ভোলা ময়রার দোকান। কালাচাঁদ ভাবিলেন,—"এ দোকানে ত সবই আছে;—সন্দেস, মিঠাই, জিলিপি রসগোল্লা,—লুচি, কচুরি, নিম্‌কি,—ক্ষীর, ছানা, মাখন—এ দোকানে নাই কি? ভোলানাথ প্রধান দোকানদার। হুগলীসহরস্থ প্রায় অধিকাংশ বড়লোকের বাড়ী ভোলানাথ মিষ্টান্ন যোগাইয়া থাকে। অবশ্যই এই দোকানে নানাবিধ মুখপ্রিয় সরস সামগ্রী আছে। দোকান-ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া, উদরপূর্ণ করিয়া আহারাদিপূর্ব্বক একটু সুস্থ-শান্ত হই;—তারপর টাকা কড়ির চেষ্টা করা যাইবে।"

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ তথা হইতে উঠিলেন। ভোলা ময়রার দোকানে গিয়া চাবিতে হাত দিলেন। আবার ফিরিয়া আসিলেন। একটু

দাঁড়াইয়া, চকের বাজারের মধ্য-রাস্তা দিয়া খানিক উত্তরমুখে গেলেন। অনেকটা দূর গিয়া দেখিলেন,—একজন রাজ-প্রহরী বসিয়া-বসিয়া ঘুমাইতেছে, অনল্প নাসিকাধ্বনিও হইতেছে। মাঝে মাঝে তাহার মাথা ঢলিয়া-ঢলিয়া পড়িতেছে; নিদ্রিত অবস্থাতেই সে আবার মাথাটী ঠিক সোজাভাবে রাখিতেছে। কালাচাঁদ প্রায় পাঁচ মিনিটকাল দাঁড়াইয়া, প্রহরীর সেই অপূর্ব্বভাব, নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"ওঃ, অভ্যাসের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। এই লোকটা ঘোর-নিদ্রায় অভিভূত,—অথচ ঠিক সোজা হইয়া বসিয়া আছে,—মাথা টলিয়া পড়িতেছে, অথচ নিদ্রিতাবস্থাতেই আবার তাহা তুলিয়া সোজা করিতেছে। কর্ম্মে সুদক্ষ বটে। বোধ হয়, এ ব্যক্তি এই নাসিকা-ধ্বনিদ্বারা কোম্পানীর নুন খাওয়ার গুণ গাহিতেছে। ওহে কনষ্টবল-সাহেব! তোষক বালিস আনিয়া দিব কি? বসিয়া থাকিতে কষ্ট হইতেছে না ত?"

কালাচাঁদ তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় ভোলাময়রার দোকানের নিকট আসিলেন। আবার চাবিতে হাত দিলেন। আবার ফিরিলেন। ঠিক্ চৌমাথার মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে অন্তরের কথা আপন মনে কহিতে লাগিলেন,—"ভোলানাথ! আমার অপরাধ লইও না। আমি চোর হইয়াছি। চুরি-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছি। এ ব্যবসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুচারুমতে চালাইতে পারিলে, আমি ইহা দ্বারা সহজেই রাজা হইতে পারিব। আজ যাহা তোমার দোকান হইতে লইব,—রাজা হইয়া তাহার মূল্য আমি সুদ-সুদ্ধ শোধ দিব। ভাই! কিছু মনে করিও না। আর, তোমার মনেই বা বিশেষ কষ্টানুভব হইবে কেন? তোমারও ত অধিকাংশ চোরাই মাল। তুমি সর্ষপ-তৈলে জিলিপি ভাজিয়া অনেক লোককেই তাহা ঘৃত-পক্ক বলিয়া বিক্রয় কর। একসের সন্দেস কেহ কিনিতে আসিলে, তাহাকে ভুলাইয়া চৌদ্দ ছটাক দাও। তোমার ঘরে বাটখারা তিন রকম আছে। এক রকম, ঠিক

ওজন,—একসের। ২য় রকম, কম ওজন,—১৫ ছটাক। ৩য় রকম বেশী ওজন,—১৭ ছটাক। কোন জিনিস যখন তুমি অন্যের নিকট হইতে মাপিয়া লও,—তখন সেই ১৭ ছটাককেই সের বল। তুমি অন্যকে যখন কোন জিনিস বিক্রয় কর, তখন সেই ১৫ ছটাককেই সের বল। যদি কখন ধরাধরি, কড়াকড়ি হয়,—তুমি এই ভয়ে ঘরে ঐ ষোল ছটাকের সেরটী রাখিয়া দিয়াছ। তুমিও ত ভাই! চোর। তবে আর আমার উপর রাগ করিবে কেন? তুমি হইলে, ক্ষুদ্র-চোর, উঞ্ছ-চোর,—আমি হইলাম, চোর-রাজ! প্রধান সেনাপতির নিকট সামান্য পদাতি যেরূপ, আমার নিকট তুমিও সেই-রূপ। ফল কথা,—উভয়ের বৃত্তি একই। সে যাহাই হউক,—ভাই। তুমি মনে কিছু দুঃখ করিও না। তোমার দোকানে মিষ্টান্নের মধ্যে যাহা কিছু আমার ভাল লাগিবে, তাহাই আমি খাইব;—যত পারিব, উদর পূরিয়া ততই খাইব। ভাই! মনে কিছু করিও না। তোমার দোকানে নগদ যদি টাকা

পাই,—তাহাও লইব। বেশী লইব না,—আবশ্যক মত লইব। ভাই! মনে কিছু করিও না। যতশীঘ্র পারি, তোমার টাকা শোধ দিব। আজ আমাব ক্ষুধা প্রবলা। আর থাকিতে পারিতেছি না। গা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। ভাই! ভোলানাথ! চাবি ভাঙ্গিতে চলিলাম,—কিছু মনে করিও না।

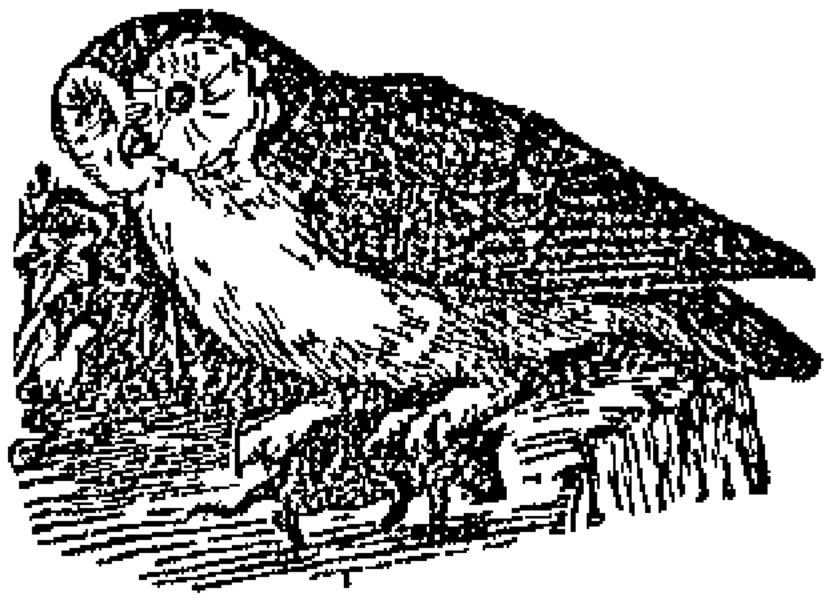

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ পুনরায় চাবিতে হাত দিলেন। একবার চাবিটী নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন। দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়-মুষ্টিতে চাবি ধরিলেন। ধরিয়া, এদিক-ওদিক চাহিলেন। তারপর, অমনি চাবিতে এক মোচড়। সুর্‌সা সহিত চাবি ভাঙ্গিয়া কালাচাঁদেব হাতে আসিল। ভগ্ন-চাবি কালাচাঁদ নর্দ্দমায় ফেলিলেন।

কালাচাঁদ সন্দেসের ঘরে ঢুকিলেন। ঘব অন্ধকার। কোথায় কোন্ দ্রব্য আছে, তাহা নির্ণয় কবিবার উপায় নাই। বিলাতী দেশ্‌লাই থাকিলে, এ সময় কালাচাঁদের সুবিধা হইত। কিন্তু তখন এ দেশে বিলাতী-দেশ্‌লায়ের এরূপ ভাবে আমদানি হয় নাই। তখন ব্যবস্থা ছিল—চক্‌মকির। 'ইস্পাত' দিয়া ঠুক্ করিয়া চক্‌মকির পাথর একবার ঠুকিলেই সোলায় আগুন পড়িত। সেই

সোলায়, টীকা বা কয়লা ধরাইতে হইত। টীকা ধরিলে, দিশি-দেশ্‌লায়ের সাহায্যে প্রদীপ জ্বালা হইত।

কালাচাঁদ নূতন ব্রতী। চৌর্য্য-কার্য্যে নিতান্ত নূতন ব্রতী না হইলেও, এরূপ চাবি ভাঙ্গিয়া রাত্রিকালে চৌর্য্য-কার্য্যে নূতন ব্রতী বটেন। তিনি জানিতেন না যে, চোরেব সঙ্গে অগ্নি থাকা একান্ত আবশ্যক। অনভিজ্ঞ বলিয়াই,—তিনি অগ্নি বা কোনরূপ আলোক, সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। বলাবাহুল্য, তিনি এ বিষয়ে কোন 'খেয়াল' করেন নাই,—ঘর খুলিলেই রসগোল্লা,—ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল;—কিন্তু ঘর খুলিলেই যে, অন্ধকার,—ইহা তিনি ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সুবিধার মধ্যে, তখনও থাকিয়া থাকিয়া এক একবার ঈষৎ বিদ্যুৎ চমকিতে ছিল। যদি মেঘে মেঘে ঘোরতর সংঘর্ষণ হইয়া, এ সময় ভীষণা চপলা চমকিয়া বজ্রাঘাতও হইত, তাহা হইলে কালাচাঁদের আরও সুবিধা ঘটিত। কেন না, তিনি

এখন চাহেন—অধিক আলোক!—তা, বজ্রাঘাতও না-জানি, মহাপ্রলয়ও না-জানি!

দুঃখ এই, বজ্রাঘাত হইল না;—মেঘের কোলে বসিয়া সৌদামিনী মাঝে মাঝে কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। মন্দের ভাল বটে। কালাচাঁদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইল। অদূরে চক্‌মকি নজর হইল। পাথর, সোলা, ইস্পাত, কয়লা—সমস্তই তিনি আভাসে দেখিতে পাইলেন। গুড়ি মারিয়া যাইয়া, তিনি হাতড়াইয়া চক্‌মকি ধরিলেন। ধরিয়া, ভাবিলেন,—লাভ যে কিছুই হইল না দেখিতেছি। চক্‌মকি ঠুকিব কেমন করিয়া? ঠুকিলেই যে, শব্দ হইবে। রাত্রিকালে, চোর চুরি করিতে আসিয়া, গৃহস্থের গৃহে বসিয়া চক্‌মকি ঠুকিবে কেমন করিয়া? আর, এই ঘরের দ্বারইবা কতক্ষণ খোলা রাখিব? দরজা এখনি বন্ধ করিয়া দেওয়াই উচিত! কিজানি যদি কোন পথিক এপথ দিয়া চলিয়া যায়,—তাহা হইলেত আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। ধরিতে অবশ্যই পারিবে না। তবে আহারটা হইবে না—এইমাত্র।

কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া দিলেত,—ঘরটী ঘোর অন্ধকারময় হইবে। আমি এই আঁধার রাশির মধ্যে একা নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াইবা কি করিব?

চকমকিও ঠোকা হইবে না, দরজাও বন্ধ করিতে হইবে,—অথচ চাই আলোক। এ-মহা সমস্যার কেমন করিয়া মীমাংসা করিব?

আচ্ছা, হাঁড়িগুলা হাতড়াইয়া দেখি না কেন? মিষ্টান্নপূর্ণ একটা হাঁড়ি পাইলেই আমার যথেষ্ট হইবে।

কিন্তু এক ভয়। কোথায় কি আছে, কিছুই জানি না। কোন্ জিনিস কিরূপ ভাবে সাজান আছে, তাহাও অবগত নহি। যদি হাতড়াইতে-হাতড়াইতে হাঁড়িগুলা হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়—তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ। অথবা অন্ধকারে আমি যদি রসের ডাবার ভিতর দুম্ করিয়া পড়িয়া যাই,—তাহা হইলে, সে-ও এক কম ব্যাপার হইবে না।

আবও এক বিষম অভাব দেখিতেছি যে! তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। জল কোথা পাই? আগে জল চাই। স্বধু সন্দেস লইয়া কি করিব? সন্দেসগুলা খাইলে ত আবও অধিক পিপাসা পাইবে। সন্দেসইবা গলাধঃকরণ হইবে কেন?

কালাচাঁদ কাতর হইলেন। এসময় কি যে করিবেন,—তাহাব কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। একবাব ভাবিলেন,—বাহিব হইতে একটা আলোব যোগাড় করিয়া আনি না কেন? কিন্তু এরাত্রে আলোক কোথায় পাইব? গৃহস্থকে গিয়া কি বলিব,—'অগো! আমাব চুরির ভাল স্থবিধা হইতেছে না, তোমবা একটা আলো দাও?' তাও কি কখন হয়?—আব, এরূপ যোগাড়যন্ত্র করিতেই যে, বাত পোহাইয়া যাইবে।

ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর কালাচাঁদ বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন,—এমন সময় আবাব সৌদামিনী ঝলসিল। কালাচাঁদ দেখিলেন, তাঁহার ঠিক বামপার্শ্বেই উনান। উনানে আগুন

নাইত?—একটুও কি আগুন থাকিবে না? কালাচাঁদ বসিলেন। উনানের ভিতর হাত দিলেন। কৈ উনান-ত বেশী গরম নয়? তবে কি হতভাগার অদৃষ্টে কিছুতেই আজ আগুন মিলিবে না? বোধ হয়, আমি মরিলে, আজ আমার মুখাগ্নিরও আগুন পাওয়া যায় না।

কালাচাঁদ অদ্য অদৃষ্টবাদী, পরকালবাদী না হইলেও, এ অন্তিমে, মনভ্রমে,—অভ্যাস নিবন্ধন—ভাগ্যের কথা, অদৃষ্টের কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অন্তিমকাল বড় কঠিনকাল।

কালাচাঁদ এইরূপ ভাবিতেছেন, আর উভয় হস্তদ্বারা উনান হইতে পাঁশ তুলিয়া বাহিরে রাখিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ পাঁশে আচ্ছাদিত হইল। নাকে, মুখে, চোখে পাঁশ প্রবেশ করিল। তথাচ কর্ম্মে তাঁহার অবহেলা নাই। একাগ্রমনে যোগীপুরুষের ন্যায়, তিনি পাঁশ-বহিষ্করণ-কার্য্যে নিযুক্তই হইয়া রহিলেন।

হঠাৎ কালাচাঁদের হাতে গরম ঠেকিল। অমনি আনন্দে তাঁহার মন লাফাইয়া উঠিল। মনে মনে মহোল্লাসে বলিলেন "পেয়েছি, পেয়েছি!—আগুন নিশ্চয় আছে। আর ভাবনা কি?" ধীরে ধীরে অতি যত্নের সহিত, তাঁহার অগ্নিতে তিনি হাত দিলেন। অগ্নি এখন প্রাণের ন্যায় প্রিয়মত বস্তু,—সুতরাং হাত দিয়া সেই অমূল্য অগ্নিকে টিপিয়া ধরিতে তাঁহার কষ্টবোধ হইল না। হাতে যে 'জ্বালা' লাগিতে লাগিল, তাহা তিনি তাদৃশ অনুভব করিতে পারিলেন না। এখন জ্বালাও মিষ্টি!

কালাচাঁদ সেই অগ্নিকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকারে সেই অগ্নির ত কোনরূপ আলোক দীপ্তি পাইল না। কালাচাঁদ ফুঁদিতে লাগিলেন। তাহাতেও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল না। সেই অগ্নি, উনানের ভিতরে যত গরম ছিল, বাহিরে আনা হইলে, সে, আর তত গরম রহিল না। কালাচাঁদ তখন

দু-ই হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন,—অনুভবে স্পষ্টত বুঝিলেন,—“ইহা আগুন নহে,—একটা লোহা-ভাঙ্গা। বোধ হয় কড়া-ভাঙ্গা হইবে। উনানে কখন্ হয়ত পড়িয়া গিয়া থাকিবে।”

ক্রোধে কালাচাঁদ সেই উত্তপ্ত ভগ্ন লৌহখণ্ডকে নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, “তুমি আমার সহিত বড়ই প্রবঞ্চনা করিয়াছ। তুমি নর্দ্দমা-রূপ নরকে গিয়া বারমাস বাস কর।”

কেহ যদি নৈরাশ্যের জীবন্ত ছবি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি এইবার—শীঘ্র কালাচাঁদের মূর্ত্তি অবলোকন করুন। হস্ত-পদ শিথিল, নিস্পন্দ নয়ন,—মুখটী যেন গুটাইয়া গিয়াছে,—কোমরে যেন কে লাঠীর আঘাত করিয়াছে,—চোখের কোল বসিয়াছে, চড়াইয়া কে যেন গালটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—সর্ব্ব-শরীর চুপ্‌সিয়া গিয়াছে। যদি কাহারও সাধ থাকে, তবে এই বেলা এ ছবি দেখিয়া লউন।

কিন্তু অধিকক্ষণ এ ভাব রহিল না। দেখিতে

দেখিতে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। কালাচাঁদ ক্রমশ বল পাইয়া যেন একটু সুস্থ হইলেন।

কালাচাঁদ ভাবিলেন, "লোহ-খণ্ডটা যখন প্রথমে খুব গরম ছিল, তখন নিশ্চয়ই উনানের ভিতর আগুন আছে। আগুন না থাকিলে, লোহাটা এরূপ গরম থাকিবে কেন? উনান-মধ্যে গণ্‌গণে আঙরা অবশ্যই নাই। তবে পাঁশের ভিতর একটু-আধটু অগ্নি বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অবশ্যই আছে। আর পাঁশ বাহির করা হইবে না,—ঘাটাঘাঁটিতে, যে আগুন-টী এখনও আছে, তাহা নিবিয়া যাইতে পারে। চকমকীর সোলা ও টীকা সংগ্রহ করা—অগ্রে আবশ্যক।"

কালাচাঁদ তখন বামহস্তে টীকা ও সোলা রাখিলেন। মুখটী ঠিক উনানের মুখে দিলেন। ডানহাতটী উনানের ভিতর ঢুকাইয়া আগুন খুঁজিতে লাগিলেন।

আবার হাতে গরম ঠেকিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গও দৃষ্ট হইল। কালাচাঁদের হৃদয়ে আবার হর্ষোদয় হইল।

সত্যসত্যই এবার কালাচাঁদ সোলা ধরাইলেন। সোলার অগ্নি টীকায় আসিল। কালাচাঁদ হাসিয়া ভাবিলেন,—"আগে, একবার তামাক খাইলে হয় না?"

উনানের পাশেই ঘিয়ের কড়াই ছিল। তাহাতে ঘি কিছুই ছিল না,—তবে কড়াইটা ঘি মাখান বটে। কালাচাঁদ আপনার কাপড়ের কোঁচার দিক্‌টা খানিক ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন কাপড়টুকু ঘিয়ের কড়ায় বারকয়েক বুলাইলেন। কাপড় বেশ ঘৃতাক্ত হইলে, তাঁহার লাঠীর মুখে সেই কাপড় বাঁধিলেন। দিব্য মশালের মত হইল। কালাচাঁদ কৌশলে তখন টীকা ও সোলার সাহায্যে তাহাতে আগুন জ্বালিয়া দিলেন। বেশ আলো হইল।

বলা বাহুল্য, ইতিপূর্ব্বেই তিনি সদর-দরজা বন্দ করিয়াছিলেন। আলোক জ্বালা হইলে ভাবিলেন, আগে খিড়কীর দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া আসা উচিত। তিনি তখন সেই জ্বলন্ত মশাল লইয়া, দোকান ঘরের চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে

চলিলেন। প্রথম ঘর পার হইয়া আর একটী ঘরে পড়িলেন। সেই দ্বিতীয় ঘরের সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র উঠান। সেই উঠানে এক কূপ। কূপের নিকট জল তুলিবার দড়ী এবং ঘটী।

কালাচাঁদের স্নান করিবার সাধ হইল। মশাল-টীকে ঘরের এককোণে তখন লুকাইয়া রাখিলেন। উল্লাসে কূপের নিকট স্নান কবিতে বসিলেন। ধীরে ধীরে জল তুলিয়া প্রায় বিশ ঘটী জল মাথায় দিলেন। অঙ্গের মলা দূর করিলেন। স্নানে যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। নবজীবন পাইয়া, কালাচাঁদ খিড়কী-দ্বারের খিল খোলা তত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

স্নানান্তে ভাবিলেন, "একটু নেবুর সরবৎ পাই ত খাই।" নেবু মিলিল না, কিন্তু তিনি বাতাসা ভিজাইয়া সরবৎ করিয়া খাইলেন।

তারপর দুইখানি কম্বলাসন যুড়িয়া পাতিলেন। বৃহৎ একখুলি রসগোল্লা আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। এক ধামা সন্দেস এবং এক হাঁড়ী ক্ষীর আনিলেন।

এত উদ্যোগের পর কার্য্যারম্ভ। কালাচাঁদ প্রথমত সেই পাতলা ক্ষীর এক হাঁড়ী খাইয়া গলাটা সরল করিয়া লইলেন। তারপব রসগোল্লার বড় খুলিখানা সম্মুখে আরও একটু সবাইয়া আনিয়া, টপাটপ্ সপাসপ্-রূপে শীঘ্রহস্তে শুভকার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। রসেভরা বড় বড় রসগোল্লা এক একটী করিয়া মুখে এই ফেলেন, আর এই নাই! আবার মুখে ফেলেন,—তখনই মুখে আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন যাতুমন্ত্রে রসগোল্লাগুলা উড়িয়া যাইতে লাগিল। তাঁহাব দক্ষিণ-কর মুখ-গহ্বরে রসগোল্লা নিক্ষেপ-কার্য্যে যেরূপ তৎপর, মুখ-গহ্বরও তাহাকে উদর-রসাতলে পাঠাইতে সেইরূপ, বা তদপেক্ষা অধিক তৎপর।

কালাচাঁদের প্রাণ কঠিন হইলেও, তিনি এক একবার চমকিতে লাগিলেন। ব্যবসার অদ্য প্রথম আরম্ভ,—হাতে-খড়ি,—তাই বুঝি এক একবার হাত কাঁপিতে লাগিল।

এসব কার্য্যে কালাচাঁদের অভ্যাস ত বেশী

কালাচাঁদের রসগোল্লাভক্ষণ।

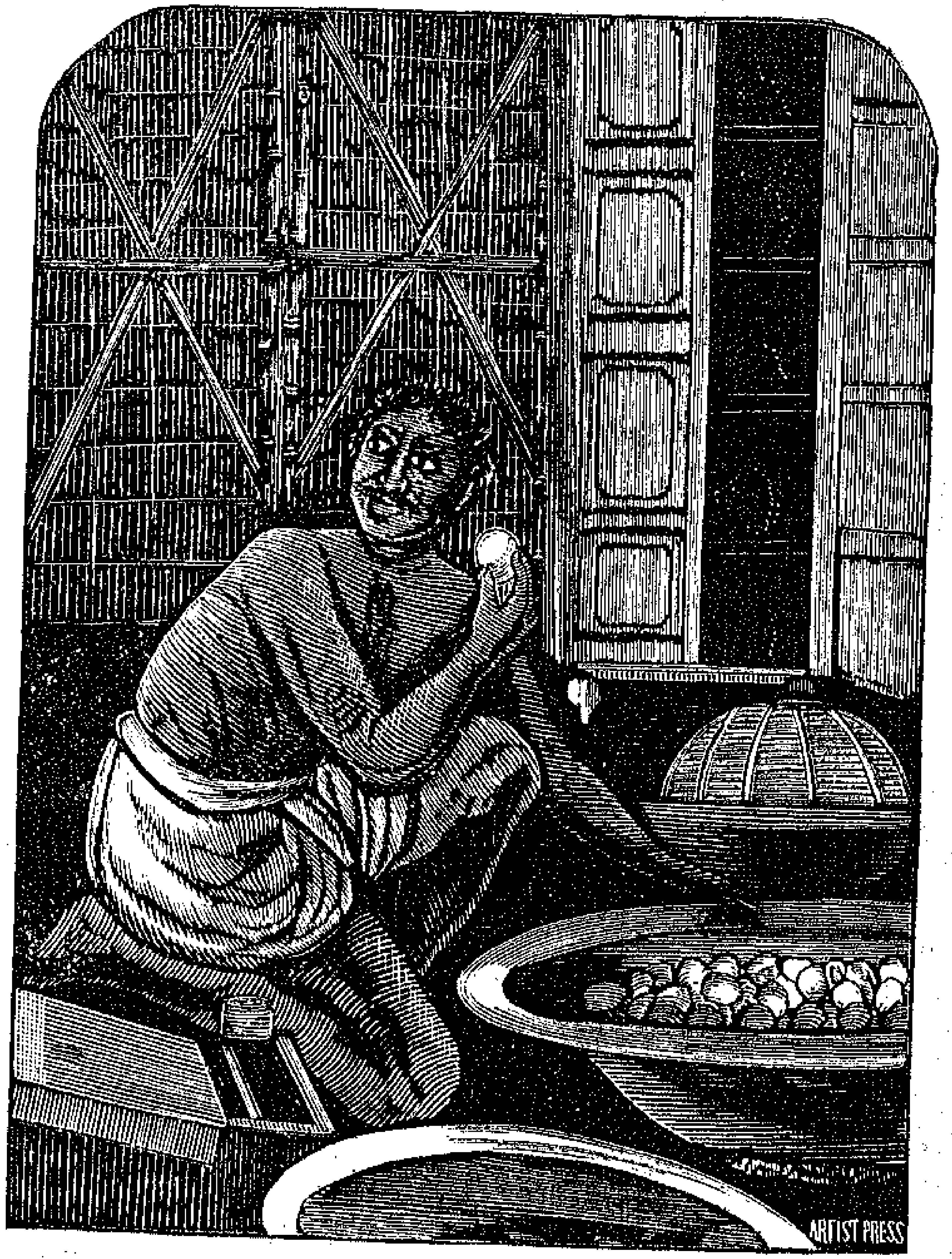

নাই,—কোথায় একটী ইন্দুর নড়ে;—তিনি মনে করেন, ভোলাময়রা বুঝি আসিতেছে। বাদুড় উড়িয়া যায়, তিনি মনে করেন, তাঁহাকে বুঝি কে ডাকিতেছে!

যে কারণেই হউক, কালাচাঁদ সমুদায় রসগোল্লা খাইলেন না। যতগুলি খাইলে, রাত্রির ক্ষুধা সহজভাবে নিবৃত্তি পায়, ততগুলিই উদরস্থ করিলেন।

রসগোল্লা ভক্ষণ-কার্য্য প্রথমত যেন ডাকগাড়ীর বেগে আরম্ভ হইয়াছিল,—কিন্তু হঠাৎ সে বেগ নরম হইল। যেন গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভীম ভৈরব বেগ যদি আর অর্দ্ধদণ্ডকাল থাকিত, তাহা হইলে আধখানি রসগোল্লাও পড়িয়া থাকিত কি না সন্দেহ,—খুলিখানি পর্য্যন্ত থাকিত কি না, তাহাতেও কিঞ্চিৎ সন্দেহ!!

কালাচাঁদ রসগোল্লার পর সন্দেস ধরিলেন। দুইটী সন্দেস মুখে দিয়া বলিলেন,—"ভোলানাথ! একটু দই দিতে পার? তোমার যদি দই নাই, তবে সন্দেস খাবো কেমন ক'রে? এমন নিমন্ত্রণ

করা কেন? দূর কর! আর খাবো না!—এই রাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। দাও, ভোলাবেটার ক্ষীরের হাঁড়ি ভেঙ্গে।”

ক্ষীর-ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া কালাচাঁদ ভোলানাথের বাক্স ভাঙ্গিলেন। বাক্সে অনেকগুলি টাকা থাকিলেও, আটটী টাকা, তিনটী সিকি এবং চারিগণ্ডা পয়সা ব্যতীত আর কিছুই লইলেন না।

আপন জিনিসপত্র সমস্ত বুঝিয়া লইয়া, কালাচাঁদ ভিজা কাপড়ে ভোলানাথের দোকান-ঘর পরিত্যাগ করিলেন।

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদের দশগুণ বল বৃদ্ধি হইল। ব্যবসারম্ভের প্রথম দিনেই প্রচুর ফললাভ,—কালাচাঁদের বলবৃদ্ধি হইবে-না' ত কি? আজ নবীন সেনাপতি প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিল,—আনন্দ-উল্লাসের কি আর অবধি আছে?

ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল,—ক্লান্তি দূর হইল,—হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল,—কালাচাঁদ গজেন্দ্র-গমনে পুনরায় সেই কাছারির ঘাটে গেলেন। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ঘাটের যে পৈঠায় বসিয়া পাপ-পুণ্য, চোর-সাধু; সত্য-মিথ্যার বিষয় ভাবিয়াছিলেন,—যেস্থলে বসিয়া তিনি 'চুরি-করায় দোষ নাই'—এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন;—কালাচাঁদ গিয়া ঠিক সেই-খানেই বসিলেন। এক প্রহর পূর্ব্বে যেখানে বসিয়া কত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এখন

সেখানে বসিয়া পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। আগে ছিল, সংসার তাঁহার পর; এখন হইল, সংসার তাঁহার আপনার। এই বিশ্বসংসারের সমগ্র পর-দ্রব্য তাঁহার আপনার হইল। অহ্লাদ-সলিলের নদী না বহিবে কেন?

কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—"কোম্পানীর এই কালেক্‌টরীতে যত-লক্ষ টাকা আছে,—সমস্ত আমারই; কেবল কৌশলে লইতে পারিলেই হইল। ব্রজনাথ বড়াল, এক আনা, দুই আনা সুদে টাকা ধার দিয়া,—এখন কোটীপতি; তাহার নিকট হইতে অন্তত পাঁচ আনা ভাগ চাহিব;—না দেয়, বুদ্ধির জোরে কাড়িয়া লইব। এ অঞ্চলে যত লোক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে, অবস্থা-নুসারে ৫৲, ১০৲, ২৫৲, ১০০৲—অধিক কি, এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত 'চৌথ' আদায় করিব। আমার টাকার অভাব কি? যদি তেমন কিছু অভাব হয়,—তবে একদিন ঠাকুরদাদার লোহার সিন্দুকটা মাথায় করিয়া তুলিয়া আনিলেই চলিবে। লোকে

বলে, সে সিন্দুকটা মোহরে ভরা। সেই এক সিন্দুকেই বস্ আছে।”

দরিদ্র কালাচাঁদ, এক এক মুহূর্ত্তে হৃদয়ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া ফেলিতেছেন! আহ্লাদ-সলিলের নদী ত কোন্ সামান্য কথা,—গভীর গর্জ্জনকারী সমুদ্রইবা প্রবাহিত না হইবে কেন?

কোন্ কৌশল, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, আমার এ ব্যবসা চলে ভাল?—ইহাই হইল এখন কালাচাঁদের সুচিন্তা। ছিঁচ্‌কে চোর হইলে, কোন কাজ হইবে না; ব্যবসা শীঘ্র ফলাও করিয়া দিগ্বিজয় হইয়া উঠিতে হইবে। এই হুগলী-সহরের মধ্যে প্রধান পুরুষ, অর্থাৎ 'প্রধান চোর কে? প্রথমত. মহতের আশ্রয় না লইলেত শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হইবে না। তাই বলি, মহৎ কে? যদি এ সংসারে কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুমহৎ ব্যক্তি থাকেন, তবে তিনি আমার ঠাকুর-দাদা। তাঁহার যোড়া নাই। একবারে চৌকস্। খাঁটি সোণা। এ ব্যবসা চালা-

ইতে হইলে, প্রথমত তাঁহারই আশ্রয় লওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সেখানে শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষা—সবই হইবে। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে, আমার সম্মান-গৌরব বৃদ্ধি হইবে; দু-দশজন লোক আমাকে মান্য করিয়া চলিবে। পসার বৃদ্ধি হইবে। পসার বাড়িলেই পরম লাভ। এখন তবে ঠাকুর-দাদার কাছে গিয়া শ্রীচরণে প্রণিপাত হওয়াই সুযুক্তি।"

"কিন্তু বুড়াকে বশ করিব কেমন করিয়া? বুড়া যে, আমার উপর হাড়ে চটা! আমাকে দেখিলেই, তাঁহার যেন গায়ে জ্বর আসে! এমন অচল অটল বিষম বিষধরকে কোন্ মন্ত্রৌষধ গুণে নতশির করিব?

"বৃদ্ধ বোধ হয় এইরূপ ভাবেন, যে,—'আমি মরিলেই তাঁহার যেন আপদ যায়; সংসার জুড়ায়; কালো মেঘ দূরে পলায়।' তাঁহার অন্তরের এরূপ ভাব না হইলে, আমাকে জেলে পাঠাইবার জন্য তিনি এত চেষ্টা কেন করিবেন? নীচের আশ্রয়ে, নাপিতবাড়ী আমি অবস্থিতি করিতেছি জানিয়াও,

তিনি আমার কোন্ অপরাধে আমাকে একবার ডাকিলেন না? অপরাধ ত কিছুই দেখি না!—অপরাধের মধ্যে বোধ হয়,—আমি তাঁর 'আপদ-বালাই!' আমি যখন তাঁর আপদ-বিপদের মধ্যে গণ্য,—তখন অবশ্যই তিনি আমাকে ভয় করেন। যে দিন আমি তাঁহার সহিত এখানে সাক্ষাৎ করি, সে দিনও তাঁহার মুখে যেন একটু ভয়ের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। ইহাইত আমার ধারণা। আমার উপর বিরক্ত হইয়া তিনি ভালরূপ কথা কহিলেন না বটে,—কিন্তু তখন ভয়ে যেন তাঁহার বুক ধুক্-ধুক্ করিতেছিল। মুখেই মনের ভাব মাখানো থাকে। ঠাকুরদাদার সেই মুখটীতে তখনত কেবল বিরক্তি ভাব প্রকাশিত ছিল না,—ভয়ের ভাবও বিলক্ষণ ছিল। নহিলে, আমাকে দেখিয়াই চক্ষুদ্বয় ওরূপ বিস্তৃত হইবে কেন? কপালে ওরূপ রেখা অঙ্কিত হইবে কেন? মাথার চুল অমন সোজা হইবে কেন? শরীব অমন কণ্টকিত হইবে কেন? ভয় বটে!

কিন্তু আমাকে তাঁহার কেন ভয়? কিসের ভয়? কবে থেকে ভয়?—তাহাত কিছুই খুঁজিয়াও পাই না, বুঝিতেও পারি না। আমি দরিদ্র, অক্ষম কালাচাঁদ; তিনি ধনবান, সক্ষম ঠাকুরদাদা। আমার উপর তাঁহার ভয় কি কারণে হইবে?

কারণ যাহাই হউক, কার্য্য ঠিক বটে। যদি সত্য সত্যই আমি তাঁহার কোনরূপ ভীতি-সঞ্চারের কারণ হই, তাহা হইলে ত আমি তাঁহাকে এক-মুহূর্ত্তেই বশ করিয়া লইব।

কিন্তু আমার এই অনুমান যদি অমূলক হয়, তাহা হইলে বুড়াকে বশে আনা বড়ই কঠিন হইবে। সে যাহাই হউক, এখন স্বকর্ম্ম সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা-যত্ন করিব,—তাহাতে অবশ্যই কার্য্যোদ্ধার হইবে। চেষ্টার অসাধ্য কোন্ কার্য্য আছে?

ঠাকুরদাদার বাসায় থাকিব। ঠাকুরদাদার প্রিয় পাত্র হইব। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। উঠিতে বলিলে, উঠিব; বসিতে বলিলে, বসিব।

তাঁহার গোলাম হইব। মধুর কথারূপ মহাস্ত্রে তাঁহার মন চুরি করিয়া লইব। এবং তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই অর্থ অপহরণ করিব। তবে তাঁহার নিকট হইতে দু-চারি টাকা খুচুরা হিসাবে কখন লইব না;—উপযুক্তকালে একবারে থান্ চুরি, গাঁট চুরি, গুদাম চুরি করিব।

আচ্ছা,—ঠাকুরদাদার সঙ্গে এক বাসায় থাকা সুবিধা হইবে কি? যাউক্—এ সব ক্ষুদ্র কথা। উপস্থিত মত, তখন যেমন দেখিব, সেইরূপই বন্দোবস্ত করিব। ফল কথা,—ঠাকুরদাদাকে আয়ত্তের মধ্যে, হাতের মুঠার ভিতর আনিতেই হইবে।”

দেখিতে দেখিতে রাত্রি চারিটা বাজিল। একজন প্রহরীর তখন ঘুম ভাঙ্গিল। সে, কাছারির ঘাটের দিকে আসিয়া, কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসিল, “কৌন্ হ্যায়?”

কালাচাঁদ। হাম, চৈতন্যচরণ চূড়ামণি হ্যায়!

প্রহরী। মকান্ কাহাঁ?

কালাচাঁদ। মকান্ তো—ঘুঘু-ডাঙ্গামে হ্যায়।

প্রহরী। কাঁহা যাতে হেঁ।

কালাচাঁদ। নবদ্বীপ-কা শ্রীপাটমে।

প্রহরী। রাতমে আপকো বহুত তক্লীফ হুয়া।

কালাচাঁদ। কনষ্টবল সাহেব! সে কথা, কি আর বল্বো? বাপু! তামাক খাবার কোন যোগাড় আছে কি?

প্রহরী। থোড়ি তামাকু হ্যায়। লেকিন টীকিয়াভি নহীঁ,—আগ্ভি নহীঁ!

কালাচাঁদ। ওহে বাপু! এত ভাব্চো কেন? এই দুইটী পয়সা নাও। এক পয়সার তামাক এবং এক পয়সার আগুন কিনে নিয়ে এস।

প্রহরী পয়সা লইল। অবিলম্বে তামাক সাজিয়া আনিল। হুঁকা ছিল না। অশ্বত্থপত্রের নল তৈয়ারি হইল। কালাচাঁদ ঐ নলে তামাক খাইতে লাগিলেন। কল্কে ফিরাইয়া দিবার সময় কালাচাঁদ প্রহরীকে আরও দুইটী পয়সা দিলেন। প্রহরী কৃতার্থ হইয়া চলিয়া গেল।

প্রোথিত করিলেন। লাঠিটী সেই বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর লুকাইয়া রাখিলেন। নিজস্ব অস্ত্র-শস্ত্র এবং ধন-সম্পত্তি এইরূপে রক্ষা করিয়া, কালাচাঁদ দ্রুতপদে চুঁচুড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চুঁচুড়া পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরেই অরুণোদ- হইল। পাখীকুল কলকণ্ঠে কোলাহল করিয়া উঠিল। দোকানদার দোকান খুলিল। কালাচাঁদ এক ধূতি এবং এক চাদর কিনিলেন। গলিমধ্যে গিয়া গোপনে ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়া, নূতন কাপড় পরিলেন। তিনি সেই সু-ছিন্ন বসনখানি ফেলিলেন না,—একটা প'ড়ো-বাড়ীর প ভয়েরই লুকাইয়া রাখিলেন।

তারপর—বাজার। মাছ, দই, সন্দেশ, দি বেগুন, কলা খরিদ। তারপর এই ভেট-উ শম ব্যব লইয়া, মাছ হাতে করিয়া, ঠাকুরদাদার গৃহে চাঁদের আগমন; এবং সম্ভাষণ,—"দাদা মো অ, দাদা মোশাই! বাড়ীতে আছেন কি?"

অবশেষের ব্যাপার।

আহার,—অর্থাৎ ভূরি-ভোজন।

ইহাই হইল—ইতিহাস।

## প্রথম অংশের উপসংহার।

বৃদ্ধ হরিতারণ দত্ত, ভাবিয়া চিন্তিয়া, কালাচাঁদকে হস্তগত করাই উচিত বিবেচনা করিলেন। তিনি কালাচাঁদকে উত্তম আশ্রয় দিলেন,—কিন্তু নিজের বাসায় রাখিলেন না। স্বতন্ত্র বাসায় থাকিতে কালাচাঁদ সানন্দে সহজেই সম্মত হইলেন। ঠাকুরমা কিন্তু প্রথমে কালাচাঁদের স্বতন্ত্র বাসা-স্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন। অবশেষে ঠাকুর[illegible] [illegible]-বিতর্কে এবং কালা-চাঁদের সম্মতিতে, ঠাকুরমার আপত্তি-খণ্ডন হইয়া যায়। নাতী-ঠাকুরদাদা উভয়েরই মন্ত্রণা সফলতা লাভ করিল। আপন আপন ইষ্টসিদ্ধিতে উভয়েরই সংসার এখন সুখময় হইল।

ফুল ফুটিল। সৌরভ ছুটিল। দশ দিক হাসিল। পরমসুখে কালাচাঁদের বিষম ব্যবসা আরম্ভ হইল। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।

---

### চতুর্থ পর্ব্ব সমাপ্ত।